তৃতীয় সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬২
চতুর্থ সংস্করণ—কার্তিক, ১৩৬৭
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর—
শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯
প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

সাড়ে চার টাকা

ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত,

এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি,

করকমলে—

নিবেদন

'বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য' বর্তমান সংস্করণে নব কলেবর লাভ করিল। এই গ্রন্থে দুই শ্রেণীর প্রবন্ধ ছিল (১) সামাজিক ও রাজনৈতিক, আর (২) সাহিত্যিক। বর্তমান সংস্করণে প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি বাদ দেওয়া হইল এবং অনেকগুলি সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ সংযোজিত হইল। বস্তুতঃ বর্তমান আকারকে নূতন সংস্করণ না বলিয়া নূতন গ্রন্থ বলিলেই যথার্থ হয়।

শেষের প্রবন্ধ দুটি বাংলা-সাহিত্য বিষয়ক নয় সত্য, কিন্তু সাহিত্য বিষয়ক বলিয়া বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল। শ প্রবন্ধটি শ-র মৃত্যু উপলক্ষে এবং গ্যেটে প্রবন্ধটি গ্যেটে জন্মদ্বিশতবার্ষিক উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল। অন্যান্য প্রবন্ধের অনেকগুলিও বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে রচিত। কিন্তু ভরসা এই যে সাময়িক প্রসঙ্গ ছাড়াই মনে হয় এগুলির রস-গ্রহণ সম্ভব।

সূচীপত্র

শিল্পের মুক্তি

এই জামশেদপুর শহর আর এখানকার সমাজের সহিত পরিচিত হ'বার ইচ্ছা আমার দীর্ঘকালের। জামসেদপুরের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অধিকাংশ শহরের মূলগত পার্থক্য এই যে, এই শহরটি মানুষের জীবনের একটি নূতন অধ্যায়ের প্রতীক। সেই অধ্যায়টিকে বলা যায় যন্ত্রবাদ। মানুষ এক সময়ে ছিল যাযাবর, তার পরে হয়েছে কৃষক, তার পরে হয়েছে সে যন্ত্রশিল্পী। যাযাবরের শিকারের ধনুক বা গদাও যন্ত্র, কৃষকদের লাঙল বা তাঁত বা চরকাও যন্ত্র। কিন্তু যন্ত্রবাদের যন্ত্র ওসব থেকে আকৃতি ও প্রকৃতিতে ভিন্ন। এই ভেদটা কোথায়, বুদ্ধির চেয়ে অনুভূতি তা সহজে বুঝতে পারে। আর বুঝতে না পারলেও সাহিত্যসভা তা বিচারের ক্ষেত্র নয়। এটুকু স্বীকার করতেই হবে যে, যন্ত্রবাদ মানুষের জীবনে একটা নূতন অধ্যায় ও নূতন তত্ত্বের অবতারণা করেছে। সেই অধ্যায় ও তত্ত্বের বস্তুগত প্রতীক জামসেদপুর, আমাদের দেশের বৃহত্তম প্রতীক ব'লেই জানি। যন্ত্রবাদ বা তার পরিণাম সম্বন্ধে আমার মত যাই হোক, তার সঙ্গে পরিচয়ের ইচ্ছা স্বাভাবিক। সেই ইচ্ছার টান এখানে আসবার একটা হেতু।

কাল আপনাদের এখানে 'রক্তকরবী'র অভিনয় হ'ল। অভিনয়ের নৈপুণ্য সকলকেই আনন্দ দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এত নাটক থাকতে, রবীন্দ্রনাথের এত নাটক থাকতে, অভিনয়ের জন্য আপনারা রক্তকরবী নাটকখানা যে নির্বাচন করেছিলেন, অবশ্যই তার একটা কারণ আছে ব'লে মনে হয়। হয়তো ওই নাটকখানার বর্ণিত বিষয়ের

সঙ্গে এখানকার জীবনযাত্রার কোন প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্যের তাগিদ আপনাদের মনে পৌঁছেছিল। একটি বিষয় আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, রক্তকরবীতে কারো অবসর নেই। ওখানকার জীবনযাত্রার মানচিত্র এমন সুকৌশলে নিয়মিত যে, কাজের মরুজিহ্বা সকলকে এমন ক'রে শুষে নিয়েছে যে, কোথাও এতটুকু অবসরের মরূদ্যান দেখা দিতে পারেনি। যন্ত্রবাদের পক্ষে অবসর বড় বালাই। অবসর মানুষকে চিন্তা করায়, চিন্তা মানুষের মনকে বিদ্রোহী ক'রে তোলে, সে বিদ্রোহ যন্ত্রপুরীর যন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে যেতে পারে আশঙ্কায় বড়সর্দার, মেজোসর্দার, ছোটসর্দার প্রভৃতি মিলে ওখানকার মানুষের জীবন থেকে অবসরকে ছেঁটে ফেলে দিয়েছে। একমাত্র নবাগন্তুক নন্দিনীর ওখানে অন্তহীন অবসর। এই অবসর-সরোবর-বিলাসিনী রাজহংসী কোন্ অপরিচিত দয়িতের পত্র বহন ক'রে যক্ষপুরীতে এসে উপস্থিত। নন্দিনীর অতর্কিত অবসরের হিসাব মেলাতে না পারাতে যক্ষপুরীতে একটা বিপ্লব ঘটে গেল। ওখানকার আর একটি লোকের জীবনে অবসর ছিল। বিশু পাগল। এই অবসরটুকুও পাওয়ার জন্যে তাকে পাগল হ'তে হয়েছে। আর সকলেরই জীবন কাজ আর নেশা দিয়ে ঠাসা।

বর্তমান যুগে সমস্ত শহরগুলোই অল্পবিস্তর পরিমাণে যক্ষপুরী; যন্ত্রবাদের শহরগুলো তো নিশ্চয়ই। মানুষের প্রকৃতিগত শক্তির উদারতা জটিলাকৃত জীবনের জালের আড়ালে প্রচ্ছন্ন, বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যায়, সেটুকু মানুষ-ছাঁটা রাজা, তার নাম মকররাজ। আর যক্ষপুরীর আমরা সকলে ব্যক্তি নই, সংখ্যা মাত্র, ৬১ত, ৪৭ফ, ৭১ট,—আমরা বাস করি ট-ঠ পাড়ায়।

এই কাজে-ঠাসা যক্ষপুরীতে অবকাশ-বিনোদিনী নন্দিনী হচ্ছে শিল্পকলা-লক্ষ্মী। সে দরজায় দরজায় সেধে বেড়াচ্ছে, সাড়া দেবার মত কারো অবকাশ নেই। এক একবার দেখে চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে কিন্তু এমনি সর্দারদের চোখ মনে পড়ে,—এক একবার ব'লে উঠি, "আমরা নিরেট নিরবকাশ গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি; তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে

আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে।” কি ওই পর্যন্তই—যক্ষপুরীর জীবন-জাল ছিন্ন করবার শক্তি কবে হারিয়ে ফেলেছি। রক্তকরবী নাটকে শেষ পর্যন্ত নন্দিনীর জয় হয়েছিল বটে, কিন্তু রঞ্জনকে হারাবার মূল্যে, মকররাজ শেষ পর্যন্ত জালায়ন ছিন্ন করতে পেরেছিল বটে, কিন্তু নিজের কীর্তিকে ধ্বংশ করবার মূল্যে; বাস্তব যক্ষপুরীতে মানুষের মুক্তির সেই লগ্ন আজও আসেনি, কবে আসবে জানি না; কিন্তু ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি, শিল্পলক্ষ্মী নন্দিনী দ্বারে দ্বারে সেধে বেড়াচ্ছে। তার পথে বাধা বিস্তর। নন্দিনীর উদ্দেশ্যে অর্ঘরচনার এই সভায় তার পথের বাধা সম্বন্ধেই আলোচনা করবো।

বর্তমান যুগে এবং বর্তমান পৃথিবীতে, শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর সর্ব দেশে মহৎ শিল্প-সৃষ্টির পক্ষে প্রধান অন্তরায় তিনটি—অনবসর, প্রাদেশিকতা আর দলীয়তাবাদ।

সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত—এক কথায় যাকে আমরা শিল্প বলি—সে সমস্তই হচ্ছে অবসরের ফসল। মানব-জমিন আবাদ করতে জানলে যে-ফসল জন্মায়, শিল্প হচ্ছে তাই। মহাপুরুষদের জীবন ও শিল্প, সব শিল্পের সেরা; মানব-জমিন আবাদের প্রত্যক্ষ ফসল। পৃথিবীর বর্তমান শিল্পের অবস্থার দিকে তাকালে স্বীকার করতেই হবে যে, শিল্পমন্দাকিনীতে ভাঁটার টান বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার কারণ, প্রধান কারণ—মানুষের জীবন থেকে অবসরের সত্যযুগ গতপ্রায়। যন্ত্রযুগের প্রারম্ভে মানুষ ভেবেছিল যে, যন্ত্র তার কাজের ভার লঘু ক'রে দিয়ে তাকে এমন মুক্তি দেবে, যাতে মানুষ অবসরের প্রাচুর্যকে উদারতর ভাবে পাবে। কিন্তু বস্তুত দেখছি, তা ঘটে ওঠেনি। যন্ত্রের প্রশ্রয়ে যাবা ধন পুঞ্জিত করেছে, তাদের অনেকের জীবনে সময়ের প্রাচুর্য ঘটেছে বটে, কিন্তু সেই অবসরকে কি তারা আবাদ করতে জানে? তাদের জীবনের প্রচুর অবসর যেন পতিত জমি, তাতে হল-রেখা মনঃ-প্রকর্ষের চিহ্ন অঙ্কিত করে না, তাতে কেবল আঁগাছা জন্মে, প্রতিবেশীর স্বাস্থ্য নষ্ট করে। আর এ যুগের অধিকাংশ লোক, যারা যন্ত্রপীড়িত—রক্তকরবীর কবি যাদের বলেছেন ‘রাজার এঁটো’—তাদের

জীবনে অবসর কোথায়? কেবল শিল্পীর জীবনে অবসরের প্রাচুর্য থাকলে চলবে না; পাঠকের জীবনে, শ্রোতার জীবনে, দর্শকের জীবনে অবসর চাই। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে একটা বাড়ির পক্ষে স্বাস্থ্যকর থাকা সম্ভব নয়। অবসরের দুর্ভিক্ষগ্রস্ত সমাজে একজন লোকের অবসর কোনো কাজের নয়। লেখকের সহিত পাঠকের, শ্রোতার সহিত বক্তার, নাটকের সহিত দর্শকের যোগের মাধ্যমে হচ্ছে অবসর, আকাশটা ফাঁকা ব'লেই সূর্যকিরণ তাতে রামধনুকের তুলি চালাতে পারে। আজ মানুষের জীবনের অন্তরীক্ষলোক যে কাজের বস্তুপুঞ্জ দিয়ে ঠাসা, কল-কারখানার ধোঁয়ার তুলি ছাড়া আর কোন রঙ তাতে ধরে না। এখন যেটুকু অবসর আমরা পাই, তাকে উপভোগ করবার জন্য শিল্পচর্চা করিনে, কোন রকমে তাকে উত্তীর্ণ হবার জন্যই বই নিয়ে বসি। বলি, দাও তো হে একখানা বই, সময় কাটছে না। অনভ্যাসে এমনি অবস্থা হয়েছে যে, হাতে একটু সময় পড়লে তাকে নিয়ে কি করবো ভেবে পাইনে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে কেবল একজন মহাকবির মৃত্যু ঘটেনি, খুব সম্ভব শেষ মহাকবি অন্তর্হিত হয়েছেন। আজকার পৃথিবীতে বার্ণাড শ'কে বাদ দিলে আর কোন মহাকবি আছেন কি; আর শ' তো এযুগের লোক নন্। যন্ত্রযুগের প্রারম্ভে তাঁর জন্ম, যন্ত্রযুগের মূর্তি প্রকট হবার আগেই তাঁর জীবন উপাদান সংগ্রহ করেছিল। খুব সম্ভব এর পরে আর কোন বিশ্বজিৎ মহালেখক হবেন না, সবাই হবে অল্প-বিস্তর local সাহিত্যিক; কারণ যন্ত্রবাদ কেবল আমাদের অবসরকেই হরণ করেনি, অনাবশ্যকভাবে আমাদের জীবনকে জটিল ক'রে তুলেছে। এই জটিলতাকে আত্মসাৎ ক'রে রস বার করতে পারে, সর্বমানবগ্রাহ্য রস, মানুষের জীবন পরিধিকে সর্বানুভূতির বাহুবেষ্টনে আলিঙ্গন ক'রে ধরতে পারে—এমন বেদব্যাস শিল্পজগতে আর জন্মাবেন কি না, নিতান্ত সংশয়ের বিষয়।

শিল্পের ভাঁটা আজও হয়তো সকলের চোখে প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়েনি, কারণ আমরা যন্ত্রযুগের সূত্রপাত-সীমায় এখনো আছি।

অবসরের যুগ, এখনো বহুদূরগত নয়। মানুষের পরিজ্ঞাত ইতিহাসের পাঁচ হাজার বৎসরের শিল্পসৃষ্টি এখনো খুব দূরে গিয়ে পড়েনি, এখনো আমরা তার রসের ভাগ পাচ্ছি। কিন্তু এ যন্ত্রযুগের তো কেবল শুরু, আরও দুশো বছর যাক্। ইতিহাসের শিল্পসঞ্চয় আরও দুশো বছর পিছিয়ে পড়ুক, জীবনের অবসর আরও সংকীর্ণ হয়ে উঠুক, নূতন মহৎ শিল্প আর মনকে সরস করতে না থাকুক—তখনকার অবস্থা একবার কল্পনা করুন। তবে ভরসার মধ্যে এই যে, তখন আমি থাকবো না। কিন্তু মানুষ তো থাকবে। কি অবস্থায় থাকবে? খুব সম্ভব মহৎ শিল্পের স্বাদ সে ভুলে যাবে; রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়র, কালিদাস, গ্যেটে তার কাছে অপাচ্য লাগবে, কোন এক উৎকট ধরনের থ্রিলার ছাড়া আর কিছুতেই তার অসাড় মনকে নাড়া দিতে সমর্থ হবে না।

এই অনবসর শীতের হাওয়া ইতিমধ্যেই কি বাংলা সাহিত্যের বনে প্রবেশ করেনি? তার স্পর্শে তরুলতার পুষ্পপল্লব কি ঝ'রে প'ড়ে, অরণ্যের কঙ্কালটা ক্রমে অধিকতর প্রকট ক'রে তুলবে না? বাঙলা সাহিত্যের প্রতি বৎসর কত বই বেরুচ্ছে, সে হিসাব ক'রে লাভ নেই; কারণ, বই এখন ব্যবসার অঙ্গীভূত। কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, থ্রিলার —এই পর্যায় যদি স্বীকার করা যায় তবে সংখ্যার বিচারে থ্রিলার সর্বোচ্চ, গুণের কথা না-ই ধরলাম। কারণ ওখানে নানা প্রকার মতভেদ দেখা দেবে; এটা আবার মানুষের জীবনের অসাড়তা বৃদ্ধির সঙ্গে কার্য-কারণ সূত্রে জড়িত। ইংরেজী বইয়ের বাজারের কথাটা একবার স্মরণ ক'রে দেখুন। এ সমস্তের মূলে আছে অবসরহীনতার অভিশাপ। সাহিত্যে তথা মহৎ শিল্পসৃষ্টির এইটে প্রথম অন্তরায়। এ সমস্যা বাঙলা সাহিত্যের যেমন, পৃথিবীর সাহিত্যেও তেমনি—স্বতন্ত্র ক'রে ভেবে লাভ নেই, আজকার দিনে একটিই সমস্যা আছে, জগৎসমস্যা।

বাঙলা সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বিতীয় অন্তরায় প্রাদেশিকতা।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আজ ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশকে প্রাদেশিকতা-বুদ্ধির ভূতে পেয়ে বসেছে, বাংলা দেশকেও পেয়েছে।

বাঙলা দেশের ক্ষেত্রে এটা বিশেষ বিস্ময়কর, কারণ গত শতাব্দীতে সর্বভারতীয়ত্ববোধের উন্মেষ প্রথমে বাঙলা দেশেই দেখা গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, অন্যান্য অনেক মহৎভাবের মতোই সর্বভারতীয়তা-বোধেরও উদ্ভব রামমোহনের চিত্তে। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ভাবনায়কেরা সকলেই এবং পরবর্তী কালের বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ভারতসত্তাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে সেই উপাদানে তাঁদের রচনা, অভিমত ও জীবন গঠন ক'রে তুলেছিলেন। সেকালের সমস্ত সভাই ছিল ভারত-সভা, সমস্ত সঙ্গীতই ছিল ভারত-সঙ্গীত। নূতন বাঙলা সাহিত্য যে অচিরে পরিণতি লাভ করেছিল তার কারণ সে সাহিত্য ছিল ভারতরসে পুষ্ট আর সেইজন্যেই অনায়াসে সমস্ত ভারতবর্ষের মনোহরণ করতে সক্ষম হয়েছিল, 'বঙ্গ' কথা তখনো সাহিত্যে প্রবেশলাভ করেনি। আমি অন্য প্রসঙ্গে অনেকবার বলেছি সোনার বাংলার মায়ামৃগ আরও পরবর্তী কালের ডেপুটি সাহিত্যিকদের সৃষ্টি। ভারতীয়তাবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই তখনকার বাঙলা সাহিত্য ছোটখাটো ত্রুটি সত্ত্বেও Urbanity-গুণে পৌঁছতে পেরেছিল। এখনকার বাঙলা সাহিত্য বৈদেশিক তত্ত্ব ও বৈদেশিক প্রভাবের যতই বড়াই করুক না কেন, পূর্বতন Urbanity-গুণ তাতে বিরল, বড়জোর তাকে Sub-Urban বলা যেতে পারে।

এমনতরো পরিবর্তনের কারণ কি? কতকগুলো বাহ্য কারণ আছে। যতদিন কলকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল, নানা বিচিত্র পথিকের আনাগোনা তখন এদেশে ছিল। আবার বাঙলা দেশেই ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যাপক প্রতিষ্ঠা প্রথমে ঘটেছিল। এই দুটি বাহ্য কারণ বাঙলা দেশকে স্বভাবতই ভারত-চেতন করে তুলেছিল। তারপরে এক সময়ে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে অপসারিত হ'ল; তার কিছু আগে এলো বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন। আপনারা জানেন এ দুটো ঘটনার মধ্যে কার্যকারণের একটা সূত্র আছে। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় প্রয়োজনের তাগিদে বঙ্গ শব্দটার উপরে অত্যন্ত বেশী ঝোঁক দেওয়া

হ'ল। তখনকার সব জাতীয় সঙ্গীতই বঙ্গ-সঙ্গীত, আগেকার মতো আর ভারত-সঙ্গীত নয়। প্রাকৃত জনের চিত্তে একটা ভাবের অনুপাত-বৈষম্য ঘটে গেল, প্রদেশ হ'য়ে উঠল দেশের চেয়ে বড়। অবশেষে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হ'ল বটে, কিন্তু মনে মনে ভারত-ভঙ্গ ঘটে গেল। আমি জানি বাঙলা দেশে এমন শিক্ষিত লোক যথেষ্ট আছেন ভারত কথাটা যাঁদের কাছে নিরর্থক, ভারতীয়তাবোধ তাঁদের বিবমিষা জাগ্রত করে দেয়—বাঙলা দেশ ছাড়া আর কোন সত্তা তাঁরা সহ্য করতে পারেন না ব'লে। অস্তিত্বের গণ্ডিকে একবার ছোট করতে আরম্ভ করলে তার পরিণাম কোন্ অলক্ষ্যপ্রায় বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছবে কে বলতে পারে? এই প্রক্রিয়ার ফলে আমাদের জীবনপরিধি সঙ্কীর্ণতর হচ্ছে, আর তারই সঙ্গে তাল রেখে আমাদের সাহিত্যের প্রতিষ্ঠার ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ হচ্ছে। কোন্ বইখানায় কতগুলো তত্ত্ব, কতগুলো বাস্তব বা অবাস্তব 'Ism' আছে, তা দিয়ে বইখানার বিচার চলতে পারে না। বইখানার পেছনে যে লেখক আছেন তাঁর মনের উদারতা, শিক্ষাদীক্ষা, অভিজ্ঞতা—এইগুলোই হচ্ছে গ্রন্থের আসল পটভূমি। লেখকের মনের গুণ লেখায় সঞ্চারিত হবেই। আজকার দিনে বাঙলা সাহিত্যের অধিকাংশ বই লেখকের মনের দীনতার ছাপ বহন করছে। ধার-করা রাজপোশাকে ভিখারি রাজা হয় না, ধার-করা তত্ত্বে, ভাড়া-করা টেকনিকে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভকালের পাঁচালি ও কবিগান যেমন নিতান্ত গ্রাম্য রচনা ছিল—বর্তমান কালে যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে, গদ্য এবং পদ্য দুই-ই, তাতেও সেই গ্রাম্যতার লক্ষণ ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে দেখা দিচ্ছে। গ্রামে রচিত রচনাই গ্রাম্য নয়। গ্রামে রচিত বৈষ্ণব পদাবলী সর্বজনগ্রাহ্য। গ্রামে রচিত ময়মনসিংহ-গীতিকার অধিকাংশও সর্বজনগ্রাহ্য। শহরে রচিত হ'লেও সাহিত্যের গ্রাম্য হতে বাধা নেই। সেকালের কবি-গানের অনেক পালাই তৎকালীন কলকাতা শহরে রচিত, তৎসত্ত্বেও সে সমস্তই নিতান্ত গ্রাম্য। একালের কলকাতায় রচিত অধিকাংশ রচনাও গ্রাম্য। কোন কোন আধুনিক কবির কবিতায় Rhythm-এ, ছন্দঃস্পন্দে দাশরথির ছন্দ ধ্বনিত,

দাশরথির টেকনিকও স্পষ্টপ্রায়। দুই কবির কবিতা আবৃত্তি ক'রে মিল দেখিয়ে দেওয়া কঠিন নয়, কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তিগত আক্রমণ হবে মনে ক'রেই সে কাজে নিরস্ত থাকলাম। আসল কথা গ্রাম্যতা দোষের সৃষ্টি শহরেও নয়, গ্রামেও নয়, মনের মধ্যে। প্রাদেশিকতাবোধের সঙ্কীর্ণতর রূপ গ্রাম্যতা দোষ। আমাদের বর্তমান সাহিত্যের গ্রাম্যতাই প্রমাণ করে আমাদের সাহিত্যে প্রাদেশিকতাবোধ কতখানি মজ্জাগত হয়ে পড়েছে—এই অল্প সময়ের মধ্যে। অনেকে বলবেন, প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা-বুদ্ধি শুধু বাঙলাদেশকে পেয়ে বসেনি, অন্যান্য প্রদেশগুলোকেও পেয়ে বসেছে। অবশ্যই পেয়ে বসেছে। তারাও ভুগবে, কিন্তু তাতে ক'রে আমাদের দুর্ভোগ বাঁচে কি ভাবে? প্রাদেশিক-বুদ্ধি যে সর্বত্র দেখা দিচ্ছে, তার কারণ সর্বভারতীয়তাবোধ সুদৃঢ় বনিয়াদ পায়নি, ভিতরে ভিতরে কাঁচা ছিল। ইংরেজ-শাসনের বন্ধন আর ইংরেজ-তাড়ানোর উৎসাহ এই দুই সূত্রে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলো এতকাল গ্রথিত ছিল। এখন ইংরেজ ও ইংরেজ-শাসন দুই-ই অপসৃত। সেই সঙ্গে, যে সূত্রে প্রদেশগুলো বাঁধা ছিল, সেই সূত্রও অপসৃত। অন্তরের যোগে যা যুক্ত হয়নি, বাইরের বাঁধন খুলতেই তা খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে গেল। এইতো আমাদের অবস্থা।

প্রাদেশিকতাবোধের রেষারেষি রাজনীতিক্ষেত্রে ক্রমে উগ্র হয়ে উঠেছে। রাজনীতিকরা বলেন, রেষারেষিতেই নাকি রাজনীতির স্বাস্থ্য। হবেও বা! কিন্তু সাহিত্যের স্বাস্থ্য ব'লে যদি কিছু কল্পনা করা যায়, রেষারেষিতে তা ভঙ্গ হবারই আশঙ্কা। বাঙলা সাহিত্যের স্বাস্থ্যভঙ্গ হ'তে আরম্ভ হয়েছে।—এর প্রতিকারের উপায় কি? উপায় তো আবিষ্কার করতেই হবে; নতুবা বাঙলা সাহিত্যের গ্রাম্যতা দোষের পথ রুদ্ধ হবে কিভাবে? এই হ'ল গিয়ে বাঙলা সাহিত্যের দ্বিতীয় সমস্যা।

২

বাঙলা সাহিত্যের তৃতীয়তম, নূতনতম এবং কঠিনতম সমস্যা হ'ল দলীয়তাবাদ। দলীয়তাবাদ কথাটা কানে নূতন ঠেকলেও শব্দটা প্রায়

দলাদলির মতোই পুরাতন। বর্তমান যুগের একটা টান আন্তর্জাতিকতা, সর্বজাতিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা তার আদর্শ। তারই প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দিয়েছে ছোটবড় দল-উপদলের ফাটল-ধরালো তত্ত্ব। মানুষ যখন তক্তাপোশে শুয়ে সর্বজাতীয়ত্বের স্বপ্ন দেখছে, তখন যে ধীরে ধীরে তার তক্তাপোশের কাঠগুলো আলাদা হয়ে যাচ্ছে—আর এক মুহূর্ত পরেই সে ধরাশায়ী হবে, তা কি সে ভাবতে পারছে? দলাদলি সব সময়েই ছিল, আর রাজনীতি মানেই বোধকরি দলাদলি, কাজেই দলাদলি তার অস্তিত্বের পুরোনো দলিলখানা দেখিয়ে সমালোচককে নীরব ক'রে দিতে পারে। কিন্তু আধুনিক যুগের রাজনৈতিক দলাদলি আর রাজনীতিমাত্র নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, মানুষের সমগ্র জীবনকে সে আক্রমণ করেছে। এমন কি সাহিত্য, শিল্প, ধর্মের মতো সর্বজনীন, সর্বকালীন বস্তুকেও সে নিজের সীমার বহির্গত মনে করে না। বস্তুত সর্বজনীন, সর্বকালীন শাশ্বতকেই সে মানে না। মানলেই যে বিপদ। যখন যেমন সুবিধা, তখন তেমন কর্মপদ্ধতি—এই নীতি অবলম্বন ক'রে যারা দলীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধি করছে, কোন-কিছু নিত্য বা ধ্রুব—একথা তারা স্বীকার করবে কেমন ক'রে? তাতে যে দলের ভিত্তিটাই ধ্বসে যায়। ধর্মকে দলীয়তাবাদ অস্বীকার করে না, কেবল নিজের দৃষ্টি দিয়ে তার এমন ব্যাখ্যা করে, যাতে দলীয় আদর্শের প্রতিষ্ঠা বাড়ে। সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতিকেও তারা দলীয় ছাঁচে ঢালাই ক'রে নিয়েছে। অর্থাৎ দলীয় ব্যাখ্যার হাতে প'ড়ে সাহিত্য প্রচারপত্রে ও জার্নালিজমে পরিণত হয়েছে। অবশ্য দলীয়তাবাদ বলে যে, মানুষের কল্যাণই তার কাম্য। কিন্তু মানুষের কল্যাণ কার কাম্য নয়? যে অসভ্য নরখাদক জাতি বংশের বৃদ্ধগণকে বা পরাজিত শত্রুগণকে কেটেকুটে খেয়ে ফেলে, তারাও মানবকল্যাণের আদর্শ নিয়েই ওই কাজটি করে। কাজেই মানবকল্যাণের প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। শিল্পের লক্ষ্য মানুষ, দলীয়তাবাদের লক্ষ্য দলীয় মানুষ; শিল্পের আদর্শ মানুষের প্রতিষ্ঠা, দলীয়তাবাদের আদর্শ দলীয়তা প্রতিষ্ঠা; শিল্প শাশ্বত ব'লে একটা নিত্যবস্তু স্বীকার করে, দলীয়তাবাদ বলে মানুষের ইতিহাস মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে, ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে লাফিয়ে

লাফিয়ে চলছে—নিত্য কিছু নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে, শিল্প ও দলীয়তাবাদের ভিত্তিই ভিন্ন। তৎসত্ত্বেও যদি দেখতাম যে, দলীয়তাবাদের ফলে কোন মহৎ শিল্প সৃষ্টি হয়েচে, তবু তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অবশ্য দল-উপদলগুলো বলবে যে, মহৎ শিল্পের অভাব কি? প্রত্যেক দলই যে মহৎ শিল্প ও শিল্পীর দাবি রাখে। প্রত্যেক দলই বলে যে, আমার দলের বা আমার দলের সঙ্গে সহানুভূতি-সম্পন্ন অমুক লেখক—লেখকের সেরা। এই ব'লে দলের প্রচারযন্ত্র সেই লেখকের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে লেগে যায়। নিরীহ পাঠকের পক্ষে কতক্ষণ আর মাথা ঠিক রাখা সম্ভব। ক্রমে সে দলের প্রচার-কার্যকে স্বীকার ক'রে নেয়; দল ভাবে, যাক্, আর একটি পাঠক পরোক্ষে আমার hegemony বা সর্বাধিনায়কত্ব স্বীকার ক'রে নিল। বিদেশে দলীয়তাবাদ বেশ কায়েম ক'রে বসেছে। সে-দেশের অনেক স্থানেই রাজনৈতিক দল বা গভর্ণমেণ্ট জাতির জীবনকে এমনভাবে আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে, যাতে শিল্পীরাও স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে। কালক্রমে শিল্পের স্বাধীনতার নাম পর্যন্ত যখন লোকে বিস্মৃত হবে, তখন ওই পরাধীনতাকেই স্বাধীনতা ব'লে মনে করতে থাকব!

বিদেশের এই ঢেউ এদেশে এসে পৌঁচেছে; বাঙলাদেশেও পৌঁচেছে। বাঙলাদেশে রাজনৈতিক দলের অভাব কোনকালেই ছিল না। কিন্তু তখন তারা শিল্পকে control করার স্বপ্ন দেখেনি। কিন্তু এখনকার কথা স্বতন্ত্র। এখনকার প্রত্যেক রাজনৈতিক দল মানুষের জীবনকে সর্বাত্মকভাবে আয়ত্ত করতে চায়। বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক সাহিত্য ও রাজনীতির দিকে তাকালে আমার উক্তির সমর্থন পাবেন বলেই বিশ্বাস করি। সার্কাসের দল যেমন সগর্বে ঘোষণা করে যে, তার দলে ক'টা রয়াল বেঙ্গল টাইগার, হাতী, ভাল্লুক প্রভৃতি আছে, আর তাই দিয়েই তার কৌলিন্যের বিচার হয়, রাজনৈতিক দলগুলোও তেমনি ঘোষণা করে যে, তার দলে কোন্ সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, নৃত্যশিল্পী প্রভৃতি আছেন।

একক সাধনার যুগ বর্তমান কাল নয়। দল পাকিয়ে শক্তিমান হওয়া এ-কালের লক্ষণ। দলের হাতেই ধন-মানের দক্ষিণা থাকাতে সাহিত্যিকগণও একে একে এ-দলে ও-দলে ভিড়ে পড়ছেন। যাঁরা এখনও দূরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা দেখছেন, যেখানে হরিরলুঠের বাতাসা ভাগ হচ্ছে, সেখানে তাঁদের স্থান নেই, তাঁদের কেউ বড় গ্রাহ্য করছে না। তখন তাঁরাও হয়তো দলীয়তাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। এই প্রক্রিয়া বাঙলাদেশে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে—আর সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের মূল আদর্শ বিস্মৃত হয়ে গিয়ে শিল্পীরা ধর্মচ্যুত হয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষের দীর্ঘকালস্থায়ী পরাধীনতার মধ্যেও বাঙলাদেশ তার সাহিত্যের জানালাটা খুলে রাখতে সমর্থ হয়েছিল, তাতেই সমস্ত দেশ বেঁচে গিয়েছে। আজ দেখছি, সেই জানালা বন্ধ করবার ষড়যন্ত্র চলছে। মানুষ যে বৃহৎ পৃথিবীর বাতাসকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করবে দলীয়তাবাদ তা সহ্য করতে পারে না, তার নিজস্ব Oxygen Cylinder-এর বাষ্পের পরিমাপিত নিঃশ্বাস মানুষ গ্রহণ করুক, প্রত্যেক প্রশ্বাসে তার জয়ধ্বনি নিঃসৃত হোক—এই তার কাম্য।

পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ রাষ্ট্রের নিকটে আত্মসমর্পণ করার ফলেই আণবিক বোমার ন্যায় সর্বনাশের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে—এখন শিল্পীরা যদি দল বা রাষ্ট্রের নিকটে আত্মসমর্পণ ক'রে বসে, তবেই চমৎকার। যুদ্ধকালীন অবস্থায় প'ড়ে অনেক রকম কন্‌ট্রোলই দেখলাম, এখন শিল্পের কন্‌ট্রোল দেখা বাকি আছে। এই ব্যাপারও শীঘ্রই স্বচক্ষে দেখতে হবে, কিংবা আংশিকভাবে দেখছি বলাই উচিত। শিল্পের বন্ধনের আশঙ্কা সর্বত্র দেখা দিয়েছে—বাঙলা সাহিত্যেও দেখা দিয়েছে। এইটি বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে সবচেয়ে বড় আশঙ্কার কারণ। যক্ষপুরীর মতো স্থানেও নন্দিনীকে কেউ বাঁধতে পারেনি। আর এখানে নন্দিনীকে নাচওয়ালীর দলে ভিড়িয়ে সর্দারদের বাগানবাড়িতে পাঠাবার ষড়যন্ত্র চলছে। এ-দৃশ্যও কি রঞ্জনকে দেখতে হবে? মানুষ মাত্রেই রঞ্জন। যক্ষপুরীর রঞ্জনের সৌভাগ্য যে, সে ম'রে বেঁচেছিল। আমাদের রঞ্জনকে বেঁচে মরতে হবে, তাকে দেখতে হবে যে, তার

প্রেয়সী শিল্পকলা-নন্দিনী পেশোয়াজ প'রে সর্দারের যষ্টি-শাসনের তালে তালে দলীয়তাবাদের জয়ধ্বনি পায়ের ঘুঙুরে বাজিয়ে আসর মাত করছে! এই শোচনীয় কাণ্ড যাতে না ঘটতে পারে, শিল্পী ও শিল্পরসিকদের এখনই সে বিষয়ে অবহিত হয়ে ওঠা আবশ্যক।

৩

এই তো আমাদের অবস্থা। এখন কর্তব্য কি? প্রতিকারের উপায় কি? জানি না। আর ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি যে, মানুষে কখনো দেখে শেখে না, ঠেকে শেখাই তার অভ্যাস। কোন একটা দুর্গতি চরম পর্যন্ত না গিয়ে থামে না। বাঙলা সাহিত্যের দুর্গতিও চরম পর্যন্ত যাবে, আর সেজন্যেই আমাদের প্রস্তুত হয়ে থাকা ভালো। তবে সাধারণভাবে দু'একটা কথা বলা যেতে পারে। মুখে আমরা যাই বলি না কেন, মন আমাদের এখনো পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে আছে। এখন পশ্চিম দিক থেকে নিজের দিকে মুখ ফেরাবার সময় এসেছে—তারই আর এক নাম আত্মস্থ হওয়া। পশ্চিম এক সময়ে আমাদের নবজাগরণে সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আজ পশ্চিম আমাদের মনের খাদ্য যোগাতে পারবে কিনা তা সন্দেহের বিষয়। বরঞ্চ দেখছি অনেক বিদেশী শক্তিমান লেখক ভারতের উপনিষদে ও যোগশাস্ত্রে জীবনের পাথেয় সন্ধান করতে আরম্ভ করেছেন। বিদেশ থেকে এখন আমরা একটা Steam engine বা ওইজাতীয় দু'একটা যন্ত্রপাতি নিতে পারি; কিন্তু তার বেশি পাশ্চাত্যদেশ আর কিছু আজ আমাদের যোগাতে অক্ষম। যে-দেশের মাটিতে এখনো গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব, মনে রাখতে হবে তার সম্ভাবনার অন্ত নাই। গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের জন্মের ফলে ভারতবর্ষ সমস্ত জগতের আধ্যাত্মিক উত্তমর্ণে পরিণত হয়েছে। এ দেশের সাহিত্যিক, শিল্পী যখন কাঙালের বেশে ইউরোপের কাছে হাত পাতে তখন লজ্জা অধিক হয়, কি দুঃখ অধিক হয় বলা কঠিন। তখন বুঝতে পারি, শিল্পীর দিব্যদৃষ্টি থেকে এরা বঞ্চিত, নতুবা ঘরের সম্পদের

সৃন্ধান জানবে না কেন? উনবিংশ শতকের অধমর্ণ ভারত আজ উত্তমর্ণে পরিণত, এই সত্যটা এখনো আমাদের বুঝতে বাকি আছে।

বাঙালী সাহিত্যিকগণ যদি কিছু সংস্কৃত শেখেন, তবে তাঁদের আত্মস্থ হবার সাহায্য হবে, তাঁদের দৃষ্টি ভারতবর্ষের দূরকালের দিকে প্রসারিত হবার সুযোগ পাবে। আর সেই সঙ্গে তাঁরা যদি কিছু হিন্দী শেখেন তবে তাঁদের দৃষ্টি বিপুল ভারতবর্ষের দিকে আপনি বিস্তারিত হয়ে যাবে। সংস্কৃত এবং হিন্দী দেশে কালে বিস্তৃত ভারতীয় জীবনকে জানতে সাহায্য করবে।

বর্তমান জটিল জীবনের জেলখানার অন্তরালে যক্ষপুরীর মানবরাজ মুক্তির জন্য আজ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, এখন কে তাকে মুক্তির পথ দেখাবে? এই যক্ষপুরীতে আছে এক নন্দিনী, সে তার খোঁপায় নীলকণ্ঠ পাখির পালক গুঁজে প্রস্তুত। শিল্পলক্ষ্মীই মানুষকে বন্ধন-দশা থেকে মুক্তি দিতে পারে; কিন্তু সবচেয়ে শোচনীয় লক্ষণ এই যে, মানুষ আজ তাকেও বাঁধবার ষড়যন্ত্র করতে উদ্যত। অদৃষ্ট যখন বিরূপ হয়, তখন কারাগারের রক্ষীকেই মুক্তিদাতা ব'লে মনে হয়, আর মুক্তিদাতাকে বাঁধবার ইচ্ছা মনের মধ্যে দেখা দিতে থাকে। মানব সমাজে সেই ইচ্ছা আজ প্রকট হয়ে উঠেছে, সর্বনাশ চরমে পৌঁছবার আগেই যক্ষপুরী থেকে বেরিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, শিল্পলক্ষ্মী নন্দিনী এই বিপ্লবের সহচরী, খোঁপায় তার নীল আকাশের আশীর্বাদের মতো নীলকণ্ঠ পাখির পালক, মণিবন্ধে তার অনুরাগের রঙে দীপ্ত রক্তকরবীর গুচ্ছ! শিল্প ও মানুষ একসঙ্গে বাঁচবে, কিংবা এক সর্ব-নাশের তলে তলিয়ে যাবে সেই পরীক্ষার পরম মুহূর্ত আজ সমাগত। তাই আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে আর একবার ব'লে নিই—জয় হোক নন্দিনীর জয় হোক।*

*জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত চলন্তিকা সাহিত্য-সভায় পঠিত অভিভাষণ; ১৯৪৮-মার্চ।

জর্নালিজম্ ও সাহিত্য

জর্নালিজম্ কি বুঝি, সাহিত্য কি তাহাও বুঝি, কিন্তু এ দুইয়ে প্রভেদটা কোথায় সহজে বুঝিতে পারি না। অনুমানে বুঝি একটা প্রভেদ কোথাও আছে—কিন্তু কোথায়? এবং কিসে? কোন্ গুণের তারতম্যে সাহিত্য জর্নালিজম হইয়া পড়ে, কিংবা কোন্ গুণের সঞ্চার হইলে জর্নালিজম্ সাহিত্য হইয়া ওঠে? রসিক ব্যক্তি বলিতে পারেন, না ভাবিয়া লিখিলে জর্নালিজম্, ভাবিয়া লিখিলে সাহিত্য। কিন্তু তাই কি? তবে জর্নালিজম্ অনেক সময়ে এত গুরুভার কেন? কাজেই প্রভেদের ওই সংজ্ঞাকে মানিয়া লওয়া যায় না। জর্নালিজম্ ও সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ বিচার করিয়া তাহাদের সংজ্ঞা নির্দেশের চেষ্টাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু তৎপূর্বে জর্নালিজম্ ও সাহিত্যের আপেক্ষিক সম্বন্ধটি পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক।

বর্তমান কাল জর্নালিজমের যুগ। রচনার রাজপথে জর্নালিজম্ ও সাহিত্য যুগল-পথিক। রচনার আদিমকাল হইতে পথিকদ্বয় পথে চলিতেছে। কিন্তু আজকাল জর্নালিজমের যে গৌরব, যে শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞান ও আত্মাভিমান এমন কোন কালে ছিল না। যে জর্নালিজম্ সাহিত্যের তল্পাবাহক ছিল, আজ সে সাহিত্যের স্কন্ধে আপনার পুরাতন গ্লাডস্টোন ব্যাগটি তুলিয়া দিয়াছে। এ যুগ তো বাহন পরিবর্তনের লক্ষণাক্রান্ত।* জমিদারের পাইক এখন জমিদারের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাশালী, কারখানার মালিক কারখানার মজুরদের অনুগ্রহপ্রার্থী। নিতান্ত পূর্বজন্মের দুষ্কৃতি না থাকিলে এ যুগে কেহ মালিক বা মনিব

হয় না। আমরা লক্ষণের বিচার করিতে বসিয়া এ সব বলিতে বাধ্য হইতেছি, কোন্‌টা উচিত আর কোন্‌টা অনুচিত বলা আমাদের এখানে উদ্দেশ্য নয় [অবশ্য প্রয়োজন হইলে (এবং না হইলে)—তাহাও বলিতে পারি]। যুগধর্মের নিয়মানুসারে সাহিত্য ও জর্নালিজমেরও গুরুত্বে তারতম্য ঘটিয়া গিয়াছে। বৈশ্য-জর্নালিজম্ সাহিত্য-ব্রাহ্মণের আসর জবর দখল করিয়া উপবীত ধারণ করিয়াছে। আবার সাহিত্যও নিজের নাম ও জাতি ভাঁড়াইয়া জর্নালিজমের দলে ঢুকিয়া পড়িয়াছে —অনেক সময়েই চিনিবার উপায় নাই। এ দুইয়ের বর্ণবিনিময় এ-যুগের বিশেষ লক্ষণ। পূর্বে এমন ছিল না, যদিচ জর্নালিজম্ সব কালেই ছিল। জর্নালিজম্ যে কেবল সর্বকালে ছিল এমন নয়, রচনার সর্ব শাখায় ছিল —এখনো আছে।

মহাকাব্য, কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি সর্বশাখাতেই জর্নালিজম্ ও সাহিত্য দুই শ্রেণীর রচনাই আছে। পোলিটিকাল জর্নালিজম্ মূল জর্নালিজমের একাংশ এবং ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। কয়েকটি উদাহরণ লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে।

হোমারের মহাকাব্যদ্বয় যদি হয় সাহিত্য, তবে হেসিয়ডের (Hesiod) 'Works and Days' জর্নালিজম্ ছাড়া আর কিছুই নয়। চশারের কাব্য সাহিত্য, Langland-এর 'The Vision of Piers the Plouman' জর্নালিজম্। শেক্সপীয়রের নাটক সাহিত্য, আর তাঁহার সমকালীন 'University Wits' বলিয়া কথিত নাট্যকারগণের (Marlowe বাদে) অধিকাংশ রচনাই জর্নালিজম্। আমাদের দেশে বেদের কর্মকাণ্ড জর্নালিজম্, জ্ঞানকাণ্ড সাহিত্য। কালিদাসের কাব্য যদি সাহিত্য হয়, ভট্টিকাব্যম্ জর্নালিজমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়, শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন ও পথের দাবী এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম জর্নালিজমের কান ঘেঁসিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। বিভূতিবাবুর পথের পাঁচালী সাহিত্য, আর আধুনিক বামপন্থী লেখকগণের অধিকাংশ রচনা

জর্নালিজম্। (কত নাম করিব—স্থানাভাব!) ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দর সাহিত্য, কিন্তু রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর জর্নালিজম্ ছাড়া আর কিছু নয়।

সাহিত্যিক বিচারে পরমোৎকর্ষ লাভ করিতে না পারিলেই যে কোন রচনাকে জর্নালিজম্ বলিতে হইবে এমন নয়। ইংরেজী সাহিত্যে যে সব নাটককে Restoration Comedy বলা হয়, সেগুলি চতুর রচনার দৃষ্টান্ত হইলেও অত্যুচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য নয়। অস্কার ওয়াইল্ডের নাটকগুলিও সুচতুর রচনার দৃষ্টান্ত—অত্যুচ্চ শ্রেণীর নাটকের নহে। কিন্তু যেহেতু এসব অপেক্ষাকৃত নিম্নতর শ্রেণীর রচনা—তাই বলিয়াই এগুলিকে জর্নালিজম্ মনে করিলে ভুল হইবে। এগুলি সাহিত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। জর্নালিজমের বিশেষ লক্ষণ এ সবে নাই। এ সমস্ত নাটক নিজের রচিত কৃত্রিম সংস্কার ও আবহাওয়ার মধ্যে বিধৃত। তৎসত্ত্বেও এগুলি আজিও যে উপভোগ্য তাহার কারণ এসব কৃত্রিম। গাছের ফুল দুদিন বাদে ঝরিয়া মরিয়া যায়, কাগজের কৃত্রিম ফুলের দীর্ঘকাল টিকিয়া থাকিতে বাধা নাই।

আবার জর্নালিজম্ হইলেই যে দু'দিন বাদে নষ্ট হইয়া যাইবে এমন নয়। ভল্‌টেয়ার যে-সব রচনাকে জর্নলিজম্ মনে করিয়া লিখিয়া-ছিলেন আজ সেই দুয়োরাণীর সন্তানগুলোই তাঁহার নাম অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার Candide ও তজ্জাতীয় রচনা জর্নালিজম্। আর যে-সব কাব্য ও নাটকের জন্য তৎকালীন লোকে তাঁহাকে হোমারের চেয়ে বড় কর্নে'ই রাসিনের চেয়ে (সে যুগের ফরাসী সাহিত্যবিচারক শেক্সপীয়রকে মহৎ বা major লেখক মনে করিত না) শ্রেষ্টতর মনে করিত, সে-সব রচনা আজ কে পাঠ করে?

কাজেই দেখা গেল, অপেক্ষাকৃত নিম্নতর শ্রেণীর রচনা হইলেই যে জর্নালিজম্ হইবে এমন নয়, বিশেষ প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশ্যে লিখিত হইলেই যে জর্নলিজম্ হইবে এমন নয়, কিংবা লিখিত হইয়া যথাকালে বিস্মৃত হইয়া গেলেই যে জর্নালিজম্ হইবে—এমনও নয়। তবে

জর্নালিজমের বিশেষ লক্ষণ কি? সাহিত্যের সঙ্গে তাহার পার্থক্য কোন্ গুণে?

২

জর্নালিজমের বিশিষ্ট লক্ষণ সমাজ চৈতন্য, সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ জীবন-চৈতন্য। জর্নালিজমে সমাজ-চৈতন্য থাকিলেই যথেষ্ট, জীবন-চৈতন্য থাকিতে পারে, না থাকিলেও ক্ষতি নাই। সাহিত্যে জীবন-চৈতন্য অবশ্যই থাকিবে, সমাজ-চৈতন্য থাকিলেও ক্ষতি নাই। বিশেষ দেশ ও কালে লিখিত বলিয়া সাহিত্যে সমাজ-চৈতন্য অনেক সময়ে থাকিয়া যায়—সাহিত্যিকও সামাজিক জীব বলিয়া অনেক সময়ে তাহার অজ্ঞাতসারেই থাকিয়া যায়, কিন্তু ওইখানেই তাহার থামিয়া গেলে চলিবে না, রচনা সাহিত্য-পদ-বাচ্য হইতে গেলে রচনাকে জীবন-চৈতন্য পর্যন্ত উন্নীত করিতে হইবে। জর্নালিজমের আরও অনেক গৌণ গুণ থাকিতে পারে—প্রায়শ থাকিয়া যায়, কিন্তু সমাজ-চৈতন্য না থাকিলে রচনাকে অন্য কোন পর্যায়ে ফেলিতে হইবে, জর্নালিজম্ বলা চলিবে না। জর্নালিজম্ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লিখিত হইতে পারে, সামাজিক ঘটনার চাপে লিখিত হইতে পারে, কিন্তু যে কারণেই হোক, যে-সমাজে তাহার উদ্ভব তাহার আবহাওয়াকে নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সাহিত্য ও জর্নালিজমে বাহিরের দিক হইতে বিশেষ পার্থক্য নাই—কারণ সাহিত্যও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বা সাময়িক ঘটনার চাপে লিখিত হইতে বাধা নাই, বরঞ্চ অনেক সময়েই পূর্বোক্ত কারণে বা ভাবে লিখিত হইয়া থাকে—প্রভেদটা প্রক্রিয়ায় নহে, পরিণামে।

কয়েকটি উদাহরণ সহযোগে বক্তব্য বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের সমকালে লিখিত রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি সরাসরি পোলিটিকাল জর্নালিজম্ ছাড়া আর কিছুই নয়। এতকাল পরেও সেগুলি সুপাঠ্য এবং আজিকার দিনেও গ্রহণ করা যাইতে পারে এমন অনেক বস্তু এই সব রচনায় আছে,—

অথচ তৎকালীন সংবাদপত্রের 'জর্নালিজম'গুলি আজ কোথায়? এই প্রভেদের একটা কারণ অবশ্য, নিছক রচনার শিল্পকৌশলে রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়। কিন্তু ইহা একটা মাত্র কারণ, একমাত্র কারণ নহে। আসল কারণ, সংবাদপত্রের লেখক রচনায় সমাজ-চেতনার সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ আরও অগ্রসর হইয়া জীবন-চৈতন্যে পৌঁছিয়াছেন। এই জীবন-চৈতন্যই তাঁহার জর্নালিজমকে আজিও সুপাঠ্য করিয়া রাখিয়াছে। নতুবা নিছক রচনা বা স্টাইলের উৎকর্ষ কোন গ্রন্থকে দীর্ঘকাল জীয়াইয়া রাখিতে পারে না। যে গুণে রচনা অমর হয় তাহার নাম জীবন-চৈতন্য। যে রচনায় এই গুণ প্রচুর পরিমাণে আছে তাহার আয়ুষ্কাল স্বভাবতই দীর্ঘ। সমাজ-চৈতন্য রচনাকে কিছুকাল বাঁচাইয়া বাখিতে পারে—কিন্তু সমাজের পরিবর্তন হইলেই সেই রচনার ভিত্তি ভাঙিয়া পড়ে।

বার্নার্ড শ' ও চেস্টারটনের অনেক রচনা মূলত জর্নালিজম্, কিন্তু জীবন-চৈতন্যের রস বহুল পরিমাণে তাহাতে আছে বলিযা সেগুলি সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত হইয়া এখনও সর্বজনপাঠ্য হইয়া আছে।

শেক্সপীয়রের 'Merry Wives of Windsor' নাটকের জর্নালিজম্। বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে নাটকখানি লিখিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। ফলস্টাফ প্রেমে পড়িলে কিরূপ আচরণ করে রাণী এলিজাবেথের তাহা দেখিবার ইচ্ছা হওয়ায় রাণীর অনুজ্ঞাক্রমে নাটকখানি লিখিত হইয়াছিল। মূলপ্রেরণার বিচারে নাটকখানি বহুকাল বিস্মৃত হইবার কথা। কিন্তু চতুর কবি রাণীর ইচ্ছাকে অতিক্রম করিয়া অনেক পরিমাণে জীবন-চৈতন্য বা জীবন-রস ইহাতে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন।

আবার বিপরীত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। হোমারের মহাকাব্য দুইখানি ঘনীভূত সাহিত্য। কিন্তু তাহাতেও সমাজ-চৈতন্যের যথেষ্ট চিহ্ন আছে। রাজকুমারী নসিকা সখী-সহচারিণী হইয়া সমুদ্র তীরে কাপড় কাচিতে গিয়াছেন। এই তথ্যটি সমাজ-চৈতন্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তৎকালে ও তৎসমাজে রাজকুমারীদের পক্ষেও প্রকাশ্যে

কাপড় কাচা যে সামাজিক বিধি-বহির্ভূত ছিল না—এই ঘটনাটি তাহারই প্রমাণ। ইহা বিশেষ-এক কালের, বিশেষ-এক দেশের—অর্থাৎ বিশেষ-এক সমাজের লক্ষণ। আধুনিক কোন রাজকুমারীর পক্ষে এমন কাজের কল্পনাও অসম্ভব। এমন সমাজ-চৈতন্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত হোমারের কাব্যদ্বয়ে আছে। তিনি যদি Hesiod মাত্র হইতেন, আর সমাজ-চৈতন্যে আরম্ভ করিয়া সমাজ-চৈতন্যেই শেষ করিতেন, তবে ইউরোপের কবিগুরু হইতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, কবির মূলধন জীবন-চৈতন্য।

> "So said she ; they long since in Earth's
> soft arms were reposing',
> There, in their own dear land, their
> fatherland, Lacedaemon"

কিংবা—

> 'Nay, and thou too, old man,
> in former days wast, as we hear,
> happy'.

উদ্ধৃত দুটি অংশে যে-রস তাহা তৎকাল বা তৎস্থান অর্থাৎ সমাজের কোন বিশেষ অবস্থার উপরে নির্ভরশীল নহে। ইহাদের অন্তর্নিহিত বেদনা সমগ্র মানবসমাজের অন্তর্গত, হোমারের গ্রীক-সমাজের মাত্র নয়। এই রসকেই আমরা জীবন-রস বলিতেছি, এই রস সম্বন্ধে সচেতনতাকেই জীবন-চৈতন্য বলিতেছি। এই রসই হোমারের কাব্যের মূলধন। অন্যরস অর্থাৎ সমাজ-চৈতন্য আনুষঙ্গিকভাবে মাত্র আছে। কবি ও মহাকবিতে প্রভেদ জীবন-রসের তারতম্যে। অ-কবি ইহার সন্ধান জানে না। সে নাম ভাঁড়াইয়া সমাজ-চৈতন্য চালায়—বলে, এইটাই ইউরোপের আমদানি আধুনিকতম রসায়ন।

৩

সমাজ-চৈতন্যের উপর নির্ভর করিয়া স্থায়ী সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব নয়, কেননা সমাজ-চৈতন্য বস্তুটাই অস্থায়ী। দেশে দেশে সমাজ-ভেদ, কালে

কালে সমাজ-ভেদ। সমাজ-চৈতন্যও দেশ ও কালের ভেদে ভিন্ন। আবার এক দেশেই কি সমাজ চিরদিন এক রকম থাকে? আজিকার সমাজ কালিকার সমাজ নয়। আজিকার সমাজ-চৈতন্য কালিকার হইতে ভিন্ন। এমন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া চলা আর পুরাতন পঞ্জিকা দেখিয়া তিথিনির্ণয় কি একজাতীয় প্রচেষ্টা নয়? জর্নালিজমের পক্ষে সমাজ-চৈতন্যই যথেষ্ট, কিন্তু সাহিত্যের পক্ষে সর্বনাশ! তবে যেহেতু সাহিত্যিকের সামাজিক সত্তা আছে, তাহার রচিত সাহিত্যেও সামাজিক সংজ্ঞা অর্থাৎ সমাজ-চৈতন্য থাকিবে, থাকাই শ্রেয়। কিন্তু সাহিত্যিক নিজ স্বভাবের প্রেরণায় সমাজ-চৈতন্যকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, যে পরিমাণে হয় সেই পরিমাণে তাহার রচনা দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়। আবার উদাহরণ লওয়া যাক্।

রবীন্দ্রনাথের গোরা। এই বইখানি সমাজের যে অবস্থায় লিখিত তাহার চিহ্ন প্রচুর পরিমাণে ইহাতে বিদ্যমান। শুধু গ্রন্থখানির লিখনকালের সামাজিক চিহ্ন নয়, গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনা-কালের লক্ষণও ইহাতে অবিরল।—(১) ব্রাহ্ম-সমাজের উদ্যোগে আমাদের সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষাব সূচনা হইয়াছে। ইহার আনুষঙ্গিকভাবে নানা-রূপ সমস্যা দেখা দিতেছে। (২) ইংরেজী সাহিত্য ও গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিক্রিয়ায় দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের চিত্তে দেশাত্মবোধ জাগিতেছে। ইহারই অনুক্রম রূপে হিন্দু আদর্শে ও ভারতীয়তার আদর্শে দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিতেছে। এখানে মনে রাখিতে হইবে, বর্ণিত ঘটনার কাল কন্‌গ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী—এমন কি আনন্দমঠ-রচনারও পূর্ববর্তী বলিলেই চলে। গোরার জন্ম সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে। ঘটনা-কালে তাহার বয়স বোধ করি পঁচিশ বৎসরের অধিক নয়। বিনয়ের কিছু কম হওয়াই সম্ভব। অতএব ১৮৫৭ + ২৫ = ১৮৮২ সাল পাই। কিন্তু যে সমাজ-চৈতন্য গ্রন্থে দেখি তাহা নিছক ওই সময়কার নহে! স্বদেশী আন্দোলনের আঘাতই ইহার প্রাথমিক প্রেরণা, আর কল্পিত সামাজিক কাঠামোর প্রেরণা দ্বিতীয় স্থানীয়। ইহাকে মিশ্র সমাজ-চৈতন্য বলা যাইতে পারে। প্রধানত ১ম ও ২য়

তত্ত্বর সাহায্যেই ইহার গল্পজাল বোনা হইয়াছে। এই দুটি তত্ত্ব সমাজ-চৈতন্য।

এখন প্রথম তত্ত্ব বা ভাবধারার সমাধান আমাদের সমাজে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার নীতি সমাজ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। আমাদের জীবনে এখন আর ইহা সজীব, সক্রিয় আকর্ষণ নয়, স্বীকৃত সমাধান। ঐতিহাসিক বস্তুর যেটুকু গুরুত্ব, এখন ইহার কেবল সেইটুকুই আছে। পঞ্চাশ বা চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই সমস্যা লোকের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিত, আজ তাহা করে না। অর্থাৎ সমাজের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজ-চৈতন্যের এই অংশটি মৃত। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, 'গোরা'-রচনার সমকালীন পাঠক এই উপন্যাসখানি পড়িয়া সমাজ-চৈতন্যোদ্ভূত যে অতিরিক্ত রস পাইত, আমরা আজ আর তাহা পাই না।

গোরা গ্রন্থের দ্বিতীয় নম্বর সমাজ-চৈতন্য হইতেছে, হিন্দু আদর্শ ও ভারতীয় আদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্ব। ইহার মধ্যে আবার দুইটি ভাগ। এদেশ যে আমার অর্থাৎ এই দেশাত্মবোধের সমাধান অনেক কাল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এদেশ হিন্দুর না ভারতীয়ের—ভারতীয় বলিতে ঠিক কি বুঝায়—এ সমস্যার সমাধান আজিও হয় নাই। এ সমস্যাটি এখনো জীবন্ত সমস্যা। বরঞ্চ আজকাল ভারতবর্ষে এই দুই আদর্শের টানা-টানিতে সমুদ্রমন্থন চলিতেছে, ক্ষণে সুধা, ক্ষণে গরল উঠিতেছে। সমাধান কোন্ পথে আসিবে কেহ জানে না, কিন্তু ঠিক সেই কারণেই গোরার গুরুত্ব আজ চক্ষুষ্মান্ পাঠকের কাছে ধরা পড়িবার কথা। এই দ্বন্দ্বটি আজ সজীব সমাজ-চৈতন্য, পূর্বোক্তটির মতো মৃত নয়। কিন্তু একদিন ইহারও সমাধান হইয়া যাইবে। তখন এটিও মৃত জ্যোতিষ্কের দলভুক্ত হইবে। তখনকার পাঠক আজিকার পাঠকের আস্বাদিত অতিরিক্ত রসটুকু পাইবে না। সে তখন যাহা পাইতে পারে তাহা নিছক সাহিত্য-রস, জীবন-চৈতন্য হইতে যাহার সৃষ্টি। তখনও যদি গোরা সাধারণ পাঠকের পাঠ্যতালিকাভুক্ত থাকে, তবে কোন সমাজ-চৈতন্যের ভরসায় থাকিবে না, জীবন-চৈতন্যের জন্যই থাকিবে।

এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর চরিত্রসৃষ্টিতে চিরকালের গ্রহণীয় রস যে পরিমাণে আছে, সেই পরিমাণে তাহা সার্থক রূপ লাভ করিয়াছে, সেই পরিমাণে চিরকালের পাঠকের মনোযোগ সে লাভ করিতে সক্ষম হইবে। আর যদি এমনই হয় যে, সমাজ-চৈতন্যের দীপ দুইটি নির্বাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত গৃহটি অন্ধকার হইয়া গেল—পরিত্যক্ত দেউলে আর কেহ গেল না, তবে বুঝিতে হইবে, জীবন-চৈতন্যের অভাবেই এমন ঘটিল। বিশেষ মতবাদকে অবলম্বন করিয়া গল্পরচনায় এইতো বিপদ। মতবাদ একপ্রকার সমাজ-চৈতন্য ছাড়া আর কিছুই নয়, মতবাদ পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া পড়ে। কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির অন্যতম কিনা জানি না, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ইহার বিনাশের আশঙ্কা নাই। আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী কতকাংশে জীর্ণ হইতে পারে, হইয়াছেও বটে, কিন্তু কপালকুণ্ডলা চির-নবীন! এমন বিশুদ্ধ জীবন-চৈতন্যের ভিত্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র অপর কোন উপন্যাস রচনা করেন নাই।

৪

প্রবন্ধের প্রারম্ভে জর্নালিজম্ ও সাহিত্যের পর্যায়ে যে-সব গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি, এবারে তাহার তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে। বেদের জ্ঞানকাণ্ডের তুলনায় কর্মকাণ্ড জর্নালিজম্। যাগযজ্ঞ ক্রিয়া-কর্মাদির পদ্ধতির আলোচনা ও নির্দেশ কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য। আজ সে সবের মূল্য নিতান্ত ঐতিহাসিক মাত্র। জীবনের সহিত তাহাদের সজীব যোগ আজ খণ্ডিত ; যে সমাজ-চৈতন্য ছিল তাহাদের ভিত্তি—সেই সমাজ বহুকাল অপসারিত। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত উপনিষদাদির মূল্য আজও অব্যাহত, কারণ জীবন-চৈতন্য তাহাদের মূল। Hesiod-এর কাব্য গ্রীক-জীবনের তৎকালীন সংস্কার ও বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া গঠিত, কাজেই, সেই তৎকালীনতা আমাদের এতৎকালীনতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না।

Langland তাঁহার Vision of Piers the Plouman-এ জগতের যে আদর্শকে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, আজ তাহার মূল্য কি?

অথচ চসার-কৃত কেণ্টারবেরির তীর্থযাত্রীদের কাহিনী মানুষের চিরকালের সুখদুঃখের ভিত্তিতে গঠিত বলিয়াই আজিও রসদানে সক্ষম। সমাজের চেয়ে মানুষ বড়। সমাজ মানুষের নির্মোক মাত্র। এই সত্যটাই মানুষে আজ ভুলিতে বসিয়াছে।

তবেই দেখা যাইতেছে, জর্নালিজম্ ও সাহিত্য নামান্তরে ও রূপান্তরে আদিম কাল হইতে আছে—কিন্তু এ দুইয়ের সংমিশ্রণ বর্তমান কালে যেমন ঘটিয়াছে, কখনো তেমন ঘটে নাই। আর শুধু সংমিশ্রণই বা কেন, জর্নলিজম্‌কেই যথার্থ সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিবার একটা দুর্বুদ্ধি মানব-সমাজে দেখা দিয়াছে। মানুষের সংস্কৃতির পক্ষে ইহা একটা চরম দুর্লক্ষণ।

কেন এমন হইল? বর্তমান যুগ চিন্তার অরাজকতার যুগ—সত্য-মিথ্যা, শুভাশুভ, ভালো-মন্দে কেমন যেন তাল-গোল পাকাইয়া গিয়াছে। ইহার মূলে আছে গণতন্ত্রের স্থূল হস্তাবলেপ। চিন্তার এই গোধূলি-লগ্নে সমস্ত কেমন যেন আচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট। ইহা মধ্যযুগের শাশ্বত নক্ষত্রোজ্জ্বল রহস্যময় অন্ধকারও নয়, আবার অষ্টাদশ শতকের তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে ভাস্বর দিবা দ্বিপ্রহরও নয়। এমন সময়ে একেকে আর বলিয়া চালাইয়া দেওয়া সহজ।

বিশেষ, এযুগে সাহিত্য রাজনীতির বাহন হইয়া পড়িয়াছে, সাহিত্যিকগণ আর 'uncrowned king' নহে, তাহারা 'honorary clerk' মাত্র, বিনাবেতনের কেরানী! রাজনীতিকদের অনুজ্ঞা ও অনুরোধে কলম চালিত হয়। দলীয়তাবোধের চেয়ে বৃহত্তম কোন আদর্শ তাহাদের সম্মুখে নাই—সমস্ত সুনিপুণ হস্তে অপসারিত হইয়াছে। রাষ্ট্র-চৈতন্যের বিবর্তন অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে, মধ্যযুগের মানবতন্ত্র ক্রমে গঠনতন্ত্র অতিক্রম করিয়া দলতন্ত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখন এই দলতন্ত্রের আদর্শকে প্রচার করিবার জন্যই সাহিত্যিকদের আহ্বান। মানব-বাদ বা জীবন-চৈতন্য দলতন্ত্রের পুষ্টির অনুকূল নহে।

সার্বজনীন মানুষ আর দলগত মানুষে মূলগত ভেদ আছে। দলগত মানুষ নিতান্তই তৎস্থানিক ও তৎকালিক, অর্থাৎ সে বিশেষ সমাজের

অন্তর্গত সমাজিক জীব মাত্র—তদতিরিক্ত আর কোন সত্তা তাহার নাই। কাজেই মানববাদ বা জীবন-চৈতন্য তাহার পক্ষে শুধু অবান্তর নয়—ক্ষতিকর; কারণ, বৃহৎ মানুষের কথা বলিতে গেলে তাহার মনোযোগ অবাঞ্ছিত দিকে চলিয়া যাইবার আশঙ্কা। তাই সাহিত্যের আজ এই দুর্গতি।

এ ঢেউ উঠিয়াছে ইউরোপ হইতে, আসিয়া পৌঁছিয়াছে আমাদের দেশে। উহার মূলে আছে দলগত রাজনীতির ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিতজ্ঞ সাহিত্যিকদেরই আজ সম্মান ও অর্থ; কারণ, প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতকারিগণই প্রকাশ্যে সাহিত্যবোদ্ধা হইয়া আসরে অবতীর্ণ হন, এবং এতদিনে যথার্থ সাহিত্য রচিত হইতেছে বলিয়া সার্থক প্রশংসা বিতরণ করেন। এক হাতে আদেশ, অপর হাতে তাহা পালনের পুরস্কার। এ মন্দ মজা নয়। অধিকাংশ দর্শকেই দুই হাতের অপরিহার্য যোগটা বুঝিতে পারে না, কাজেই ভ্রান্তি-বিলাসের রহস্য তাহাদের অনবগত থাকিয়াই যায়। ইহার ফলে মানুষের সাহিত্যিক আদর্শ যে শুধু খাটো হইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাই নয়, মানবত্বের আদর্শও ক্ষুণ্ণ হইতে শুরু করিয়াছে। জীবন-চৈতন্যবাদের আদর্শ-মানব ছিল 'রামচন্দ্র', সমাজ-চৈতন্যবাদের হাতে পড়িয়া সে 'আবামচন্দ্রে' পরিণত হইয়াছে। কায়িক আরামের চেয়ে মহত্তর কোন আদর্শ আধুনিক সাহিত্যের সম্মুখে নাই। একবার ক্ষুদ্রতর আদর্শকে গ্রহণ করিলে কোথায় তাহার শেষ কে বলিতে পারে? বৃত্তকে ক্রমে ক্ষুদ্রতর করিয়া ফেলাই তাহার ধর্ম। বাঙলা সাহিত্য আজ ক্ষুদ্রায়মানতার আবর্তে পড়িয়া গিয়াছে। সমাজ-চৈতন্যের আদর্শে যে সাহিত্যের সৃষ্টি—ব্যক্তিগত জমাখরচের হিসাবই তাহার স্বাভাবিক পরিণাম। দলগত কেরানীগিরি যে-সাহিত্যিকের আদর্শ, ব্যক্তিগত নকলনবিশীতে তাহার অবসান। কিন্তু ইতিহাসের প্রকৃতি এই যে—কোন একটা ঝোঁক মানবসমাজে দেখা দিলে তাহা চরমে না গিয়া থামে না। মধ্যযুগের আন্তর্জাতিকতা জাতীয়তাবাদ হইয়া দলীয়তাবাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যদি এখনও চরম না হইয়া থাকে তবে আরও অগ্রসর হইবে। রেনেসাঁসের সর্বেন্দ্রিয়মুক্তির উদার চৈতন্য আজ ক্ষুদ্র

সমাজ-চৈতন্যে উপনীত। এই প্রক্রিয়ার এইখানেই যে চরম তাহা মনে করিবার কারণ নাই। সেই চরমের জন্য ধীরভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকাই হয়তো প্রজ্ঞার পরিচয়। মানব-ইতিহাসের দোলদণ্ড দুই চরমে আহত হইতে হইতে চলে। সেই তো মহৎ সান্ত্বনা! চরম যতই নিকটতর হইবে, মুক্তি ততই অধিকতর আসন্ন।

গণ-সাহিত্য

গত কয়েক বৎসর হইল বাঙলা সাহিত্যে গণ-সাহিত্য সৃষ্টির আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এই আন্দোলনের ফলে যে-সাহিত্য সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে তাহা গণ-সাহিত্য হওয়া দূরে থাকুক, গণ্য সাহিত্যও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। এই শ্রেণীব সাহিত্যকে বিশ্লেষ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, ইহার প্রধান উপজীব্য রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, দেশের সাম্প্রতিক দুর্ভোগ ও দুর্ভিক্ষ, কিংবা জনগণের কাল্পনিক দুঃখ-দুর্দশা। উপজীব্যেব আলোচনায় ও বিচারে যদি কেহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, লেখকদের কল্পিত বা পরিকল্পিত দুঃখ-দুর্দশা ও পাত্রপাত্রীই গণ-সাহিত্যের স্বরূপ, তবে তাহাকে অবিচাবের দোষ দেওয়া যায় না। বস্তুত, গণ-সাহিত্য কি বস্তু সে বিষয়ে লেখকদের মনেই যেন সন্দেহ আছে, তাই পাঠকদের সন্দেহের নিরসন হইতে চায় না। তাঁহাদের বচনা পড়িয়া গণ-সাহিত্য কি বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই গণ-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

সাহিত্য বলিতে কি বুঝায়, মোটামুটি বুঝি। সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া যদি বা তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে না পারি, বস্তু-নির্দেশ করিয়া তাহার রূপ দেখাইয়া দেওয়া আদৌ কঠিন নয়। কিন্তু গণ-সাহিত্য কি বস্তু? গণ বলিতে বুঝি অখণ্ড, সমগ্র সমাজ; আর গণ-সাহিত্য বলিতে বুঝি, যে সহিত্যের রস অখণ্ড সমগ্র সমাজ অনায়াসে গ্রহণ করিতে সমর্থ। তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় এই যে, সাহিত্য কোন কোন ক্ষেত্রে, কোন কোন স্রষ্টার হাতে গণ-সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। সাহিত্য

যদি হয় রসাত্মক বাক্য, গণ-সাহিত্য এমন সর্বানুভূতিসম্পন্ন রসাত্মক বাক্য যাহার রস সর্বজনের পক্ষে অনায়াসলভ্য।

গণ হইতেছে সর্বজন—যাহাকে পূর্বে আমরা অখণ্ড সমগ্র সমাজ বলিয়াছি, কাজেই গণ-সাহিত্য গণ-সাপেক্ষ। সমাজের অখণ্ডতা বা সর্বজনের একতাই এই সাহিত্যের মৌলিক প্রেরণা। কোন কারণে কোন সমাজের অখণ্ডতা যদি নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, তবে সেই সমাজের বা সেই সময়ের লেখকের পক্ষে গণ-সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব কি না? আমাদের বিশ্বাস তাহা আদৌ সম্ভবপর নহে। এখন আমরা যে সমাজে বাস করিতেছি তাহা কি গণ-সমাজ? তাহা কি অখণ্ড? তাহাকে কি সমগ্র বলা চলে? যদি তাহা অখণ্ড ও সমগ্র না হয় তবে এই সমাজের লেখকের পক্ষে গণ-সাহিত্য সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব?

একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, গত দেড়শত বৎসর ধরিয়া ইতিহাসের হাতুড়ির আঘাতে আমাদের সমাজ ক্রমশ ফাটিয়া চৌচির হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা ভূতপূর্ব অখণ্ড সমাজের অভূতপূর্ব এক এক খণ্ডের উপরে বসিয়া আছি, মধ্যে দুস্তর বাধা। আমি যে খণ্ডে আছি, মাত্র সেই খণ্ডের লোকই আমার কথা বুঝিতে পারে—অন্য খণ্ডের অধিবাসী আমাকে দেখিতেছে বটে, আমি তাহার কাছে ইকনমিক জীবমাত্র, অর্থাৎ তাহার আমি খরিদ্দার, বা মক্কেল, বা জমিদার, বা ভাড়াটিয়া মাত্র, কিন্তু ততোধিক আর কিছুই নয়; তাহার সহিত আমার যে যোগ তাহা দৈনন্দিন অভাবের সূত্রে; তাহার সহিত আমার ভাব-সূত্র বহুকাল হইল ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিচ্ছেদের রূপটা শহরে যেমন প্রকট, পল্লী-অঞ্চলে তেমন নয়। কিন্তু তাই বলিয়া পল্লী-সমাজও আজ আর অখণ্ড নয়, শহরের বন্যা পল্লীতে গিয়া ঢুকিয়াছে। এককালে পল্লী যখন সজীব ও দেশের ভারকেন্দ্র ছিল তখন পল্লীই ছিল দেশের ভাবজীবনের সূত্রধার। এখন শহর হইতেছে দেশের ভাব-নায়ক। শহরে একটা হাওয়া উঠিলে—কালক্রমে তাহা পল্লীতে গিয়া পৌঁছায়। এমন কি শহরের রঙ্গমঞ্চে কোন নাটক সার্টিফিকেট না পাইলে পল্লীগ্রামে তাহা অভিনীত হয় না। আগে শহর, পরে পল্লী;

আগে কলিকাতা, পরে নোয়াখালী। ফলকথা, দুই-ই আজ সম-ভাবাপন্ন—কোনখানেই সমাজের অখণ্ডতা আজ আর নাই। এ-হেন খণ্ড-সমাজে বসিয়া অখণ্ড-সমাজের জন্য সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসকে কি বলিব? লেখকদের আন্তরিকতায় অবিশ্বাস না-ই করিলাম, কিন্তু জীবনের মহৎ কর্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত আন্তরিকতাই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে যথোপযুক্ত জ্ঞান আবশ্যক। জ্ঞানবিবর্জিত আন্তরিকতার ন্যায় বিভ্রান্তকারী বস্তু অল্পই আছে।

গণ-সাহিত্যিকগণ বা তাঁহাদের ফিলসফার-গণ বলিতে পারেন যে, গণ নাই বটে কিন্তু ওই গণ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই গণ-সাহিত্যের সৃষ্টি। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, গণ-সাহিত্য রচনা করিয়া সমাজকে সর্বজনীয়তায় উদ্বোধিত করিবেন এবং উদ্বোধনের ফলে খণ্ড-সমাজ দানা বাঁধিয়া অখণ্ড হইয়া উঠিবে। একথা যদি তাঁহারা বলেন, তবে অন্তত তাঁহারা মানিয়া লইবেন যে বর্তমান সমাজ আর গণ-সমাজ নয়—তাহা সমাজের অগণ্য খণ্ডাংশ মাত্র। এইবারে আর একটা জটিল তর্কের ভূমিকা রচিত হইল। সমাজ-রচনার উপরে, রাষ্ট্র-সৃষ্টির উপর লেখক-দের কতখানি প্রভাব? লেখকদল সমাজেরই সৃষ্টি-- এই সত্যকে গণ-সাহিত্য-তাত্ত্বিক কারণে-অকারণে সর্বদাই ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু সমাজকে লেখকগণ কি পরিমাণে সৃষ্টি করিতে সক্ষম? সমাজ ও রাষ্ট্র মুখ্যত, সংস্কারক, রাজনীতিক ও রাষ্ট্রবীরগণের সৃষ্টি; গৌণত মাত্র সাহিত্যিকগণ তাহাকে প্রভাবিত করিতে পারেন। ভল্‌টেয়ার, টলস্টয় ও বার্নার্ড-শ' প্রভৃত পরিমাণে তাঁহাদের সমাজকে গঠিত ও প্রভাবিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন—একথা সত্য, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইঁহারা তিনজনেই কেবল মাত্র সাহিত্যিক নহেন! ইঁহারা তিনজনেই সমাজ-সংস্কারক ও ঋষি-দৃষ্টি-সম্পন্ন prophet। ইঁহারা সাহিত্যসৃষ্টি না করিলেও নিজেদের মনীষার দ্বারা স্ব-কালকে ও স্ব-সমাজকে প্রভাবিত করিয়া যাইতে পারিতেন; আমার তো বিশ্বাস—ইঁহারা যদি সাহিত্যিক না হইতেন, তবে স্ব-সমাজ ও স্ব-কালের উপরে অধিকতর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইতে পারিতেন। সাহিত্যিকগণ পরোক্ষভাবে স্ব-দেশকে

প্রভাবিত করেন, সেইখানেই তাঁহাদের সাহিত্যিক প্রতিভা, তাহাতেই তাঁহাদের সাহিত্য-ধর্ম। যদি দেখি যে, কোন সাহিত্যিক প্রত্যক্ষভাবে স্ব-জনকে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন তবে বুঝিব, সাহিত্যিক-শক্তি ছাড়াও তাঁহার বিশেষ কোন শক্তি আছে, নতুবা বুঝিব এই চেষ্টার দ্বারা তিনি নিজের বিশিষ্ট ক্ষমতার অপহ্নব ঘটাইয়া নিজের ও সাহিত্যের ক্ষতি করিতেছেন। বাঙলা দেশের গণ-সাহিত্য-স্রষ্টাদের মধ্যে তো ভল্‌টেয়ার-টলস্টয়ের সমকক্ষ কাহাকেও দেখি না। আর, এত সূক্ষ্ম বিচারেই প্রয়োজন কি? তাঁহাদের সৃষ্ট তথাকথিত গণ-সাহিত্যের দিকে তাকাইলেই মুহূর্তে সব সন্দেহের নিরসন হইবে। এই সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে প্রকৃত গণ-সাহিত্যের সর্বজনীন প্রেরণার আভাসমাত্র নাই—আছে উপদলীয় শুড়শুড়ি মাত্র; এই ক্ষীণ শিখাগুলি উপদলীয় প্রচার-পত্রের বাতাসে জ্বলিয়া উঠিয়াই নিভিয়া যায়; আকাশের তারার শাশ্বত দীপ্তি ইহাদের নাই—আছে দলীয় বাষ্পের বিষ-নিশ্বাসে কলুষিত সর্বনাশের অভিমুখে আকর্ষণ-করা জলা-জমিতে সঞ্চরণকারী আলেয়ার চোখের ইঙ্গিত; আর সর্বাপেক্ষা শোচনীয় এই যে, বহু বাঙালী লেখক সেই দিকেই প্রধাবিত। বাঙলা সাহিত্যের এই দুর্যোগের রাত্রি প্রভাত হইলে গণ-সাহিত্যের রক্তদহ বাঙালী সাহিত্যিকের হেটমুণ্ড মৃতদেহে পরিকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। কে ইহাদের নিরস্ত করিবে? তাহাদের এক কানে উপদলীয় ভূত-তন্ত্রের তান্ত্রিকতা, আর অপর কর্ণে জ্ঞানবিবর্জিত আন্তরিকতা নিরন্তর ফুসলাইতেছে। আলেয়া-মুগ্ধ পথিকের চোখে তাহার দীপ্তি অবাস্তব বলিয়াই মনে হয়।

গণ-সাহিত্যিকগণ একটি স্থূল সত্য বিস্মৃত হইয়াছেন। রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজ প্রভৃতির যেমন বিশিষ্ট দাবি আছে, তেমনি শিল্পেরও একটি দাবি আছে। সেই দাবি উপেক্ষা করিলে সার্থক শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়। শিল্পেই শিল্পের শেষ -বা সার্থকতা, এমন কথা বলিতেছি না। শিল্পের জন্যই জীবন নয় জানি—আরও জানি যে, জীবনের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্যই শিল্প। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করিবার পক্ষে সহায় হইতে পারে এমন মহৎ শিল্প সৃষ্টি করিতে গেলে তাহার দাবি

পূরণ করিয়া তাহার নিয়মানুগ হইয়া চলিতে হইবে। দলীয় ধ্বজা বহন করিবার উদ্দেশ্যে, ছকুমিঞার ছ্যাকরা-গাড়িতে স্বর্গের অশ্বিনীকুমার যুগলকে জুড়িয়া দিলে চলিবে না। বাঙলা সাহিত্যে আজ সেই চেষ্টা হাস্যকর ভাবে প্রকট। মহৎ শিল্প জীবনধর্ম-সাধনার উত্তরসাধক। মহৎ শিল্পের মুখে মানুষ মানুষের কথা চায়; দরিদ্রের কথা, নিপীড়িতের কথা, ভিক্ষুকের ছিন্নকন্থায় তাহার কোন আগ্রহ নাই। কিংবা জীবনই ছিন্নকন্থা পরিয়া—বার্ধক্যের জীর্ণমূর্তি ধরিয়াই মহতী বাণীর সমক্ষে আবির্ভূত হয়; আর সেই শিল্পলক্ষ্মীর—তপশ্চারিণী উমার—দৃষ্টি তাহার আপাত-দারিদ্র্য ও জরার অভ্যন্তরে নিত্য-যৌবন, অনন্ত-ঐশ্বর্য, শিব-সত্তাকে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়। এখানেই তো শিল্পলক্ষ্মীর তপস্যার সার্থকতা। জীবনে দুঃখ-দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারী অবশ্যই আছে—কিন্তু যে-শিল্প কেবল ওইটুকুই দেখিল, তদতিরিক্ত মহত্তর আর কিছু দেখিতে বা দেখাইতে সমর্থ হইল না—তাহার কি এমন সার্থকতা? দৈনন্দিন বাস্তবকে জানা-ই যদি সাহিত্যপাঠের উদ্দেশ্য হয়—তবে সংবাদপত্র পড়িলে চলে। পুস্তকাকারে মুদ্রিত সংবাদহীন সংবাদপত্র পড়িতে যাইব কেন? দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের মতো শিল্প মানুষের দৃষ্টিশক্তির বিবর্ধক কিন্তু যে-শিল্প সাদা-কাচের চশমা, যাহার মধ্যে সেই বাস্তব বাস্তবই থাকিয়া যায়—তাহাকে নাকের সহিত আঁটিয়া রাখিবার কি যুক্তি? শিল্পের দূরবীক্ষণে যদি গ্রহতারা নিত্য-রাসে উদ্ভাসিত না হইল, অণুবীক্ষণের মধ্যে বস্তুকণিকা-পুঞ্জের কুরুক্ষেত্র সন্দর্শন যদি না ঘটিল—তবে এত কষ্ট করিবার সার্থকতা কোথায়?

শিল্প মানব-জীবনোপলব্ধির সহায় বলিয়াই মানুষ শিল্পের মধ্যে সেই মানুষের কথাই শুনিতে চায়। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি প্রভৃতি প্রকৃত গণ-সাহিত্যের মূলকথা মানুষের কথা। ইহাদের সবগুলির প্রধান চরিত্র—সম্রাট, রাজা, সামন্ত-বীর প্রভৃতি: অর্থাৎ, গণ-সাহিত্যিকদের ভাষায় aristocrat। রাজা-রাজড়াদের কাহিনা লিখিত হওয়া সত্ত্বেও এই সব মহাকাব্য হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া

লোকে—এবং সর্বশ্রেণীর লোকে—কেন আগ্রহের সঙ্গে পড়িয়া আসিতেছে—ইহা কি চিন্তার বিষয় নহে ? তাহার একমাত্র কারণ ব্যাস, বাল্মীকি ও হোমার মহৎ-শিল্পের দাবির নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়া লিখিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা মানুষের কথা লিখিয়াছেন, আর সেই টানে জীবনের দুঃখ-দৈন্যও আনুষঙ্গিক ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা জানিতেন, কবিতাকে বনিতার মতো করিয়াই আকর্ষণ করিতে হয়। পাণ্ডবগণের সহিত দ্রৌপদীর মিলন সত্য হইয়াছিল—কেননা তাঁহারা মানুষটিকে চাহিয়াছিলেন। দুঃশাসন বৃথা তাঁহার বসন ধরিয়া টানাটানি করিয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে পায় নাই—বরঞ্চ ক্রোধের ফলে তাঁহাকে মারিতে হইয়াছিল। গণ-সাহিত্যিকগণ সেই দুঃশাসনের লীলায় নিযুক্ত। শিল্পলক্ষ্মীর বসন আকর্ষণ করিয়া তাহারা তাহাকে পাইতে চায়! হোমার যদি মুখ্যত দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা লিখিতেন তবে তাঁহার কাব্য আজ কেহই স্মৃতিধার্য করিয়া রাখিত না—এমন কি, তাঁহার নিজেরও ভিক্ষামুষ্টি জুটিত কিনা সন্দেহ। ব্যাস,বাল্মীকি, হোমার মহৎ-শিল্পের নিয়মজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের দৃষ্টিকে কিছুতে বাধা দিতে পারে নাই, না রাজার ঐশ্বর্য, না দরিদ্রের কন্থা—সর্বত্রই তাঁহারা মানুষকে আবিষ্কার করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

কথিত গণ-সাহিত্যিকদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, একটা আস্ত মানুষ পাইলে যতক্ষণে তাহার মধ্যেকার দুর্গত ইনকমিক মানুষকে তাহারা আবিষ্কার করিতে না পারে ততক্ষণ তাহাদের স্বস্তি নাই। পুরাকালে এক রাজা যাহা স্পর্শ করিতেন, সোনা হইয়া যাইত। গণ-সাহিত্যিক-গণ যাহা স্পর্শ করে অমনি তাহা লোহা হইয়া যায়। মানুষের ইকনমিক কঙ্কালটাকে আবিষ্কার করাই তাহাদের শিল্প-ধর্ম। রক্ত-মাংসের সজীব মানুষ ছাড়া আর কিছুতেই শিল্পের চিরন্তন আগ্রহ নাই। সে ঈশপের গল্পের ভালুকের মতো জীবন্ত মানুষ ছাড়া আর কিছুই স্পর্শ করে না। আমাদের গণ-সাহিত্যিকদের সাহিত্য কঙ্কালের জাদুঘর। তাহাতে ক্ষণকালের কৌতূহল আছে, চিরকালের সহানুভূতি নাই।

২

পূর্ব অধ্যায়ে গণ-সাহিত্য বলিতে কোন্ শ্রেণীর রচনা বুঝি, প্রসঙ্গত আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এবারে অধিকতর দৃষ্টান্ত সহযোগে বিশদতর ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

হোমারের কাব্য গণ-সাহিত্য; তাঁহার কাব্যদ্বয়কে গণ-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ কবা যাইতে পারে। গ্রীক ট্র্যাজেডি-লেখকগণের রচনা কেবল আংশিক গণ-সাহিত্য। গ্রীক ট্র্যাজেডি-বিশেষ একটা ধর্ম-বিশ্বাসের একানুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু হোমারের কাব্যের প্রতিষ্ঠা অধিকতর বিস্তৃত ভূমির উপরে। তাহার উপভোগের জন্য কোন বিশেষ ধর্ম-বিশ্বাসের ঘটকালির প্রয়োজন হয় না।

আবার ইংরেজী সাহিত্যে চসারের কাব্য ও শেক্সপীয়রের নাটক গণ-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শেক্সপীয়রের পরে ইংলণ্ডে গণ-সাহিত্যিক সৃষ্টি হয় নাই। জার্মান সাহিত্যে অনেক মহারথ সাহিত্যিক আছেন, গ্যয়টে তো আধুনিক ইউরোপের কবিকুল-গুরু। তৎসত্ত্বেও জার্মান ভাষায় যে ›ণ-সাহিত্য রচিত হয় নাই, তাহার কারণ, বর্তমান জার্মান সাহিত্যের অভ্যুদয় হয় এমন একটা সময়ে—যখন জার্মান-সমাজ খণ্ডিত হইয়া রহিয়াছিল। মার্টিন লুথারের নবধর্মমত-প্রচারের ফলে জার্মান সমাজে, তথা পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সর্ব-দেশের সমাজ-জীবনে প্রকাণ্ড একটা ফাটল দেখা গিয়াছিল। জার্মান সাহিত্যে গণ-সাহিত্যের সন্ধান করিতে হইলে তৎপূর্বে যাইতে হইবে। জার্মানীর পুরাণে ও রূপকথায় গণ-সাহিত্যের উপাদান নিশ্চয় আছে। কিন্তু যখন হইতে সে-সাহিত্য ইউরোপীয় স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ গ্যয়টের পরবর্তী যুগে—তখন আর প্রকৃত গণ-সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়া ওঠে নাই।

রুশ-সাহিত্য আরও আধুনিক। টলস্টয় পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁহার War and Peace আধুনিক জীবনের মহাকাব্য।

তৎসত্ত্বেও তাহা গণ-সাহিত্য নয়। বরঞ্চ তাঁহার Twenty Three Tales কিয়ৎ পরিমাণে গণ-সাহিত্যের আদর্শ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ফরাসী-দেশের সমাজ গণ-সাহিত্য-রচনার পক্ষে অধিকতর অনুকূল ছিল। কারণ সেখানে ধর্মবিশ্বাসে ফাটল ধরে নাই—আর রাষ্ট্রীয় একানুভূতি ফরাসী-বিপ্লবের আগে অবধি অক্ষুণ্ণ ছিল। তথাপি সে দেশে গণ-সাহিত্য বিরল। ফরাসী গণ-সাহিত্যের নমুনা সংগ্রহ করিতে হইলে Chanson de Roland-জাতীয় রচনার নাম করিতে হয়। ফরাসী দেশে কর্ণেঈ, রাসিন প্রভৃতি মহারথ নাট্যকার আছেন। কিন্তু ইঁহারা ভার্সেঈ-সমাজের জন্য নাটক লিখিয়াছিলেন—সমগ্র সমাজের রস-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নহে। মলিয়েরের নাটকে গণ-সাহিত্যের উপাদান অধিকতর মাত্রায় আছে বটে।

ভারতীয় ভাষাসমূহে গণ-সাহিত্যের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারত গণ-সাহিত্য। হিন্দী তুলসীদাসী 'রামচরিত-মানস' গণ-সাহিত্য। বাঙলা কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত গণ-সাহিত্য। চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের গীতি-কবিতা গণ-সাহিত্য। বাঙলার পাঁচালী ও যাত্রা (নিতান্ত আধুনিক কালে লিখিত বাদে) গণ-সাহিত্য। ময়মনসিংহ-গীতিকার অনেকগুলি পালা (আধুনিক গবেষকগণের স্থূলহস্তাবলেপের চিহ্ন ছাড়িয়া দিলে) গণ-সাহিত্য। কালিদাস ভারতীয় লৌকিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু তাঁহার কাব্য ও নাটক গণ-সাহিত্য নয়। দৃষ্টান্ত আরও বাড়ানো যাইতে পারে—কিন্তু ইহাই যথেষ্ট মনে করি।

যে-সব রচনার নামোল্লেখ করিলাম তাহাদের মধ্যে দেশ, কাল ও রসোত্তীর্ণতার প্রভেদ বিস্তর। হোমারের কাব্য ও বাঙলা পাঁচালীর একত্র উল্লেখ এই বোধ হয় প্রথম—কিন্তু তাহাতে বিস্মিত বা ভীত হইবার কারণ নাই। আবার কালিদাসের কাব্যকে যে-পদবী দান করিতে পারি নাই, সেই পদবী যাত্রাওয়ালা ও পাঁচালীওয়ালাদের ভাগ্যে জুটিল—ইহাকেও অনেকে অদৃষ্টের পরিহাস বলিয়া মনে করিতে পারেন।

কিন্তু কেবল স্মরণ রাখিলেই চলিবে যে, গণ-সাহিত্য আর উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সর্বত্র এক বস্তু নয়। কোন রচনা গণ-সাহিত্য হইয়াও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য না হইতেও পারে—আবার কোন রচনার পক্ষে একাধারে গণ-সাহিত্য ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হওয়া অসম্ভব নয়। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ও গণ-সাহিত্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। রসোত্তীর্ণতার বিচারে ওডিসি বা রামায়ণ চরম—কিন্তু বাঙলা যাত্রা-পাঁচালী কিছুই নয়। রসোত্তীর্ণতার বিচারে শকুন্তলা চরম উৎকর্ষ—কিন্তু তবু তাহা গণ-সাহিত্য নয়। যে সব রচনার উল্লেখ আমরা করিয়াছি—পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া দিলে তাহাদের মাথায় ছোট-বড় সহজেই চোখে পড়িবে—কিন্তু গোড়ায় তাহাদের মধ্যে একটা ঐক্য আছে, তাহাদের পায়ের নিচের ভিত্তিটা একই সমতলে অবস্থিত। আর একই সমতলে দণ্ডায়মান বলিয়াই হোমারের ও অখ্যাত বাঙালী পাঁচালীকারের মাথার উচ্চনীচতা অতি অনায়াসে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গণ-সাহিত্য বলিয়া উল্লেখিত রচনাসমূহের আপাত-বৈসাদৃশ্যের অন্তর্গত সামান্য ধর্ম বা লক্ষণটি কি? গণ-সাহিত্য সমাজের সেই অবস্থার রচনা যখন সমগ্র সমাজ অখণ্ড ছিল। যখন লেখক ও বৃহত্তর পাঠকসমাজ একই বিশ্বাস, একই সংস্কার (অনেক সময় কুসংস্কারও বটে) একই স্বর্গ-নরক ও পরিণামে আস্থাবান ছিল। অর্থাৎ হোমার ও একজন নগণ্য গ্রীক একই সমতলে অবস্থিত ছিল; তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বাঙালী মনীষী ও অখ্যাত পাঁচালীকার একই বিশ্বাসের আবহাওয়ায় বিচরণ করিত। হোমার ও তৎকালীন সাধারণ একজন গ্রীকের মধ্যে যে-প্রভেদ তাহা কেবল ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রভেদ। তাহা ছাড়া অন্য প্রভেদ ছিল না। শেক্সপীয়রের সহিত Tudor-ইংলণ্ডের সাধারণ অধিবাসীর মৌলিক কোন প্রভেদ নিশ্চয় ছিল না। শেক্সপীয়রের নাটকে অনেক অতিপ্রাকৃত ব্যাপার আছে। সেই সব অতিপ্রাকৃতে শেক্সপীয়র নিজে বিশ্বাস করিতেন কি না এমন একটা বিতর্ক শুনিতে পাওয়া যায়। শেক্সপীয়র বিশ্বাস করিতেন কিনা জানি না—তবে একথা বলিতে পারা যায় যে, তিনি ও তাঁহার সমাজের নগণ্যতম ব্যক্তি

অতিপ্রাকৃতে একই প্রকার বিশ্বাস পোষণ করিতেন। ফলকথা তাঁহার ও তৎকালীন অখ্যাত, অজ্ঞাত একজন ব্যক্তির মধ্যে যে পার্থক্য তাহা গুণগত নয়, নিতান্তই মাত্রাগত। রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কালের একজন অখ্যাত অজ্ঞাত ব্যক্তির মধ্যে যে পার্থক্য তাহা আর মাত্রাগত নয়, একেবারে গুণগত। তিনি ও উক্ত ব্যক্তি এক সমতলে অবস্থিত নহেন। পায়ের তলাকার মাটিতে উচ্চাবচতা ঘটিয়া গিয়াছে। গণ-সাহিত্য-সৃষ্টির যে সমাজ, তাহার জমি একটানা সমতল, আর আধুনিক সমাজের জমি অনেকটা ক্রমোচ্চ সোপান-পরম্পরার মতো। এখন লেখক যে-সোপানে, পাঠক সে-সোপানে নয়—সব পাঠক এক সোপানে নয়; এই ভাবে দণ্ডায়মান বলিয়াই অনেক সময় সকলকে মাথায় সমান দেখায়—তাহাকেই আমরা গণতন্ত্রের সুফল বলিয়া মনে করি, কিন্তু পায়ের তলাকার মাটির দিকে তাকাই না। তাকাইলে নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিতাম।

সমতল সমাজ যে সোপানীকৃত সমাজ হইয়াছে, অখণ্ড বিশ্বাসের বন্ধন যে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, একই সমাজ যে বহু সমাজের গুচ্ছে পরিণত হইয়াছে—ইহার মূলে দীর্ঘকালের ঐতিহাসিক হাতুড়ির আঘাত আছে। সে-সব বিচারের সময় এখন নয়। কিন্তু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আবার ইতিহাসের হাতুড়ি যতক্ষণ না সোপানীকৃত সমাজকে এক সমতলে পরিণত করিতেছে—ততক্ষণ গণ-সাহিত্য-রচনার পটভূমি প্রস্তুত হইবে না। গণ-সাহিত্যের পটভূমি বা আবহাওয়া রচিত হইলে লেখকগণ অনায়াসে গণ-সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিবেন, তজ্জন্য কোন ভেরী-বাদন বা আন্দোলনের আবশ্যক হইবে না। কিন্তু সেই পটভূমি রচনা কোন সাহিত্যিকের সাধ্যায়ত্ত নয়। যে-সব ক্রান্তিপাতের ফলে ইতিহাস সৃষ্টি হয়—তাহার উপরে সাহিত্যিকদের প্রভাব অতিশয় নগণ্য। যতদিন না সমাজে সেই অবস্থার উদ্ভব হইতেছে ততদিন লেখকগণ 'বুর্জোয়া'-সাহিত্য রচনা করিলে শক্তির সদ্ব্যবহার করা হইবে—নিদেন পক্ষে চোরা-কারবারের বাজারে নামিয়া পড়িলেও অধিকতর সুফল পাইবার আশা।

গণ-সাহিত্যের একটি প্রধান অন্তরায় গণতন্ত্র। কথাটা একটু বিচার করিয়া দেখা যাক্। গণ-সাহিত্য বলিয়া যে-সব গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি তাদের প্রায় সমস্তই কবিতায় লিখিত। গণ-সাহিত্যের বাহন ছন্দ। এই অত্যাবশ্যক তথ্যটি সর্বদা মনে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সাহিত্য গণ-সাহিত্য হইয়া উঠিতে গেলে প্রথমে ছন্দ-বাহন আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু সে আশা গণতন্ত্রের যুগে আছে বলিয়া মনে হয় না। গণতন্ত্রের ভাষা গদ্য, গদ্য চিন্তার বাহন। পদ্য অনুভূতির বাহন। চিন্তায় মানুষে মানুষে স্বাতন্ত্র্য; অনুভূতিতে মানুষে মানুষে ঐক্য। গণতান্ত্রিক সমাজে মানুষ ক্রমেই অধিকতর পৃথক হইয়া পড়িতেছে। সেই ক্রমবর্ধমান দূরত্বকে জোড়াতালি দিয়া ঢাকিবার চেষ্টায় গণতান্ত্রিক নেতাগণ প্রাণান্ত করিয়া মরিতেছেন। গণ-সাহিত্যের বাহন পদ্য হওয়াতে মানুষকে একানুভূতির অলক্ষ্য বন্ধনে যে কেবল দৃঢ়-সংসক্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহাই নয়, সে সংসক্তি তো সমাজের অখণ্ডতাতেই সম্পন্ন হইয়াছে, ছন্দ সমাজের সেই মৌলিক অখণ্ডতাকে রক্ষা করিতেছে—সমাজ যাহাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন না হইয়া যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখিতেছে। হোমার গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেন, ইহা বাস্তব তথ্য কি না জানি না। তবে ইহার ভাগবত সত্যে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। হোমারেব ভিক্ষা-মুষ্টি কেবল দরিদ্রের গৃহ হইতে আসিত না, তাহাতে ধনীর ভাণ্ডারের দানও ছিল। অর্থাৎ ধনীতম হইতে দরিদ্রতম--সমাজের সুরসপ্তক—সকলেই তাঁহার গানে জাগিয়া উঠিত। এইখানেই তাঁহার সর্বজনীনতা। এখন আমরা কি করি? ভিক্ষুক আসিয়া জানলার বাহিরে গান ধরিলে তাহাকে গান থামাইতে বলিয়া তবে ভিক্ষামুষ্টি দান করি। তাহার গানকে আমরা স্বীকার করি না। অর্থাৎ একটা ভিক্ষুক আমাদের কাছে আজ নিতান্তই একটা 'ইকনমিক জীব' মাত্র—ততোধিক কিছু নয়। কিন্তু হোমার তাঁহার সমাজে ভিক্ষুক ছিলেন না –তিনি দৈববাণী বিতরণ করিয়া ফিরিতেন। তখনকার সমাজ অখণ্ড ছিল—ছন্দ অখণ্ড সমাজের বাণীরূপ ছিল, সমাজের অখণ্ডতা বজায় রাখায় তাঁহার হাত ছিল। ছন্দ যুগপৎ অখণ্ড

সমাজের সৃষ্টি, আবার অখণ্ড সমাজের রক্ষক। আধুনিক সমাজ বহু খণ্ডিত, ছন্দ এখানে পঙ্গু।

আধুনিক খণ্ডিত সমাজের সাহিত্যিক রাজপথ উপন্যাস। অখণ্ড সমাজের রাজপথ ছিল মহাকাব্য বা নাটক। উপন্যাস একক-পাঠকের, মহাকাব্য বা নাটক যৌথ-পাঠকের কাব্য। আধুনিক পাঠক নিঃসঙ্গ—সে একাকী বসিয়া কৃপণের ধনের মতো উপন্যাসের রসাস্বাদন করে। গণ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাঠক বলিয়া কিছু ছিল না—তাহারা সকলেই শ্রোতা। যৌথভাবে, সমাজবদ্ধভাবে তাহারা কাব্যরস উপভোগ করিত। লোকে যেমন দল বাঁধিয়া মেলা দেখিতে যায়, দেবদর্শনে যায়—তেমন যাত্রা শুনিতে, পাঁচালি শুনিতে বা কথকতা শুনিতে যাইত। তখন লেখকের সহিত শ্রোতার, শ্রোতার সহিত শ্রোতার কার্য-কারণ সম্বন্ধ ছিল। এই অনিবার্য 'সহিত'-এর সমন্বয়ে সাহিত্য তখন সত্যই সাহিত্য ছিল। এখন সাহিত্য আর সাহিত্য নয়। সেই 'সহিত' ঘুচিয়া গিয়া সাহিত্য এখন তাহার মৌলিক ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে। যতদিন সাহিত্যের মধ্যে 'সহিত'-এর ভাব ফিরাইয়া আনা সম্ভব না হইতেছে—ততদিন গণ-সাহিত্য কেমন করিয়া সম্ভব?

তবে কি ছন্দ অবলম্বন করিয়া রচনা লিখিলেই গণ-সাহিত্য হইয়া উঠিবে? তাহাও হইবার নয়। যে-হেতু ছন্দ সমাজে একটা বিশেষ অবস্থার লক্ষণ, সেই বিশেষ অবস্থা যতক্ষণ না ফিরিতেছে ছন্দ ফিরিবে কেমন করিয়া? তেমন বৃথা চেষ্টা করার চেয়ে বরঞ্চ গদ্যে লিখিয়া যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। তাহাতে গণ-সাহিত্য-সৃষ্টি হইবে না বটে—তবে গণ-সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

বর্তমান যুগ সাহিত্যকে কান হইতে চোখে ঠেলিয়া দিয়াছে, সাহিত্য আর শ্রাব্য নয়। গণ-সাহিত্যের একটা লক্ষণ যেমন ছন্দ, তেমনি আর একটা লক্ষণ—তাহা শ্রাব্য। বোধ করি, ছন্দযুক্ত বলিয়াই শ্রাব্য। বোধ করি, ছন্দযুক্ত বলিয়াই শ্রাব্য হওয়া সহজ হইয়াছে, বোধ করি অখণ্ড সমাজে শ্রাব্য হওয়াই স্বভাব-সঙ্গত, কিন্তু বর্তমান সাহিত্য পাঠ্য। চোখের সাহিত্য স্বল্পলোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। কানের

সাহিত্যের সে বাধা নাই। অর্থাৎ চোখে-পড়া সাহিত্যের আসরে অধিকাংশ লোকের স্থান নাই—কানে-শোনা সাহিত্যের অবাধ আসর। সাহিত্য অক্ষর-গত হইয়া পড়াতে তাহার সীমা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। গণ-সাহিত্যের সৃষ্টির পক্ষে ইহাও একটা অন্তরায় বটে। কোনকালে সাহিত্য যদি আবার শ্রাব্যত্ব লাভ করে, তবেই গণ-সাহিত্য-সৃষ্টির পথ সুগম হইবে। বেতার-যন্ত্রের বহু-প্রচলনের ফলে সাহিত্য কিয়ৎ পরিমাণে শ্রাব্য হইয়াছে। বেতারের প্রচার সর্বজনীন হইলে, তাহার অপব্যবহার বন্ধ হইলে, শুভ বুদ্ধির সহযোগে তাহার সদ্ব্যবহার হইলে—তবে হয় তো সাহিত্যের শ্রাব্যধর্ম আবার ফিরিয়া আসিলেও আসিতে পারে। শ্রাব্যত্ব ও ছন্দ—গণ-সাহিত্যের দুই প্রধান লক্ষণ। কিন্তু লক্ষণ ফিরিয়া আসিলেই যে বস্তুটি ফিরিয়া আসিবে এমন মনে করিবার হেতু নাই। গণ-সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য চাই সমাজের অখণ্ডতা। সেই অখণ্ডতা যতদিন না সাধিত হইতেছে—ততদিন গণ-সাহিত্য-সৃষ্টির কিছুমাত্র আশা নাই।

জাতিস্মর সাহিত্য

কিছুদিন হইতে অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছি যে, বাঙলা সাহিত্য ক্রমেই জাতিস্মর হইয়া উঠিতেছে। একটা জাতির মধ্যে দুই চারজন লোক জাতিস্মর হইলে কৌতুকের হইতে পারে—কিন্তু সমগ্র জাতটাই যদি জাতিস্মর হইয়া উঠিবার প্রবণতা দেখায়, তবে বিষম আশঙ্কার কথা। ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে বৈতরণী নদী প্রবাহিত। এপার হইতে ওপারে যাইবার সময় বৈতরণীর জলে অবগাহন করিয়া যাইতে হয়—ওই জল পূর্বকথার বিস্মরণী, এপারের কথা ওপারে যাহাতে মনে না থাকে, সেই কারণে এই ব্যবস্থা। জন্ম শুধু রূপান্তর নয়, তাহা মনান্তরও বটে। দেহ এবং মন নূতন ছাঁচে ঢালিয়া পুনরায় আবির্ভূত হয়। সাহিত্য-জগতেও এই রকম একটা বৈতরণী আছে। বাহিরে বাস্তব জগৎ আর শিল্পীর অন্তরে কল্পনার জগৎ—এ দুটি যেন শিল্পীর জগৎ—দুটি যেন শিল্প-লোকের ইহলোক আর পরলোক। মাঝখানে রহিয়াছে লেখকের মন—এই মনটিই সাহিত্যের বৈতরণী।

বাস্তবের ছাপ নিরন্তর লেখকের অন্তরে গিয়া সঞ্চিত হইতেছে, আবার লেখকের কল্পনা নিরন্তর শিল্পাকারে বহির্মুক্তি লাভ করিতেছে। আর উভয়েই যাতায়াতের পথে একবার করিয়া লেখকের মন-বৈতরণীতে ডুব দিয়া যাইতেছে। স্নান সারিয়া উঠিবার সঙ্গেই তাদের রূপান্তর ঘটিতেছে, পূর্ব রূপ ও পূর্ব সংস্কার সাপের খোলসের মত স্খলিত হইয়া পড়িয়া এমন অভিনবত্ব প্রকাশ করিতেছে যে তাহাদের আর চিনিবার উপায় থাকে না। শিল্পের পক্ষে এই রূপান্তর অত্যাবশ্যক, কিংবা এই

রূপান্তরতাকেই শিল্প বলা যাইতে পারে। তবে সবক্ষেত্রে সমান রূপান্তর অবশ্য ঘটে না। কোথায় কতটুকু রূপান্তর ঘটিবে, তাহা লেখকের শক্তির উপরে অর্থাৎ তাহার মন-বৈতরণীর গভীরতা ও বিশুদ্ধতার উপরে নির্ভর করে। কিন্তু ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, রূপান্তরের একটা প্রক্রিয়া সর্বদাই চলিতেছে। কোথাও যদি রূপান্তর না ঘটে, তবে বুঝিতে হইবে লেখকের মনে বৈতরণী নাই অর্থাৎ সে লেখক নহে, কিংবা তাহার বৈতরণী শুকাইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ তাহার সাহিত্যিক ক্ষমতা লুপ্ত, কিংবা বাস্তবের ছাপ আদৌ বৈতরণী অতিক্রম করে নাই—অর্থাৎ লেখক সাহিত্যিক নয়, জর্নালিস্ট মাত্র।

বাঙলা সাহিত্যের প্রসঙ্গ দিয়া শুরু করিয়াছিলাম—এবার সেখানে ফিরিয়া আসা যাক্। গত পাঁচ বছরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বাঙলা বই প্রকাশিত হইয়াছে। হঠাৎ এমন অভাবিত আধিক্যের কারণ কি জানি না, বোধ করি কাগজের অভাবেই এমন ঘটিয়াছে। এই সব পুস্তকের অধিকাংশই উপন্যাস ও গল্প। কিছু প্রবন্ধ ও কবিতাও আছে। প্রায় সবগুলিরই উপজীব্য কোন না কোন আকারে দেশের সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা। পঞ্চাশের মন্বন্তর, তৎপরবর্তী মহামারী, কিংবা আগস্ট-বিপ্লব বা যুদ্ধকালীন নিদারুণ অভিজ্ঞতা। মোটামুটি এই কয়েকটি ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া গত কয়েক বছর ধরিয়া বাঙালী লেখকগণ সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। এমন হইয়া থাকে এবং এমন হওয়াই উচিত। বাঙালী লেখক যে বাস্তব-তৎপর, পরিবেশগ্রাহী, স্বজন-বৎসল—ইহা তাহার প্রমাণ। কাজেই ইহা শুভসূচী। বাঙালী হিসাবে তাঁহারা নিজেদের কর্তব্যে সমুৎসুক—ইহাতে আনন্দিত না হইবে এমন বাঙালী কে আছে? কিন্তু বাঙালী লেখকের কাছে জাতি যে দাবি করে, তাহা কেবল ব্যক্তি হিসাবে নয়, লেখক হিসাবে। ব্যক্তি-কর্তব্যের চেয়ে লেখকের কাছে শিল্পী-কর্তব্য উচ্চতর স্তরে হওয়া উচিত। নতুবা তিনি জাতিকে তাঁহার বিশিষ্ট ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিলেন বলিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ তাঁহার মনকে নাড়া দিয়াছে, ইহা

যেমন আনন্দের কথা, তেমনি এই আন্দোলনে ভূগর্ভের রত্নখনি উদ্ঘাটিত হইল কি না, তাহাও বিচারের কথা। কিংবা পূর্বতন উপমাকে অনুধাবন করিয়া বলিতে পারি, দুর্ভিক্ষের ছাপ লেখকের মন হইতে শিল্পলোকে বহির্মুক্তি লাভের সময়ে বৈতরণী-স্নান সমাপন করিয়া শিল্পসম্মত রূপান্তর লাভ করিল কি না—তাহাই প্রধান বিচার্য বিষয়। যদি তাহা হইয়া থাকে তবে এ প্রবন্ধ লিখিবার কোন কারণ নাই ; কিন্তু যদি তাহা না হয় বা কেবল আংশিক মাত্র হয়, তবে বুঝিতে হইবে বাঙলা সাহিত্যের নামে বাঙলা ভাষায় কেবল জর্নালিজম্‌ চলিয়াছে। দুর্ভিক্ষটা লেখক ও প্রকাশকের পক্ষে সুভিক্ষ হইলেও বাঙলা সাহিত্য সত্যসত্যই উপবাসী ছিল। বাঙলা দেশের মতো বাঙলা সাহিত্যেও দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া গিয়াছে—এখন পরবর্তী অধ্যায় অর্থাৎ মহামারী চলিতেছে। বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে সত্যসত্যই মন্বন্তর। কারণ অধিকাংশ লেখক ও পাঠক 'জর্নালিজম'কে সাহিত্যের আদর্শ বলিয়া যদি গ্রহণ করে, তবে ভবিষ্যতের শিল্পাদর্শের পক্ষে তাহাকে নিতান্ত অকল্যাণকর বলিতে হইবে। এই কয়েক বছরের সাহিত্য পাঠ করিলে দেখা যাইবে অনেক উচ্চশ্রেণীর শিল্পী তত্ত্বের খাতিরে, দেশপ্রেমের খাতিরে, সুলভ খ্যাতি ও দুর্লভ অর্থের খাতিরে নিম্নশ্রেণীর সাংবাদিকে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশ বই যেন খবরের কাগজের 'কাটিং' কাটিয়া রচিত। তাহা সাহিত্যের বকলমের নীরস ডায়ারি। সাহিত্য ও সংবাদপত্র এতদিন আড়াআড়ি করিয়া আসিতেছিল; আজ হঠাৎ চৌর-মৈত্রীতে চিরকালের ভেদ ঘুচাইয়া এক কিম্ভূত মূর্তি লাভ করিয়াছে। সাহিত্য ও সংবাদপত্র দুই-ই স্বক্ষেত্রে প্রধান এবং অত্যাবশ্যক। কিন্তু দুইয়ে মিলিয়া হঠাৎ জগন্নাথ-ক্ষেত্র রচনা করিলে কাহারও মঙ্গল হয় না।

এখন প্রশ্ন উঠিবে, কালের দাবিতে সাহিত্য ক্রমেই অধিকতর বাস্তব হইয়া উঠিতেছে—ইহা কি তুমি চাও না? অবশ্যই চাই। বাস্তব ভিত্তি ছাড়া আদর্শ দাঁড়াইবে কোথায়? আদর্শের শুভ্র মর্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পাথরের প্রয়োজন, বাস্তব সেই পাদপীঠ। কিন্তু

পাদপীঠখানা প্রস্তুত করিবারও একটা নিয়ম আছে। তা ছাড়া, পাদপীঠটাই সব নয়, তার উপরে আদর্শের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল কি না, সেদিকেও তো লক্ষ্য দেওয়া দরকার। এমন ক্ষেত্রে বাস্তবকে চাই না—একথা কেহ বলিবে না। কিন্তু আরও একটি কথা আছে। বাস্তব ও আদর্শে যে ভেদ সচরাচর কল্পিত হয় সে ভেদ কি সত্য? কিংবা সে ভেদ কি এতই দুর্ভেদ্য? বাস্তবই কি রূপান্তরে আদর্শ নয়? কিংবা আদর্শই কি রূপান্তরে বাস্তব নয়? শিবের জটায় যে গঙ্গা অবস্থিত, তাহাই আদর্শ; আর মর্ত্যের যে গঙ্গা জনপদের তৃষ্ণা মিটাইয়া প্রবাহিত তাহাই বাস্তব; এ দুয়ের মাঝখানে আছে ভগীরথ-শিল্পীর সাধনা—যাহার বলে মহাদেবের জটাবাস পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গা সর্বলোকের আয়ত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। বাস্তব ও আদর্শ যদি একই বস্তুর রূপান্তর মাত্র হয় তবে এ বিষয়ে তর্কটাও প্রায় অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। আসল প্রশ্নটা দাঁড়ায় রূপান্তরের প্রক্রিয়ার সার্থকতা লইয়া। নিছক বস্তু যে বাস্তব নয়, আবার সাহিত্যের বাস্তব যে জাগতিক বাস্তব হইতে ভিন্ন, এ বিষয়ে আশা করি কেহ প্রশ্ন তুলিবেন না। কিন্তু তর্ক বাধিবে আর এক প্রসঙ্গে—যে রচনাকে আমি বাস্তব বলিব, তাহাকে তুমি আদর্শিক বলিবে—আবার উল্টাটাও অসম্ভব নয়। ইহা রুচির কথা—যুক্তির কথা নয়। রুচি লইয়া তর্ক চলে না, কাজেই ক্ষান্ত দিতে হইল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠিবে—দুর্ভিক্ষবিষয়ক রচনায় এত আপত্তি কেন? দেশের প্রতি লেখকের কি কর্তব্য নাই? কর্তব্য আছে বলিয়াই আপত্তি, কর্তব্য না থাকিলে এ প্রসঙ্গের অবতারণাই করিতাম না। কিন্তু সে কর্তব্য লেখকের কর্তব্য। ব্যক্তি হিসাবে কেহ দুর্ভিক্ষে দান করিতে পারে কিংবা অন্য প্রকারের সাহায্য করিতে পারে—সে স্বতন্ত্র কথা। তাহা সাহিত্য বিচারের এলাকাধীন নয়। লেখক হিসাবে যখন সে কর্তব্য সাধন করিতে যাইবে, তখন তাহাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। দুর্ভিক্ষের বাস্তবকে সাহিত্যের বাস্তব করিয়া তুলিতে হইবে। নতুবা সরাসরি তাহার বর্ণনামাত্র করিলে দুর্ভিক্ষ

কমিশনের রিপোর্টে ও সাহিত্যে প্রভেদ কোথায় থাকিল? দুর্ভিক্ষ লইয়া আগেও তো বাঙলা সাহিত্য রচিত হইয়াছে, 'ছিয়াত্তরের' দুর্ভিক্ষের রূপান্তর বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ। তাহা নিছক রিপোর্টের চেয়ে উচ্চতর গ্রামের সত্য বলিয়াই আজও অপাঠ্য হইয়া যায় নাই—কিংবা তাহার মধ্যে চিরন্তন এমন কিছু আছে, যাহাতে তাহাকে 'পঞ্চাশের' দুর্ভিক্ষের শ্রেষ্ঠতম রচনা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব নয়। ইহার কারণ বাস্তবকে তিনি বৈতরণী-স্নানে রূপান্তরিত করিয়া শিল্প-লোকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। আমাদের বিপদ হইয়াছে এই যে, আমরা ব্যক্তি-কর্তব্যে ও সাহিত্যিক-কর্তব্যে তালগোল পাকাইয়া ফেলিয়াছি। ইহার একটা কারণ কুশিক্ষাগত শিথিল চিন্তা। দ্বিতীয় কারণ বিরাট বিপদের সম্মুখে আত্মবিহ্বল ভাব। ঘরে আগুন লাগিলে জল ঢালিতে হয়, কিন্তু মাথা খারাপ করিয়া শূন্য কুম্ভ উপুড় করিলে তো আগুন নিভিবে না। অব্যবস্থিত সহানুভূতিতে কোন ফলোদয় হইবে না। সফল কার্যকারিতার জন্য ধীরতার প্রয়োজন। বিপদের সম্মুখে ধীরতা সম্ভব নয়। কাজেই বিপদের মধ্যে লিখিত রচনায় বিপদের অভিজ্ঞতা শিল্প-মূর্তি যে লাভ করে নাই, তাহাতে বিস্ময়ের আর কি আছে?

এইখানে প্রশ্ন উঠিবে যে, মানব-করুণা আমাদের মনে এমন উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে যে, আমরা অপেক্ষা করিতে নারাজ। বিগলিত মানব-করুণা সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু বিগলিত করুণাকে ঢালাই করিবার মতো ছাঁচখানা হাতের কাছে আছে কি না, একবার চিন্তা করিয়া দেখাও তো আবশ্যক। উদ্বেলিত মানব-করুণা যত্রতত্র পথঘাটে নষ্ট হইলে কাহার কি লাভ? মনের করুণার তাগিদে দানসত্র খুলিয়া দিলে কাহারও আপত্তি করিবার হেতু থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহাকে শিল্প-মূর্তি দিতে হইলে অবশ্যই শিল্পসম্মত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

এই মানব-করুণা কথাটা আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যেন 'আণবিক বোমা' বা 'উড়ন্ত রকেটের' মতো একটা নিতান্তই আধুনিক আবিষ্কার। এমন কথাও অনেকের মুখে

শুনিয়াছি যে, প্রাচীনকালের ক্লাসিকাল লেখকগণ মানব-করুণার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, ও বিষয়ে যেন আধুনিকদেরই জিত : সেইজন্য রামায়ণ-মহাভারতে, হোমারের কাব্যে, দান্তের কাব্যে বা শেক্সপীয়রের নাটকাবলীতে দুর্গত ও সর্বহারাদের সমবেদনার রঙে অঙ্কিত বাস্তব চিত্র নাই; তাঁহাদের নায়ক-নায়িকা সকলেই রাজা-মহারাজা বড় বড় বীর, অতি-মানুষিক যাঁহাদের গুণাবলী; তাঁহাদের সর্বহারাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন না; কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতো সর্বহারার জগৎ আবিষ্কৃতি যেন আধুনিকদেরই বিশেষ একটা কৃতিত্ব; ইহার প্রধান কারণ, আর যে শক্তিই তাঁহাদের থাকুক, মানব-করুণায় তাঁহাদের মন এমন উদ্বেলিত ছিল না।

কিন্তু কথাটা কি সত্য? বাল্মীকির উপাখ্যানের মূল সত্যটা কি? যে ঋষির বুক একটি ক্রৌঞ্চকে নিহত হইতে দেখিয়া বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তিনি মানব-করুণার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না—ইহা কে বিশ্বাস করিবে? শুধু তাঁহার ব্যক্তিগত করুণা নয়, আদি-কাব্যের মূলে এই শোকের কাহিনী থাকিয়া শোক ও শ্লোককে ইঙ্গিতময় অর্থে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। যিনি এই কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, তিনি মানব-করুণার চেয়েও ব্যাপকতর ও গভীরতর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন—তিনি জীব-করুণার উপরে শিল্পকলাকে চিরকালের জন্য সন্নিহিত করিয়া দিয়াছেন। সেইজন্যই তিনি রাজা-মহারাজা কিংবা দুর্গত দরিদ্র কাহারও বধের উল্লেখ না করিয়া সামান্যতম একটি বন্য-পাখির উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার মধ্যে প্রাণের প্রকাশ ক্ষুদ্রতম ও নগণ্যতম। ওই পাখিটির মধ্যে নিছক প্রাণের মূর্তি বিশুদ্ধতম, অর্থাৎ পাখিটা একটা প্রাণীমাত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। একজন দুর্গত যতই দুর্গতিগ্রস্ত হোক তাহার মধ্যে প্রাণের এমন নির্বিকার রূপ কখনই দেখা যাইত না। সে প্রাণী, সে মানুষ, সে সংসারী জীব, নানা ছোট-বড় সূত্রে প্রাণের বিশুদ্ধ রূপটা যেন আচ্ছন্ন। তাহাকে মারিলে কেবল যে একটা প্রাণী মাত্র বধ করা হয়, তাহা নহে; সে আঘাত আরও ব্যাপকতর ও গভীরতর দাগ রাখিয়া যায়। কিন্তু মানব-সম্পর্ক-নির্মুক্ত এই

বন্য পাখিটার সম্বন্ধে সে কথা খাটে না—সে একটি প্রাণকণিকা মাত্র—তাহার বেশি নয়। এই প্রাণ কণিকার মৃত্যু দেখিয়া কবিচিত্ত বিগলিত হইয়াছিল—আদি-কবিতার উদ্ভব হইয়াছিল। ইহার মূল সত্য এই যে, কবি ও কবিতার আদিম প্রত্যুষে আছে জীবন-করুণা—যাহা আধুনিকদের কথিত মানব-করুণার চেয়ে অনেক বেশি গভীর ও সত্য।

কিন্তু আর একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল না। প্রাচীন কবিগণ কেবল রাজা-মহারাজা বীরপুরুষদের লইয়াই প্রধানত কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন কেন? দুর্গতদের কথা তাঁহারা বলেন না কেন? জীব-করুণার তর্ক ছাড়িয়া দিলেও মানব-করুণার অভাব কি ইহাতে সূচিত হয় না? আপাতদৃষ্টিতে তেমন মনে হওয়া অসম্ভব নয়। ইঁহাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিল। রামায়ণের ঋষি মানুষের দুঃখের কথা বলিতে বসিয়াছিলেন, দরিদ্রের দুঃখের কথা নয়। তবে কি দরিদ্র মানুষ নয়? মানুষ বই কি—কিন্তু তাহা ছাড়া আরও কিছু। সেটা কি? সে দরিদ্র। অর্থাৎ তাহার দারিদ্র্য, তাহার অভাব, তাহার দৈনন্দিন উদ্বেগ, তাহার মধ্যেকার বিশুদ্ধ মানবরূপকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাহার মধ্যে মানুষকে খুঁজিতে গেলে হাতে বারংবার তাহার দারিদ্র্যটা ধরা পড়ে। তাহার দুঃখের কথার প্রায় ষোল আনাই কোন না কোন রূপে দারিদ্র্যের কথা। দারিদ্র্য মনুষ্যত্বের সঙ্গে অভিন্ন নয়। আমি যাহাকে দারিদ্র্য বলি—তুমি তাহাকেই প্রাচুর্য বলিবে। আবার আজ যে দরিদ্র কাল তার পক্ষে ধনবান হওয়া অসম্ভব নয়। কাজেই মানুষ দারিদ্র্যের কথা শুনিতে চায় না, তাহার মনের আদিম ঔৎসুক্য মানুষের কথায়—মানুষের সুখদুঃখের বিরহ-মিলনের দোলাবর্তের লীলায়। 'প্রাচীন'দের উদ্দেশ্য ছিল এই মানুষের কথা বলা, আধুনিকদের যেমন দারিদ্র্যের কথা।

এখন মানুষের চিরন্তন ও বিশুদ্ধ স্তরে পৌঁছিতে গেলে কয়েকটি স্তর ভেদ করিয়া যাইতে হয়, যে স্তরগুলি শাশ্বত নয়, ক্ষণিক। মানুষের জৈব-জীবন আছে, তাহার সাংসারিক জীবন আছে। জৈব-জীবনে সে প্রায় পশুর সামিল; সাংসারিক জীবনে সে মানুষ বটে, কিন্তু

ক্ষণিককালের মানুষ। আজকার প্রয়োজন কাল তাহার থাকে না, আজকার অবস্থা দু'দিন বাদে পরিবর্তিত হওয়া বিচিত্র নয়। এখানে তাহার চিরন্তন মূর্তি পাইবার আশা নাই। এমন কি তাহার শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যেও সে চিরন্তন নয়। এ বিষয়ে একের সঙ্গে অন্যের প্রভেদ আছে, আবার আজকার একের সঙ্গে কালকার একের প্রভেদও কম নয়। কিন্তু কোথায় তাহা হইলে সেই চিরন্তন মানুষ, যাহার সঙ্গে অপরের প্রভেদ নাই, নিজের মধ্যেও যাহার বিরোধ নাই, যে দেশ-বিশেষ ও কাল-বিশেষের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া চিরকালের মানুষের সঙ্গে সমাত্মীয়! এই মানুষকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে তাহার জৈব-জীবন, তাহার সাংসারিক জীবন, এমন কি তাহার শিক্ষা-দীক্ষার জীবনের সিংহদ্বার কয়টা পার হইয়া যাইতে হইবে। এ তিনটাকে যথাক্রমে বলা যাইতে পারে পশু-মানব, আর্থিক-মানব এবং সাংস্কৃতিক-মানব। ইউরোপের, কাজেই এদেশের, নবীন সাহিত্যের বিশেষ ঝোঁক এই তিনটার উপরে --যে তিন অবস্থা মানুষের পবিবর্তনশাল ও ক্ষণিক। বর্তমানকাল পরিবর্তনশীল ও ক্ষণিক-ধর্মী, চিরন্তনে তাহার বিশ্বাস নাই, অতএব স্বভাবতই এইসব বিষয়কে সে সাহিত্যিক উপজীব্য করিয়া লইয়াছে। সেইজন্য তাহাব আজকার যুগান্তরকারী বই কালকার আস্তাকুঁড়েও খুঁজিলে মেলে না!

আর 'প্রাচীন'গণ বাহ্য আবরণত্রয়েব অন্তর্নিহিত চিরকালীন মানুষের দুঃখের কথা বলিয়াছেন বলিয়া রামায়ণ আজও পুরাতন হইল না। রামচন্দ্র রাজা ছিলেন—বাল্মীকির এই অপরাধ 'নবীন'গণ আর কিছুতেই ভুলিতে পারেন না। কিন্তু বাল্মীকি কি রামচন্দ্রের রাজত্বের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন? তিনি রামচন্দ্রের যে দুঃখের কথা বলিয়াছেন তাহা কোন্ মানুষের দুঃখ নয়? রামচন্দ্রেব সঙ্গে যে জায়গাটায় সকল মানবের মিল সেখানে রামচন্দ্র অসাধারণ নন, সেখানে তিনি সার্বজনীন, সেখানে তাঁহার দরিদ্রতম প্রজার সঙ্গে তিনি অভিন্ন। এই সার্বজনীন, অভেদে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যই আদি কবিকে পূর্বোল্লিখিত ত্রি-স্তরের অতীত মানুষকে খুজিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। ক্রৌঞ্চের

মধ্যে তিনি যেমন বিশুদ্ধ জীব-করুণাকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ত্রি-স্তরাতীত রামচন্দ্রের মধ্যে তেমনি তিনি বিশুদ্ধ মানবকরুণাকে লক্ষ্য করিয়াছেন। মানুষের কথা মানুষ শুনিতে চায় বলিয়াই রামায়ণ-কাব্য মনে রাখিয়াছে, দরিদ্রের কথা হইলেও দরিদ্রেও ইহা মনে রাখিত না।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, রাজার মধ্যে যেমন বিশুদ্ধ মানবরূপ আছে, দরিদ্রের মধ্যেও তো তেমনি বিশুদ্ধ মানবরূপ সম্ভব, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কাব্য লিখিলে কি চলিত না? অবশ্যই চলিত। কিন্তু দরিদ্রের বিশুদ্ধ মানবরূপ লইয়া কাব্য লিখিলে দারিদ্র্যের কথা তাহাতে থাকিত না, কাজেই তাহাকে দরিদ্রের কথা আর বলা যায় কি প্রকারে? দরিদ্রের মধ্যে যে চিরকালীন মানুষ তাহার সঙ্গে রামচন্দ্রের মধ্যেকার চিরকালীন মানুষের প্রভেদটা কোথায়? কাজেই ও দুই এককথাই হইল। তাহা ছাড়া কাব্যেরও একটা দাবি আছে। মহাকাব্য রচনার ভারত-জোড়া শিবির স্থাপন করিতে গেলে শক্ত, বৃহৎ ও সুউচ্চ স্তম্ভের আবশ্যক। তৎকালীন পবিবেশে অযোধ্যার রাজবংশই ছিল সেই স্তম্ভ। কিন্তু রাজবংশের মাহাত্ম্য বর্ণনা নিশ্চয়ই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না—ইহা উপলক্ষ্য মাত্র। তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানুষের সুখদুঃখের কথা বলিয়া মানুষকে মুগ্ধ করিয়া রাখা। সে উদ্দেশ্য যে তাঁহার সিদ্ধ হইয়াছে ইহা বোধ করি 'নবীন'গণ স্বীকার করিবেন।

এবারে পূর্বতন সাহিত্যিক জাতিস্মরতার প্রসঙ্গে আবার ফিরিয়া আসা যাক্। সাহিত্যে জাতিস্মরতা ঘটিবার প্রধান কারণ দুইটি। ঘটনার সমকালে তাহাকে সাহিত্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলে পরিপ্রেক্ষিতের দোষে বা অভাবে তাহা শিল্প না হইয়া জর্নালিজম্ মাত্র হইতে পারে। ঘটনাটির যথার্থ স্বরূপ দেখিবার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন। ঠিক কতটা সময় দরকার তাহার নিয়ম নাই; তাহা ঘটনার গুরুত্ব ও লেখকের প্রতিভার উপরে

নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' স্বদেশী আন্দোলনের শিল্পরূপ। স্বদেশী আন্দোলনের অত্যল্পকাল পরেই এই উপন্যাস রচিত। লেখকের ঘটনা-স্বরূপ দেখিবার অসামান্য ক্ষমতার বলে এখানে দীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহার 'গোরা' উপন্যাসও বাঙালী সমাজের বিশেষ একটি অবস্থার শিল্পসম্মত জন্মান্তর। এখানেও পরিপ্রেক্ষিত স্বল্পকালের। অবান্তর তথ্য অতিক্রম করিয়া তত্ত্বে উপনীত হইবার অসাধারণ ক্ষমতাই দুই স্থানে শিল্পকে জর্নালিজমের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন লেখকের ঋষি-দৃষ্টির। এই ঋষি-দৃষ্টি প্রতিভাবান্ লেখকমাত্রেরই থাকে। কাহারো বেশি, কাহারো কম। এই ঋষি-দৃষ্টির দ্বারা সাহিত্যিক নিছক জর্নালিস্ট্ হইতে ভিন্ন। এই সহজাত ঋষি-দৃষ্টি বাড়িতে পারে লেখক যদি নিজের সত্তাকে দেশের ঐতিহ্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে পারেন। তজ্জন্য সাধনার আবশ্যক।

গাছ কতকগুলি শিকড় দিয়া নিজেকে মাটির উপরে বিধৃত করিয়া রাখে—আবার মূল শিকড় দিয়া গভীর হইতে রসাকর্ষণ করিয়া নিজেকে সঞ্জীবিত করিয়া থাকে। প্রত্যেক লেখকেরই শক্তির অনেকটা যায় সংসারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে—অধিকাংশেরই মূল শিকড় ক্ষণিকতার স্তর ছাড়াইয়া গভীরে প্রবেশ করে না। কাজেই তাহারা যে-রস পান করিয়া সঞ্জীবিত তাহা প্রায়শ ক্ষণিককালের। চিরকালের রস-প্রবাহ নিম্নতর স্তরে বর্তমান। ইহাই দেশের ঐতিহ্য। এইখানে শিকড় প্রেরণ করিতে না পারিলে এমন সাহিত্য রচনার আশা থাকে না—যাহা দেশের সমস্ত অস্তিত্বকে আন্দোলিত করিতে সমর্থ। বাঙলা সাহিত্য হইতে উদাহরণ দেওয়া যাক্। মধুসূদনের প্রথম শ্রেণীর শিল্প ক্ষমতা ছিল। তাঁহার প্রতিভার প্রচণ্ড আবেগ বাঙলা সাহিত্যে অসাধ্য সাধন করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তিনি দেশের ঐতিহ্যের সহিত নিজেকে যুক্ত করিতে পারেন নাই। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর প্রতি তাঁহার আসক্তি নিতান্তই শিল্পীর আসক্তি।

বিদেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁহার যোগ দেশীয় ঐতিহ্যের যোগের চেয়ে গভীরতর। বিদেশীর রসে তিনি দেশীয় কাহিনীকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন। দেশের ঐতিহ্যের পরিচয় ছিল না বলিয়াই তাঁহাকে শিল্পক্ষেত্রে বারংবার বিদেশী নজির খুঁজিতে হইয়াছে। তাঁহার সব কাব্যই বিদেশী 'মডেলে' গঠিত। বিদেশের মডেলের নজিরকে অতিক্রম করিয়া কিছু রচনা করিবার সামর্থ্য তাঁহার হয় নাই। দেখা যাইতেছে, দেশের ঐতিহ্যের রসে তাঁহার পুষ্টি সাধিত হয় নাই বলিয়াই তিনি শিল্পীমাত্র হইয়াছেন। ব্যাপকভাবে, গভীরভাবে দেশের চিত্তকে স্পর্শ করিয়া তাহাকে আন্দোলিত করবার ক্ষমতার ঐকান্তিক অভাব তাঁহার কাব্যদৃষ্টিতে। মধুসূদন সাহিত্যিকদের মাত্র কবি।

তাঁহার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের তুলনা করিলে প্রভেদটা বেশ চোখে পড়িবে। ইঁহাদের দুজনের মধ্যেই বিদেশীয় প্রভাব আছে—কিন্তু তাহা নিতান্ত বাহ্য-ব্যাপার। এই দুই বিরাট বনস্পতির মূল শিকড় দেশের প্রাচীনতর স্তরে, নিত্য রস প্রবাহের স্তরে নিমজ্জিত হইয়া রসপান করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে সেই স্তর গীতা ও মহাভারত, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে উপনিষদ ও কালিদাস। দেশের ঐতিহ্যকে তাঁহারা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই বিদেশী ঐতিহ্য তাঁহাদের রচনায় এমন ফলপ্রসূ হইয়াছে। Charity-র মতো 'কালচারের'ও সূত্রপাত স্বগৃহে। স্বগৃহ সত্য না হইলে পরগৃহ কখনও সত্য হয় না। আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে যতই নিন্দিত হোক না কেন—তাহাদের প্রধান তাৎপর্য এই যে, এগুলিতে দেশের ঐতিহ্যের উপরে বিদেশের রাজনৈতিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। সেইজন্যই এ দুখানা বই দেশের উপরে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। দেশীয় ঐতিহ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে অচেতন কোন ব্যক্তির দ্বারা ইহা লিখিত হইবার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না, কিংবা সে রকম কোন গল্প লিখিত হইলেও তাহা শিল্পমাত্র হইত—তাহার বেশি কিছু নয়। ভারতীয় জীবনতত্ত্বের স্থায়ী ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই গোরা, সাময়িক ঘটনার বিবৃতি হইয়াও চিরসাময়িক।

বাস্তবের রূপান্তরের কথা পূর্বে বলিয়াছি। রূপান্তরের অর্থই সাময়িককে চিরসাময়িকের জলে অভিষেক। এই জল লেখকের মন-বৈতরণীর জল। এই বৈতরণীর উৎস দুইটি। দেশের ঐতিহ্য ও লেখকের প্রতিভা।

আমাদের আধুনিক লেখকদের মধ্যে প্রতিভা অনেকেরই আছে। কিন্তু 'ঋষি-দৃষ্টি', অর্থাৎ বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া ঘটনার স্বরূপকে দেখিবার ক্ষমতা, কাহারো নাই বলিলেই হয়। এই ক্ষমতার অভাব তাঁহাবা পূরণ করিতে চান কেবল ঘটনার চতুব বিন্যাসের দ্বারা কিংবা বিদেশের ধারকরা তত্ত্বের দ্বারা। ঘটনার বিন্যাস যতই চতুর হোক তাহা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য নয়; আর ধার করা তত্ত্বের দ্বারা কোন স্থায়ী উপকার হওয়া অসম্ভব। ফলে বাস্তব বাস্তবই থাকিয়া যাইতেছে, তাহার রূপান্তর ঘটিতেছে না এবং সাহিত্যিক জাতিস্মরের সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়াই চলিতেছে। আর সবচেয়ে আশঙ্কার কথা এই যে, আমাদের লেখকগণ এই বিপদ সম্বন্ধে সচেতন পর্যন্ত নন, বরঞ্চ জাতিস্মরতাকেই তাঁহারা সাহিত্যের আদর্শ বলিয়া বাছিয়া লইয়াছেন। পাঠক ও প্রকাশকের তাগিদে অন্তরের বৈতরণীর কলধ্বনি আব তাঁহাদের কানে প্রবেশ করে না। একবার তাঁহারা স্থিত-ধী হইয়া দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করিতে চেষ্টা করিবেন কি? নতুবা দেশের প্রতি সমবেদনা সত্ত্বেও ক্ষণিক জর্নালিজম্ মাত্র সৃষ্টি করিয়া শেষ পর্যন্ত দেশকে তাঁহাদের সাহিত্যিক ক্ষমতা হইতেই বঞ্চিত করিবেন।

কালিদাসের বিদূষক

সার্কাসের ভাঁড় তারের উপরে চলিতে গিয়া পড়িয়া যায়; সাইকেল চাপিতে পা ফস্কায়; ঘোড়ায় চড়িতে আছাড় খায়; তবু দর্শক হাসে। শুধু হাসি নয়, দলের মধ্যে ওই লোকটাকেই সে সর্বাপেক্ষা আপন মনে করে। যে খেলোয়াড় অত্যন্ত দুরূহ খেলা দেখায়, লোকে তাহাকে বাহবা দেয়, কিন্তু ভালবাসে ওই ভাঁড়টাকে? কেন এমন হয়? সার্কাসের ভাঁড়ের বিফলতার মধ্যে সফলতার আভাস ফুটিয়া উঠে। দর্শক বোঝে লোকটা সবই জানে, অকৃতকার্যতা তাহার স্বেচ্ছাচার। লোকটার পা দুই নৌকায়, এক পা দর্শকের সঙ্গে, সেখানে তার ব্যর্থতা; আর পা প্রদর্শকের সঙ্গে সেখানে সে কৌশলী। এইরূপে লোকটা দর্শক ও দর্শিতের মাঝে যোগসূত্র। কাজেই লোকটার সহিত দর্শক একাত্মতা বোধ করে।

কিন্তু লোকটা এমন অনায়াসে সার্কাসের সবগুলি কৌশল ব্যর্থতা দ্বারা হাসি আকর্ষণ করে কেমন করিয়া? তার কারণ সে সব খেলা-গুলাকেই আয়ত্ত করিয়াছে, এবং আয়ত্ত করিয়াছে বলিয়াই তার স্বেচ্ছাকৃত নিষ্ফলতা রঙ্গস্থলে প্রাণখোলা হাসি প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে।

সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে আমরা মাঝে মাঝে যে বিদূষককে দেখি, সে অনেকটা ওই সার্কাসের ভাঁড়ের মতো। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতিকে আমরা সম্ভ্রম করি; রাজ্ঞী, সখী, নিপুণিকা, চতুরিকাদের জন্য না হয় আরো একটা কোমল ভাব হৃদয়ে জাগে, কিন্তু ভালবাসি ওই বিদূষককে; তার সঙ্গেই আমাদের একাত্মতা।

আমরা বুঝিতে পারি লোকটা জীবনের সকল রহস্যকে জানিয়াছে, জীবনের প্রকোষ্ঠ সে দেখিয়াছে, তাই সে এমন অনায়াসে, কারণে অকারণে, নিজেকে ব্যর্থতার আবরণে ঢাকিয়া লোকচিত্তরঞ্জন করিতে দ্বিধা বোধ করে না। এক কথায় সে জীবনশিল্পে পারঙ্গম; সে জীবন-শিল্পী।

জীবনকে সে সর্বতোভাবে আয়ত্ত করিয়াছে বলিয়াই সংসারের সকল লোক তাহার সহিত কোন না কোন অংশে আত্মীয়তা অনুভব করে।

আজ আমবা এই বিদূষক-আইডিয়ার বিশ্লেষণ করিব। আমাদের প্রধান সহায় কালিদাসের নাটকত্রয়েব বিদূষক তিন জন। আসলে কিন্তু ইহারা এক ব্যক্তি। কালিদাসের প্রতিভার পরিণামের সঙ্গে মালবিকাগ্নিমিত্রেব গৌতম শকুন্তলার মাধব্যে প্রৌঢ়ত্ব লাভ করিয়াছে, মাঝখানের স্তরে বিক্রমোর্বশীর বিদূষক।

আমরা বলিয়াছি বিদূষক জীবন-শিল্পী। সেই হিসাবে তাহার অস্তিত্বের ভিত্তিপত্তন মানুষেব সাধাবণতম সার্বভৌমিক অভিজ্ঞতার উপরে। একটা পিবামিডের মতো গোড়াতে প্রশস্তময়, চূড়াতে সূক্ষ্মতম। মানুষের সার্বভৌম তিনটি অভিজ্ঞতা—আহার, নিদ্রা ও প্রণয়। এই জন্যই দেখি সংস্কৃত নাটকে বিদূষকরা প্রধানত ওই তিনটি কার্যে ব্যাপৃত। আহারে ও নিদ্রায় সে একান্ত বিলাসী, আর তাহার প্রধান কার্যই যেন বাজার প্রণয়ব্যাপারে মন্ত্রণাদান। এই সাধারণতম অভিজ্ঞতার সিংহদ্বাব দিয়া সে অনায়াস-গৌববে লোক-সাধারণের চিত্তজয় করিয়া ফেলে। লোকে বুঝিতে পারে রাজা, মন্ত্রী, শকুন্তলা, উর্বশী প্রাংশুলভ্য, তাহাদের সগোত্র ওই বামুনটা। কিন্তু তবে হাসে কেন? ওই তিনটা অপরিহার্য অভিজ্ঞতা পশু-জীবনের সহিত তাহাকে অমোঘশৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই মানুষ উহাকে যেন হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চায়। ব্যক্তিগত জীবনে আমরা কি করি? যে দোষটা সকলে জানিয়াছে, যাহাকে বর্জনের কোন উপায় নাই, সেটাকে আমরা অত্যন্ত একটা উচ্চাঙ্গ হাস্যের দ্বারা

খানিকটা. পরিমাণে অস্বীকার করিয়া লঘু করিয়া ফেলি। বিদূষকের প্রতি এই হাসিও সেই কারণে। আবার এই বিদূষক-পিরামিডের উচ্চতম অংশটা সূক্ষ্মতম। সেখানে তার বিদ্যাবুদ্ধি, এবং মানসজীবন। বিদূষক পণ্ডিত কিন্তু সে সর্বদাই হয় পাণ্ডিত্যকে ঠাট্টা করে, নয় অবজ্ঞার ভান করে। ইহার কারণ পূর্বোক্ত কথাতে রহিয়া গিয়াছে। সে লোক-সাধারণের সহিত একাত্মা স্থাপন করিতে চায় : সে ইচ্ছা করে লোক তাহাকে দশের একজন বলিয়া মনে করুক, দশম বলিয়া নয়। লোক-জীবনে মনীষা একটা বিরল অভিজ্ঞতা ; কাজেই পণ্ডিত খ্যাতি রটিয়া গেলে সাধারণের বৃহত্তম অংশ তাহাকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিবে। বিদূষকও সাধারণ লোক ; 'দ্বৌ অপি অত্র অরণ্যকৌ' ; এক জনের স্বভাষী আর এক জন। মানসজীবন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধতা করিয়া মানুষকে উচ্চে টানিতে থাকে, বিদূষক মানসিক মাধ্যাকর্ষণের সহায়, সে এই উর্ধ্বগামিতা সহ্য করিতে না পারিয়া মানসজীবনকে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে। ইহাতেও সে সাধারণের সহিত একাত্মক ; লোকমন ক্ষণে ক্ষণে উচ্চে উঠিলেও অনেকক্ষণ উচ্চে টিকিতে পারে না, স্বভাবত সে পদাতিক।

২

বার্ণাড শ' চেস্টারটনকে বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ফলস্টাফের শরীরে দেবশিশুর মুখ। ইহা শুধু যে চেস্টারটনের বর্ণনা তা নয়, সমস্ত বিদূষকের অস্তিত্বের মূলকথা, কারণ চেস্টারটন বিদূষকের প্রতীক। এই উক্তি কেবল রসিকতা নয়, বড় সত্য কথা, যে-কথার এক দিকে সত্য অপর দিকে সরসতা, সেইতো সরস্বতীর প্রধান অস্ত্র ; ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া প্রবাদ—অসির চেয়ে বাণী অধিক শক্তিশালী।

ফলস্টাফের শরীরের প্রধান অংশ উদর, দেবশিশুর মুখ উদার ; বিদূষকের মধ্যে এই দুটি নিত্য সংযুক্ত, প্রভেদ যা কিছু তা কেবল আকারে। এক দিকে সরলতা, অন্যত্র সরসতা ! বিদূষক আসলে সরল ; অনেক সময় আমরা নির্বোধ ভাবি। নির্বুদ্ধিতা ও সরলতা

দৃশ্যত প্রায় এক রকম, যেমন কাচ আর হীরক। সেইজন্য ইংরেজী সাহিত্যে স্নেহ কৌতুকের বশে বিদূষকের নাম Fool। সে যদি সত্যই 'ফুল' হইত তবে এই ব্যাঙ্গোক্তির হুল সহ্য করিত না। আর লেখকের পক্ষেও হইত বিশেষণটার প্রয়োগ নিতান্ত বাহুল্য।

বিদূষকের স্থূলতা হাস্যরসের প্রধান উপকরণ, শুধু স্থূলতা কেন, একান্ত কৃশতাকেও এই সঙ্গে ধরিতে পারি। দুই-ই আমাদের মানসিক ভার-কেন্দ্রকে বিচলিত করে। মানুষের চিত্তের এক কোটিতে বিস্ময়রস অন্য কোটিতে হাস্যরস, মাঝখানে মানুষের মন। আমার অপেক্ষা যে বড় সে মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে, আবার আমার পক্ষে যে ছোট সে হাস্যরসের উপাদান। বিদূষক ছোট কি রকমে? তাহার দেহের ওই বড়ত্বের দ্বারাই সে ছোট। আকৃতিতে সে বড়, হীন সে প্রকৃতিতে। দৈহিক মেদমাংসের বিপুলতার দ্বারা সে যেন অকারণে জড়ের সঙ্গে সগোত্রত্ব ঘোষণা করিতেছে। মাটি পাথরকে আমরা ছোট বড় কিছুই মনে করি না, তাহার সহিত আমাদের মানবসম্পর্ক নাই। কিন্তু যাহার সহিত সে সম্পর্ক আছে, তাহার মধ্যে জড় অংশের বাহুল্য জড়িত থাকিলে তাহাকে কিছুতেই সগোত্র বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা করি না। জড়ত্বের বিরুদ্ধে মানুষের আত্মার অভিযান। যেখানে আত্মা ও জড়ের সমন্বয় হইয়াছে সেখানে প্রকৃত মনুষ্যত্ব। তাই কোন ট্রাজেডির প্রধান চরিত্র না অতিরিক্ত স্থূল না কৃশ। আত্মার ঊর্ধ্ব আহ্বানকে বিদূষক দৈহিক স্থূলতার ভারা (ballast) দ্বারা প্রতি মুহূর্তে নীচে টানিতেছে।

এই জড়ত্ব তো মানুষের পক্ষে অগৌরবের, তবে আমরা হাসি কেন? যাহা অপসারিত হইবার নহে, তাহাকে আমরা হাসিয়া অস্বীকার করিয়া দিই। কিন্তু এই স্থূলতা বিদূষকের একমাত্র উপাদান নয়, তাহার মুখখানি দেবশিশুর। মুখে দুটি ভাব—সরলতা আর আত্মার অমর্ত্যতা। সব রসের মত হাস্যরসেরও একটি দ্বন্দ্ব আছে। বিদূষকের দ্বন্দ্ব তাহার দেহ ও মুখে। তাহার দেহের বেসামাল বিপুলতা বুদ্ধি ও বাক্যের লঘু-ক্ষিপ্রতার সহিত অপরূপ দ্বন্দ্বসৃষ্টি করে। পাঠক একই লোকের মধ্যে এমন

অনৈক্য দেখিয়া কৌতুক অনুভব করে। তাহার দেহে-মনে একটা দড়ি টানাটানি চলিতেছে। দেহের ঐকান্তিক পার্থিবতা; মৌখিক অমর্ত্যতা; দেহের স্থূলতা; বাণীর লঘুতা ও ক্ষিপ্রতা; দেহে সে মানুষের চেয়ে নিচু; মনে সে মানুষের চেয়ে বড়; দেহে সে ভাঁড়; মুখে সে দেবশিশু; সবসুদ্ধ মিলিয়া সে বিদূষক।

৩

এই দেহ-সর্বস্ব বিদূষকটিকে বিশেষ করিয়া প্রয়োজন ট্রাজেডি-নাটকে, যেখানে অতি সূক্ষ্ম, অতি উচ্চ ভাবাবেশের আন্দোলন ও সংঘাতে প্রতি মুহূর্তে পাঠকের মন ক্লান্ত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা। কমেডি জড়তায় জড়তায় সংঘাত, ট্রাজেডি জড়তায় ও আত্মায় সংঘাত; ট্রাজেডির ভাবাতিশয্যের প্রবল স্রোতে বিদূষকের চরিত্র পা ফেলিবার স্থান। সে প্রতিমুহূর্তে জড়জগতের প্রতিনিধির মতো ট্রাজেডির পটভূমিতে অন্নজগৎকে, বস্ত্রজগৎকে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা আহার-নিদ্রা দৈহিক প্রেমেব প্রাত্যহিক জগৎকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে; ইহাতে ট্রাজেডির রসের হানি না ঘটিয়া তাহা আরও জমিয়া ওঠে।

শকুন্তলার ষষ্ঠাঙ্কে হারানো অঙ্গুরী ফিরিয়া পাইয়া রাজা মনস্তাপে কষ্ট পাইতেছেন, তিনি অঙ্গুরীয়কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

কথং নু তং কোমলবন্ধুরাঙ্গুলিং
করং বিহায়াসি নিমগ্নমম্ভসি ইত্যাদি—

তার পরেই বিদূষকের উক্তি—

'মহারাজ ক্ষুধায় আমি মারা যাইতেছি।' ইহার কি প্রয়োজন ছিল? বিরহের উচ্চগ্রামে রাজার হৃদয়ের সুর-বাঁধা, কিন্তু প্রাত্যহিক একটা জগৎ আছে যাহা নিত্যকর্মের; তাহার একটা বিশেষ নিয়ম আছে, তাহার দাবি সে ছাড়িবে কেন? আত্মার জগৎ বড় কিন্তু দেহের জগৎও কম নয়; আত্মার জগতের নিয়ম এদিক ওদিক হইতে পারে কিন্তু পদার্থ জগতের অমোঘ নিয়মের লৌহ-ঘণ্টা কাঁটায় কাঁটায় ধ্বনিত হইতেছে।

বিদূষকের ওই উক্তি "মহারাজ ক্ষুধায় আমি মারা যাইতেছি" তাহারই প্রতিধ্বনি! এ শব্দ তোমার ভালো না লাগিতে পারে কিন্তু তাহাকে মিথ্যা বলিবে কেমন করিয়া! বিদূষক এই পদার্থজগতের ঘণ্টা-বাদক।

শকুন্তলা নাটকে আত্মার জগতেব ঘণ্টা-ধ্বনি রাজকণ্ঠের এই শ্লোকটিতে--

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্,
পর্য্যৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি ন নূনমবোধপূর্ব্বং,
ভাবস্থিবাণি জননান্তর সৌহৃদানি।

ইহার প্রত্যুৎত্তরে দেহজগতেব প্রতিধ্বনি বিদূষকের—

ভো সর্ব্বদা অহং বুভুক্‌খাএ মারিদবেবা।

শকুন্তলা নাটক এই দুই জগতের মধ্যে মানব ভাষায় উত্তর প্রত্যুত্তর বই আর কিছুই নয়।

নাটকের প্রত্যেক ভাবাবেশ-প্রধান চরিত্রের সহিত একটি করিয়া দেহ-প্রধান বিদূষকের ভাবা সংযুক্ত থাকে। সে কতক পরিমাণে মাটির জীবকে মাটিতে ধরিয়া রাখিতে সাহায্য করে। কালিদাস অগ্নিমিত্র, পুরূববা, দুষ্মন্ত সকলের সঙ্গেই৷ এমন একটি করিয়া ভারা বাঁধিয়া দিয়াছেন।

বিদূষক বিশেষ ভাবে দোষ দর্শন করাইয়া দেয়, রাজাকেও সে বাদ দেয় না। এই দোষপ্রদর্শনেব দুটি উপায়। একটি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ কঠোরভাবে, আর একটি পরোক্ষরূপে স্মিতহাস্যের দ্বারা। প্রথমটির উদাহরণ শকুন্তলাকে দুর্বাসার অভিশাপে; দ্বিতীয়টি বিদূষকের পন্থা। সূর্যের আলো সরলপথে যখন আসে, বড় তীব্র; সেই আলো আবার চাঁদের পথে ঘুরিয়ে আসিলে স্নিগ্ধ; তেমনি স্নিগ্ধ বিদূষকের বিদূষণা, কারণ তা ভাঁড়ামির বক্রপন্থা অবলম্বন করে। রাজা দুর্বাসার

মুখে কঠোর সত্যকে স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু বিদূষকের মুখে কখনই তা সহ্য করিবেন না।

কালিদাস রাজসভার কবি ছিলেন। কিন্তু রাজসভার প্রতি তাঁহার মনে সুতীব্র গোপন একটি ধিক্কারের ভাব ছিল। যেখানে সম্ভব হইয়াছে তিনি রাজসভাকে গঞ্জনা দিতে ত্রুটি করেন নাই! এই গঞ্জনা তিনি দুর্বাসার মতো অতিপ্রত্যক্ষ দুর্ভাষার দ্বারা দেন নাই, বিদূষকের মতো কৌশলে দিয়াছেন, অবশ্য সুযোগ পাইলে, যেমন কণ্বশিষ্যদের মুখে দুষ্মন্তের সভার বর্ণনায়, কঠিন শ্লেষ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাঁহার বিদূষণার পন্থা স্বতন্ত্র। তিনি কোন-না-কোন সুযোগে রাজসভার পার্শ্বে তপোবনের দৃশ্য অঙ্কিত করিয়া উভয়ের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। এই দ্বন্দ্বে রাজসভার অকিঞ্চিৎকরত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কালিদাস-লোকটির ইষ্টদেবতা ছিলেন মহাদেব; তাঁহার কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দেবতাত্মা নাগাধিরাজ ও তাহার সানুদেশের তপোবন। শেক্সপীয়রও রাজসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, দুই এক স্থলে তিনি এলিজাবেথ বা প্রথম জেমসকে প্রশংসা করিলেও অধিকাংশ স্থলেই তিনি রাজসভাকে ধিক্কৃত করিয়াছেন, এবং অবসর পাইলেই রাজা ও পারিষদদিগকে বনে লইয়া যাইতে ত্রুটি করেন নাই।

তাহা হইলে দেখা গেল স্বয়ং কবি নিজে রাজসভার দোষবর্ণনার সময় বিদূষকের বক্রপন্থা অবলম্বন করিযাছেন। দুইজনের মধ্যে এদিকে ঐক্য আছে। বস্তুত আমার তো মনে হয়, কালিদাস-লোকটির সহিত তৎসৃষ্ট কোন চরিত্রের যদি সাদৃশ্য থাকে, তবে তাহা দুষ্মন্ত-বয়স্য মাধব্যের। মালবিকা ও বিক্রমের বিদূষকদ্বয় অপরিণত, বিদূষকের গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাহাদের মধ্যে পূর্ণভাবে ফুটিয়া ওঠে নাই। মাধব্য কালিদাসের পরিণত বিদূষকচরিত্র।

আমরা অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিব কালিদাসের কাব্য-নাটকের এটি মূল ভাব-উপজীব্য ছিল; পূর্ণ রাজচরিত্র ও পূর্ণ মানবচরিত্র অঙ্কন—কিংবা পূর্ণ নরপতি ও পূর্ণ নরচরিত্র। মালবিকা হইতে রঘু পর্যন্ত এই

দুইটি ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত, কেবল একবারের জন্য শকুন্তলায় আসিয়া দুটি ধারা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। দুষ্মন্ত পূর্ণ—নর ও নরপতির প্রতীক। কিন্তু ইহা তো গেল আদর্শের জগৎ। মাধব্য বাস্তব জগতের পূর্ণচরিত্র। বাস্তবজীবনের সব অভিজ্ঞতাকে সে আয়ত্ত করিয়াছে; প্রকৃতির উপরে তাহার এমন বিশ্বাস যে শরীরকে বিকৃত করিয়া নিজেকে হাস্যকর করিয়া তুলিতে সে ভয় পায় না। মাধব্য আগাগোড়া বিদূষণা করিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে সার্কাসের সেই ভাঁড়টার মতো সে তারের উপরে চলিতে, ঘোড়ায় চড়িতে, সাইকেলে চাপিতে দ্বিধা করিত না। মাধব্য প্রয়োজন হইলে মন্ত্রী, সেনাপতি, অমাত্য এমন কি স্বয়ং রাজার অভিনয়ও নিখুঁতভাবে করিতে পারিত। জীবন-রঙ্গমঞ্চের সে গ্যারিক।

কালিদাস মাধব্যের এই সর্বাঙ্গীনতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন। রাজার চোখ এড়ানো সম্ভব, কিন্তু বিদূষককে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। আমার তো মনে হয় শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানদৃশ্যে মাধব্য উপস্থিত থাকিলে শকুন্তলাকে পরিত্যাগের অপমান সহ্য করিতে হইত না। দুর্বাসার অভিশাপও অমোঘ হইত না। কালিদাসের মনেও এ সংশয় ছিল, সেইজন্য তিনি শকুন্তলার প্রবেশেব পূর্বে বিদূষককে একটা ছুতা খুঁজিয়া হংসপদিকার উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন। শুধু তাই নয়, তপোবনে শকুন্তলাকে কখনো বিদূষকের সম্মুখে উপস্থিত করেন নাই, এবং তাহাকে অকালে বিদায় করিয়া দিয়া রাজাকে দিয়া পরিহাসবিজল্পিত বলাইয়া লইয়া সমস্ত ঘটনার উপরে পরিহাসেব চুণকাম করিয়া দিয়াছেন। এত আয়োজন ওই মাধব্যের ভয়ে। সে জীবনকে এমন পূর্ণভাবে জানিয়াছে, জীবনের সব রহস্য তাহার এমন অধিগত, সে এমন দক্ষ জীবন-শিল্পী, যে একবার শকুন্তলাকে দেখিলে কখনই তাহাকে ভুলিত না। এই ঘটনাতে মাধব্যের প্রতি কবির অগাধ শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়, বোধহয় সে শ্রদ্ধা দুর্বাসার প্রতি সম্ভ্রমের চেয়ে অনেক বেশি। পাছে দুর্বাসার অভিশাপ ক্ষুণ্ণ হয় সেই জন্য মাধব্যকে প্রত্যাখ্যানদৃশ্যে তিনি আনিতে সাহস করেন নাই।

মাধব্য কালিদাসের অঙ্কিত বাস্তব-চরিত্র। জীবনের প্রতি তাহার মনোভাব বিদূষকের অর্থাৎ সহনশীল সহাস্যকৌতুকের। জীবনকে সে পূর্ণভাবে দেখিয়াছে, জীবন-দর্শনের সে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। আবার জীবনের প্রতি অনাসক্ত-কৌতুকহাস্যের ভাবে প্রকাশ পায় জীবন-শিল্পের সে চরম শিল্পী। একাধারে সে শিল্পী-দার্শনিক। কালিদাসের ব্যক্তিত্বের বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না, কিন্তু এই কবি-মানুষটির আভাস পাওয়া যায় মাধব্যের মধ্যে।

মাধব্যের দুইটি বৈশিষ্ট্য, জীবনকে পূর্ণভাবে দর্শন ও তৎপ্রতি অনাসক্ত কৌতুকের ভাব স্বয়ং কবির ছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অন্ততঃ তাঁহার কাব্য-নাটককে এভাবে পড়া চলে।

দুষ্যন্ত-মাধব্যের মত কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের মধ্যে বয়স্য-সম্বন্ধ ছিল; রাজ-অমাত্যগণ কবিকে কৃপামিশ্রিত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন এবং কবি অবসর পাইলে পারিষদগণকে বিদ্রূপ করিতে ছাড়িতেন না। শকুন্তলার চোর-ধরার দৃশ্যে রাজসভা-সংশ্লিষ্ট কোটালের প্রতি যে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের শরক্ষেপ নাই, তাহা কেহ শপথ করিয়া বলিতে পারেন না। এই দৃশ্যটার প্রথম অভিনয়ে অমাত্যদের মধ্যে কি রকম চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছিল তাহা কল্পভোগ্য বটে। কালিদাস-মাধব্যের জীবনতত্ত্ব কি জাতীয় ছিল তাহা নাটকত্রয় হইতে সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়

ভারতচন্দ্র

বলাবাহুল্য পুরাতন অবৈষ্ণব বাঙালী কবিদিগের মধ্যে ভারতচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য কিন্তু বলা আবশ্যক, কেননা এপর্যন্ত আমরা কেহই কবিকে সেই উচ্চ সম্মান সম্পূর্ণরূপে দিতে চেষ্টা করি নাই।

সাধারণ ও অসাধারণ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য, সামান্য একটুখানি দৃষ্টিভেদে ঘটে। এই সামান্যতা-সাধনেই তাঁহাদের অসামান্যতা। ইংরেজী সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্য প্রধানত রোমান্টিক। ইংরেজী কাব্যের মূল সুর বহুপ্রচলিত এই ছত্রটিতে বিরাট ব্যাকুলতায় ধ্বনিত, 'Over the hills and far away'; বাংলা সাহিত্যের মূলকথা "সেই দেশেরি তরে আমার মন যে কেমন করে" কিংবা, "কান্ত পাহুন, বিরহ কাম দারুণ, ফাটি যাওত ছাতিয়া", কিংবা "সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম, কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।" এই সুদূরের ভাব, আকুলতার ভাব, বাংলা কাব্যের মূল সুর, ইহাই বাঙালী কবিদের মৌলিক প্রেরণা।

এই রহস্যটা বৈষ্ণব কবিরা ধরিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা ভারতচন্দ্র ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গলকাব্য রচয়িতা ধরিতে পারেন নাই। (মঙ্গলকাব্যকে আমরা আধুনিক সাহিত্যের ভাষায় কথাকাব্য বলিতে পারি)। ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে এই স্থূলকথা।

পুরাতন কথাকাব্য প্রণেতাদের মধ্যে মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী, অধিকাংশ পণ্ডিতই মুকুন্দরামকে ভারতচন্দ্র অপেক্ষা বড় মনে করেন। কিন্তু রসবিচারে এই অদ্ভুত মানসিকতার কোন কারণ

নাই। যাঁহারা মুকুন্দরামের জন্য এই আসন দাবি করেন তাঁহারা সকলেই পণ্ডিত, তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ওইখানেই বোধ হয় গোল। তাঁহারা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া সাহিত্য ও ইতিহাসের মধ্যে গোল করিয়া ফেলিয়াছেন। মুকুন্দরাম ষোড়শ শতকের কবি। সে সময়ের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অনেক কথাই আমরা মুকুন্দরামের কৃপায় জানিতে পারি। তিনি বাংলার অজ্ঞাত এক যুগের ইতিহাসের অমূল্য উপাদান আমাদের দিয়াছেন, আমরা তাহার মূল্যস্বরূপ শ্রেষ্ঠকবিত্বের সম্মান তাঁহাকে দিয়া বসিয়াছি। "সত্য রত্ন দিলে তুমি পরিবর্তে তার" আমরা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবি-খ্যাতি দান করিয়াছি। কবিকঙ্কণের অনেকগুলি রত্নই ঐতিহাসিকদের কৃতজ্ঞতার দান।

অপরপক্ষে, ভাবতচন্দ্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের লোক। তাঁহার সময়ের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক তথ্য অজ্ঞাত নয়, তাহা জানিবার অন্য উপায় আছে। কাজেই ঐতিহাসিকদের নিকটে কবি পূর্ণ মনোযোগ পান নাই, ফলে যাহা তাঁহার প্রাপ্য তাহাতেও তিনি বঞ্চিত।

একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে মুকুন্দরামের কাব্যে আমরা ঐতিহাসিক তথ্য যে পরিমাণে পাই, অন্য কোন পুরাতন কাব্যে তাহা পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহাতেই মুকুন্দরামের কাব্য প্রতিভার অভাব সূচনা করে। কাব্যের মধ্যে কি পরিমাণে তথ্য মিশানো যায় এবং মিশাইলেও তাহা কাব্য-সত্যের পথে অন্তরায় হইয়া ওঠে না তাহার একটা অলিখিত নিয়ম আছে। মুকুন্দরামের সেই নিয়মটি অজ্ঞাত ছিল। দুধে জল দেয় না, এমন গোয়ালা বোধকরি গোকুলেও ছিল না। গোপবালক কৃষ্ণের সহিত রাধিকার রাগারাগি সূত্রপাত যে ইহা লইয়া নয়, তাহা বোধকরি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকারও শপথ করিয়া বলিতে পারেন না; পূর্বরাগের পূর্ব রাগটা ইহাই লইয়া। ভারতচন্দ্র এই নিয়মটি জানিতেন। তিনি কাব্যে তথ্যকে প্রশ্রয় দেন নাই। কিন্তু ঐতিহাসিকদের কাছে দুধের অপেক্ষা জলের দান বেশি; তাই

ভারতচন্দ্র "মন্দ নয়, বেশ, মাঝে মাঝে চমৎকার—বিশেষ করিয়া অমুক স্থানটায় ইত্যাদি", আর মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠকবি।

এখন প্রশ্নটা এই, মুকুন্দরাম কাব্যে তথ্যকে এমন একান্তভাবে প্রশ্রয় দিলেন কেন। আমার বিশ্বাস তিনি বাংলা কাব্যের প্রাণধর্মের স্বরূপটি ধরিতে পারেন নাই। সেই জন্যে তিনি বাংলা দেশের মহাভারত, মহাকাব্য রচনার সুযোগ ও উপাদান পাইয়াও তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। আধুনিক সাহিত্যের ভাষায় মুকুন্দরাম ছিলেন বস্তুনিষ্ঠ (Realistic) কবি। কিন্তু বাংলা সাহিত্য মূলত রোমান্টিক। কবির সাহিত্যধর্ম ও দেশের সাহিত্যধর্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁহার দশা হইয়াছিল দুই নৌকায় পা দিবার মত; এই দুর্দশার জন্য তিনি এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। আদিতে যে উপাদান লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন অন্তেও তাহা উপাদানরূপেই রহিয়া গিয়াছিল। ঐতিহাসিকদের ভোজ এই অসার্থক উপাদানের প্রাচুর্যে।

উপাদানের সৌভাগ্য মুকুন্দরামের মত অল্প কবির ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। কালকেতু ব্যাধ ও ধনপতি সদাগর। আজকালকার ভাষায় প্রলিটারিয়েট ও এরিস্টক্রেট, বাংলাসমাজের নিম্নতম হইতে উচ্চতম সুরসপ্তক তাঁহার আয়ত্ত ছিল। কিন্তু কবি কেবল গলা-ই সাধিলেন, সুর বাহির করিতে পারিলেন না। কিন্তু আমরা কি মুকুন্দরামের কাব্যে তৎকালীন চিত্র পাই না? চিত্রই পাই, কাব্য নয়। তৎকালীন চিত্র পাই, চিরকালীন কাব্য নয়। এই তৎকালীনতার জন্য মুকুন্দরাম অমর হইয়া আছেন। তাঁহার অমরতা তাঁহার ব্যর্থতার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

ভারতচন্দ্রের এমন উপাদানের সৌভাগ্য ছিল না। একটি রাজ-বংশের কাহিনী তাঁহার উপজীব্য। কিন্তু কবিপ্রতিভা কাব্যধর্মসম্বন্ধে সচেতন বলিয়া এই উপাদানের সামান্যতায় তিনি অপূর্ব কাব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। অন্নদামঙ্গলকে রোমান্টিক কাব্যহিসাবে পাঠ করিলেই যথার্থভাবে পাঠ করা হইবে। ইহা তিন খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথমখণ্ডকে দেবখণ্ড বলিতে পারি। ইহাতে ভারতচন্দ্রের রোমান্টিক

কবিপ্রতিভা পূর্ণতালাভ করিতে পারে নাই। দেবদেবীর ইতিহাস ও কাহিনী পৌরাণিকতার স্তরে এমন সুদৃঢ়ভাবে ন্যস্ত যে কবি সে ধারাকে লঙ্ঘন করিয়া নিজস্ব প্রতিভার বিকাশ দেখাইতে পারেন নাই। এই দেবখণ্ড পাঠ করিলে স্বভাবতই মনে হয় ইহাতে কবির যথেষ্ট মনোযোগ নাই। কেবলমাত্র কাব্যের ঠাট বজায় রাখিবার জন্যই তিনি সে অংশটা লিখিয়াছেন। সেইজন্য ইহা আংশিক সফলতা মাত্র লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর রোমান্টিক কাব্য বাংলা ভাষায় আর নাই। অশ্লীলতাই নাকি ইহার প্রধান অন্তরায়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব বৈষ্ণব কবিদের রাধাকৃষ্ণ সঙ্গীত ও বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী একই মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে স্থাপিত। দুইয়েরই ভাব-উপজীব্য অসামাজিক গুপ্ত প্রেম। কেবল প্রভেদ এই রাধাকৃষ্ণের প্রেম রূপক, আর বিদ্যাসুন্দরের প্রেম রূপবান। রাধাকৃষ্ণের প্রেম রূপকে অতিক্রম করিয়া অরূপে পৌছিয়াছে ; বিদ্যাসুন্দরের প্রেম রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। রাধা তো আরাধিকা ; তাহার প্রেমে বিশেষ নির্বিশেষ হইয়াছে, আর বিদ্যার প্রেম হৃদয়ের সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি ও বাসনাকে একজনের মধ্যে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। সুন্দর কবি, আর্টিস্ট ; তাহার প্রেম রূপে আসিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু মূলত দুই প্রেমই সমাজশৃঙ্খলাকে লঙ্ঘন করিয়াছে। এই হিসাবে ভারতচন্দ্র বৈষ্ণবকবিদের ভাবজীবনের বংশধর। কৃষ্ণ বাঁশীর সুরে রাধার হৃদয়ে রন্ধ্র নির্মাণ করিয়াছে, সুন্দর করিয়াছে সিঁধকাঠিতে ; দুই প্রেমেরেই আনাগোনা রন্ধ্রপথের রহস্যের অন্ধকারে। এই রহস্যই দুই প্রেমের প্রাণ। অবার রহস্যই রোমান্টিক ধর্মের প্রধান লক্ষণ। সুন্দর কবি, চোরও বটে ; সে চিরদিনের জন্য প্রমাণ করিয়া দিয়াছে, চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, অন্তর চুরি-করা বিদ্যা যে সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই।

আসলে বিদ্যাসুন্দর কাব্য একখানি রোমান্টিক satire। এ শ্লেষ দ্ব্যর্থ ; একদিকে সমাজশৃঙ্খলা অপর দিকে রাজসভা ; কবি এক ঢিলে

ঐ দুইটি সুপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতি তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। এক রাজসভায় বসিয়া সকল রাজসভার প্রতি ব্যঙ্গবাণ প্রক্ষেপ আক্ষেপের বিষয় হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু একহিসাবে এ দ্ব্যর্থশ্লেষ ব্যর্থ হইয়াছে, সমাজ ও রাজা, কৃষ্ণচন্দ্র নৃপতি ও সমাজপতি দুই-ই ছিলেন, গুপ্তপ্রেমের কাহিনী লইয়া এতই নিবিষ্ট ছিলেন যে, গুপ্তশ্লেষ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্রের ভরসা ছিল রাজাদের স্বাভাবিক নির্বুদ্ধিতার উপরে।

তৃতীয় খণ্ডে মানসিংহের কাহিনী, ইহাতে কবি অনেক পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। দেবখণ্ড সময়াতীত; বিদ্যাসুন্দর অসাময়িক, আর মানসিংহ প্রায় সমসাময়িক। ইহাতে কল্পনা ও বাস্তব টানাপোড়েনের মত বুনিয়া গিয়া অপরূপ শিল্পসম্পদ গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহাকে রোমান্স ও রিয়ালিজমের বিবাহ বলা যাইতে পারে। মুকুন্দরাম যে Realism গড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্র প্রধানত রোমান্টিক কবি হইয়াও সে চেষ্টাকে সফল করিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের পূর্বে কেহ বৈষ্ণব পদ লেখে নাই, এমন কথা কেহ বলিতে পারিবে না। তাঁর বিশেষত্ব তিনি প্রথমবারের জন্য বৈষ্ণব পদের একটা স্থায়ী ঠাট গড়িয়া দিলেন। পরবর্তী বৈষ্ণবপদ প্রধানত সেই ঠাটকে অনুসরণ করিয়াছে। পদসাহিত্যে সেইজন্য চণ্ডীদাস আদিকবি। ভারতচন্দ্রের পূর্বে বহুসংখ্যক কবি মঙ্গলকাব্য রচনা কবিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সকলেই মুকুন্দরামের মত ভুল করিয়াছেন। বাংলার সাহিত্যধর্মকে না বুঝিতে পারিয়া কবি যশ-প্রার্থীরা বস্তুনিষ্ঠ কাব্য রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্যধর্ম-বিরোধী কাব্য পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। ভারতচন্দ্রই প্রথম মঙ্গলকাব্য প্রণেতা যিনি সাহিত্যধর্মের সহিত নিজস্ব কবিপ্রতিভার সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি মঙ্গলকাব্যের আদি কবি। ইতিহাসের তারিখ হিসাবে দেখিলে তাঁহাকে প্রায় শেষ মঙ্গল-কাব্য রচয়িতা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে বিচার অবিচার হইবে। ভারতচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধের পরে মারা গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক

বৎসরের মধ্যে বাংলার প্রবহবান ইতিহাসে একটা বিরাট মন্বন্তর ঘটিয়া গেল। সে পরিবর্তন এতই বিপুল ও সুদূরপ্রসারী যে আগেকার কাব্যধারাকে তাহা লুপ্ত করিরা দিল। এ পরিবর্তন না ঘটিলে ভারতচন্দ্র প্রবর্তিত কাব্যধারা কি ভাবে প্রবাহিত হইত, তাহাই ভাবিবার কথা। চণ্ডীদাস বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যকে অমরতার পথে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিলেন, তখন হইতে সে পথে চলা তেমন কষ্টকর ছিল না; সকলেই যে অমরতার স্বর্গে উপনীত হইয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু একথা আমরা বুঝিতে পারি তাঁহারা সকলেই অমরতার পথিক। ভারতচন্দ্রও তেমনি মঙ্গলকাব্যকে প্রথববারের জন্য অমরতার পথে স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, তিনি নিজে অমর হইয়াছেন; অন্যকে অমরত্বের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। সে পথে চলিয়া কেহ অমর হয় নাই, ইহা সত্য নহে, সে পথে আর চলাই হয় নাই। কাজেই ভারতচন্দ্রও মঙ্গলকাব্যের আদি কবিও বটে, শেষ কবিও বটে।

বৃটিশশাসনে বাংলার সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন না ঘটিলে পরবর্তী মঙ্গলকাব্য মুকুন্দরামের প্রবর্তিত বস্তুনিষ্ঠপথ ছাড়িয়া ভারতচন্দ্রের পথ ধরিয়া চলিত। কিন্তু যে-পথ প্রবর্তিত হইল, অথচ প্রচলিত হইল না, সে-পথ অমরত্বের দিকে নিষ্ফল তর্জনী সঙ্কেতের মত পড়িয়া আছে, আর সেই পথের একান্তে বাংলার সুদীর্ঘ করুণ ইতিহাসের যে-অধ্বশিলাখণ্ডে কালির অক্ষরে খোদাই করা আছে ১৭৫৭, তাহারই নিকটে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার স্বাভাবিক বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি সহসা দেশব্যাপী বিষাদের আভাসে অর্ধবিকশিত অবস্থায় থামিয়া গিয়াছে।

২

মুকুন্দরামের প্রধান দোষ গ্রাম্যতা, কি ভাবে, কি ভাষায়, কি চরিত্র-অঙ্কনে; অবশ্য কল্পনায় নয়, তার কারণ কল্পনাশক্তি তাঁহার স্বল্প। সাহিত্যে যে urbanity আমাদের আদর্শ, পুরাতন কবিদের মধ্যে একমাত্র ভারতচন্দ্রে তাহা পাই; মুকুন্দরাম sub-urbanityতেও

পৌঁছিতে পারেন নাই। একদল আছেন যাঁহারা বলেন মুকুন্দরামের বৈশিষ্ট্য, তিনি তৎকালীন লৌকিক ভাষায় কাব্য লিখিয়াছেন। অবশ্য ইহা মুকুন্দরামের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সাহিত্যের নহে। সাহিত্যের ভাষার আদর্শ লৌকিক নহে, অলৌকিক। অর্থাৎ যে ভাষায় লোকে কথা বলে তাহা নয়, যে ভাষায় লোকের কথা বলা উচিত তাহাই। যেমন কাব্যের ঘটনা কাব্য নহে, তাহার উপাদান মাত্র; ঘটনা ভাবনায় রূপান্তরিত হইলেই কাব্যসৃষ্টি হয়, তেমনি মুখের ভাষা কাব্যের ভাষার উপাদানমাত্র, তাহা "আদর্শায়িত" হইয়া উঠিয়াই কাব্যের ভাষায় পরিণত হয়। মুকুন্দরামের ভাষায় এই আদর্শীকরণ নাই।

মুকুন্দরামের চরিত্র-সৃষ্টি সম্বন্ধেও একই কথা। তাঁহার সকল সৃষ্টির মধ্যে একটি চরিত্র ব্যতীত সবই অপসৃষ্টি। তাহা মূলে যে চরিত্র-সৃষ্টির উপাদান মাত্র ছিল, ফলেও সেই উপাদান রহিয়া গিযাছে। এই সব সৃষ্ট-চরিত্র একান্তভাবে 'লৌকিক ও গ্রাম্য হইয়া রহিয়াছে। পাঠককে কল্পনায় তৎকালীন গ্রাম্য সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়, তবেই সেই সব চরিত্র-চিত্রেব খানিকটা মর্ম-উদ্‌ঘাটন সম্ভব।

একমাত্র ভাঁড়ু দত্তেব চরিত্র সম্বন্ধে একথা খাটে না। এই সব চেয়ে গ্রাম্য ব্যক্তিটি সাহিত্যিক গ্রাম্যতা-দোষের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরাম দুই জনেরই বৈশিষ্ট্য দুইটি অপ্রধান চরিত্র-কল্পনায়, হীরামালিনী ও ভাঁড়ু দত্তেব। একটি পূর্ণসৃষ্টি ও একটি অপূর্ণসৃষ্টিতে কি প্রভেদ বোঝা যায় এই দুটি চরিত্রেব সমালোচনায়। এমন অসম্ভব নয় যে ভারতচন্দ্র হীরার চরিত্রের উপাদান পূর্ববর্তী কোনো গ্রন্থ হইতে পাইয়াছেন, কিন্তু আমরা যাহা পাই তাহা অসম্পূর্ণ উপাদান নয়, সম্পূর্ণ সৃষ্টি। ভাঁড়ু দত্ত ও হীরামালিনী দুজনেই সাহিত্যিক urbanityতে পৌঁছিয়াছে, তাহাদের বুঝিবার জন্য পাঠককে কল্পনায় তৎকালীন সমাজে প্রবেশ করিতে হয় না।

হীরার চরিত্র কেবলমাত্র একটি অস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত নহে, ছোট-খাটো ঘটনায়, কথাবার্তায়, রসালাপে, তীক্ষ্ণশ্লেষ ও ব্যঙ্গে তাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং জীবন্ত। ভাঁড়ু দত্ত একটিমাত্র রেখার সৃষ্টি। যে কল্পনাশক্তি

ভাষাকে আদর্শায়িত করে, যে-শক্তি থাকিলে নানারূপ তথ্যের দ্বারা পাঠকের মনে রসবোধ জাগ্রত করে, তাহার অভাববশত এই রেখার সৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার চরিত্রের এই অবকাশপথে পাঠকের মনোযোগের ও রসবোধের অনেকটা অংশ পড়িয়া গিয়া নষ্ট হয়। মুকুন্দরাম বস্তুনিষ্ঠ কবি, তাহার পক্ষে তথ্যের সমাবেশ একান্ত আবশ্যক। সে তথ্যের সমাবেশ যেখানে অনাবশ্যক সেখানে তিনি করিয়াছেন, কিন্তু যেখানে তাহা অবশ্যম্ভাবী সেখানে কবির খেয়াল নাই। ইহার একটি কারণ আছে মনে হয়, কবি বুঝিতে পারেন নাই যে ঐ ভাঁড়টাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি , তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, কালকেতু ফুল্লরা ধনপতি প্রভৃতি বড় বড় বীর ও প্রধান চরিত্রকে বাদ দিয়া ভবিষ্যতের পাঠক ঐ গ্রাম্য মোড়লটার প্রতি এত একাত্মতা অনুভব করিবে। আমার তো মনে হয়, না বুঝিতে পারিয়া ভালই হইয়াছে। অনিপুণ কবির দৃষ্টি এদিকে পড়িলে তাহাকে দ্বিতীয় একটা কালকেতু করিয়া তুলিত। .পিতৃ-পরিত্যক্ত কার্ডেলিয়া যেমন লিয়ারের বিপদে সহায় হইয়াছিল, কবির এই ত্যাজ্যপুত্রও তেমনি মুকুন্দরামকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। যে-সমাজে কবি সৃষ্টি করিতেছিলেন তাহা ছিল গ্রাম্য ; সে-সমাজ আনন্দ পাইত কালকেতুর মত বিকট একটা বিদূষক-বীরের কল্পনায় ; তাহা আসরের প্রান্তবর্তী ভাঁড়ুকে লক্ষ্য না করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছে। ভাঁড়ুর প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িলে শনিদৃষ্টি-ভস্ম গণেশমস্তকের ন্যায় ভাঁড়ুর দুর্দশার একশেষ হইত। কাব্য যে কবির একার সৃষ্টি নয়, সমাজ যে তাহাতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে কালকেতুর বিকৃতি ও ভাঁড়ুর নিষ্কৃতিতে তাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

হীরামালিনী ভারতচন্দ্রের সচেতন কল্পনার সৃষ্টি। মুকুন্দরামের মত ভারতচন্দ্রও পাঠক-নিরপেক্ষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাজসভার কবি। রাজসভার আদর্শ, রুচি ও ফরমাইস খানিকটা পরিমাণে তাঁহার লেখনীকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজকুমারী বিদ্যার প্রতি স্বভাবতই রাজার লক্ষ্য ছিল, কাজেই বিদ্যাকে বাক্য ও বাহ্য

অলঙ্কারে সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিতে কবি বাধ্য হইয়াছেন। রাজকুমার সুন্দরের প্রতিও রাজার দৃষ্টি থাকা স্বাভাবিক, কাজেই তাহাকেও রাজাদর্শোচিত করিয়া গড়িতে হইয়াছে। কাব্যের নায়ক ও নায়িকা সৌন্দর্য ও বিদ্যা; রাজসভার আদর্শ ইহার অপেক্ষা আর কি বেশী হইতে পারে! যে সুন্দর ও বিদ্যার সাক্ষাৎ আমরা ভারতচন্দ্রে পাই, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাতে সেই জাতীয় সৌন্দর্য ও বিদ্যার চর্চাই হইত, গভীরতার অপেক্ষা নিপুণতা যাহাতে অধিক, আন্তরিকতার অপেক্ষা বাহ্যিকতা যাহাতে অধিক। এই সব দেখিয়া এক একবার মনে হয় কবি গল্পের উপলক্ষ্যে রাজসভার রূপক লিখিয়া গিয়াছেন। এই রূপক একাধারে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার রূপকথা এবং স্বরূপ কথা।

কিন্তু কবি একস্থানে স্বাধীন ছিলেন, অপ্রধান চরিত্রের মহলে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হীরামালিনী। এখানে কবিব প্রতিভা অপ্রতিহত ভাবে লীলা করিবার সুযোগ পাইয়াছে, এবং তাহার ফল প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত নারী-চরিত্র। হীরা ভাঁড়ু দত্ত দুজনেই জীবিত, বাংলা দেশের পথে ঘাটে আজো তাহাদের দেখা পাওয়া যায়। অনেক সময় ভাবিয়াছি, যদি পথের মোড়ে হীরার সহিত ভাঁড়ুর দেখা হয়, তবে কেমন হয়। যাহাই হোক, হীরার তীক্ষ্ণ মার্জিত ব্যঙ্গবাণে দুর্ধর্ষ ভাঁড়ুকে যে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁহার ভাষায়। এমন মার্জিত, তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গোজ্জ্বল ভাষা, প্রাচীন সাহিত্যে তো দূরের কথা বর্তমান সাহিত্যেও বিরল। আজ যে ভাষায় বাংলাকাব্য লিখিত হয়, তাহার পূর্বধ্বনি পাই ভারতচন্দ্রে। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরে একশত বৎসরের অব্যবহারে তাঁহার ভাষা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ঈশ্বরগুপ্তের ভাষাতেও ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা আছে, কিন্তু রায় গুণাকরের তুলনায় নিতান্ত গ্রাম্য। তীক্ষ্ণ বাণে ও সম্মার্জনীতে যে প্রভেদ, সেই প্রভেদ ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরগুপ্তের ভাষায়। ভারতচন্দ্রের ভাষার urbanity ঈশ্বরগুপ্তে নাই। এই urbanity আধুনিক যুগে প্রথমবারের জন্যে পাই মধুসূদনের রচনায়।

ভাষার এই গুণের তিনটি কারণ। প্রথমত, ভারতচন্দ্রের সময়ে ভাষার স্বাভাবিক পরিণাম অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতচন্দ্র যে ভাষায় কাব্য লিখিয়াছিলেন তাহা বাংলার গ্রাম্য অঞ্চলের ভাষা নহে। এখনকার দিনে যেমন কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থান, তখনকার কালে তেমনি বিদ্যা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদ,নবদ্বীপ ও তাহাদের পারিপার্শ্বিক। সৌভাগ্যক্রমে বাংলার urban অঞ্চলে তৎকালীন শ্রেষ্ঠকবি কাব্যরচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই জন্যে যে এমনটি হইবার কথা নহে। ভারতচন্দ্র বর্ধমানেব লোক, ঘটনাচক্রে তাঁহাকে নবদ্বীপে টানিয়া না আনিলে তিনি উন্নততর ঘনরাম চক্রবর্তী হইয়া থাকিতেন, অন্নদামঙ্গলের সৃষ্টি হইত না। তৃতীয় ও সর্বপ্রধান কাবণ কবির স্বকীয় প্রতিভা। যে-প্রতিভার তাপে ভাব, ভাষা একীভূত হইয়া গিয়া দিব্য বাণীমূর্তির সৃষ্টি করে, ভারতচন্দ্রে তাহা অপর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। সেই শক্তির মাহাত্ম্যে তিনি তৎকালীন কাব্য-পিপাসা মিটাইয়াও এমন ভাষা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন যাহা পরবর্তী কালেও মানুষের সৌন্দর্যবোধকে নন্দিত করে।

তাঁহার ভাষার প্রধান গুণ—তাহা মডার্ণ। প্রাচীন বাংলার অন্য কোন কবি সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। বৈষ্ণব পদাবলী মুখে মুখে রূপান্তরিত হইয়াছে, বামায়ণ মহাভাবত সম্বন্ধেও একই কথা, কাজেই তাহাদের সম্বন্ধে এ প্রশ্ন চলে না; কিন্তু অন্য কবির ভাষাকে আমরা মডার্ণ বলিতে পারি না।

এ ভাষা যে মডার্ণ তাহার প্রধান প্রমাণ বাংলা সাহিত্যে ইহার পুনরাবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বরগুপ্ত একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কালের দোষে ও শক্তির অভাবে তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ, মার্জিত, স্বল্পাক্ষর গদ্যে ভারতচন্দ্রেরই পদ্যের ভাষার যেন দূর প্রতিধ্বনি। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে-যুগ প্রধানত তাহা সৃষ্টির যুগ। সৃষ্টির যুগের পরে সমালোচনার যুগ; Satire সমালোচনার সগোত্র, ভারতচন্দ্র প্রধানত রোমান্টিক Satirist। কাজেই বাংলা সাহিত্যে সে-যুগটা আসন্ন, সে-যুগের প্রধান লক্ষণ হইবে

সমালোচনা, satire, এবং বাংলাদেশের প্রাণধর্ম অনুসারে রোমান্টিক satire। ভারতচন্দ্রের ভাষার পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। একজন বড় কবি যে ভাষার সৃষ্টি করেন, কিছুদিন ধরিয়া তাহার অনুবৃত্তি চলে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের ভাষারই অনুবৃত্তি ঘটিয়াছে। ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিপ্লবের ফলে ভারতচন্দ্রের ভাষার যথেষ্ট অনুবৃত্তি হয় নাই। তারপরে ভারতচন্দ্র সামাজিক যে অনিশ্চয়তা ও নাস্তিকতার মধ্যে বাঁচিয়া ছিলেন আমাদের সময়টাও নানা কারণে অনেকটা সেই রকমের। এই অনিশ্চয়তার, অবিশ্বাসের, নাস্তিকতার সাহিত্যিক পরিণাম satire, এবং বাংলা সাহিত্যে ইহার একমাত্র আদর্শ ভাবতচন্দ্র। কাজেই প্রায় পৌনে দুইশত বৎসর পবে এই যুগটাতে ভারতচন্দ্রের পুনরাবির্ভাব আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে!

বাংলা কাব্যে সংস্কৃত শব্দ

"কবিকঙ্কণ বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন ও নূতন যুগের সন্ধিস্থলের কবি। পুরাতন পল্লীসাহিত্যের মাধুর্য্য তাঁহার রচনায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে। একদিকে বঙ্গসাহিত্যে নূতন আমদানী সংস্কৃত শব্দও তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে, অন্য দিকে 'ভাঙ্গা কুড়িয়া তালপাতের ছাউনি', 'ভেরেণ্ডার খাম মোর আছে মধ্য ঘরে' প্রভৃতি পল্লীভাষার সহজ রূপ, অপর দিকে 'জানু, ভানু, কৃশানু, শীতের পরিত্রাস' এই উৎকট পাণ্ডিত্য। এক দিকে 'বাড়ে যেন হাতি কড়া', 'দুই বাহু লোহার সাবলের' ন্যায় পল্লী-উৎপ্রেক্ষা। অন্য দিকে 'বুলে মাতঙ্গ গজপতি, যেন নব রতি পতি' প্রভৃতি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের আবৃত্তি। ফুল্লরার বারমাসী, কালকেতুর শৈশব লীলা, মুরারী শীলের সহিত কথাবার্ত্তা, বণিক সভায় চন্দন ও মাল্যদান উপলক্ষ্যে বাগবিতণ্ডা, লহনা ও খুল্লনার কোন্দল প্রভৃতি নানা বিষয়ের বর্ণনায় পল্লীভাষায় পল্লীচিত্রগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল চিত্রে আমকাঁটালেব বনে-ঘেরা কুঁড়েগুলির ও বটঅশ্বত্থের আবছায়ায় বাঙলার নদীতীর যেন অফুরন্ত বঙ্গজীবনের ভাণ্ডার খুলিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রতিফলিত হইতেছে, অপরদিকে সুবর্ণ গোধিকারূপ-ধারিণী চণ্ডীদেবীর সহসা দশভূজারূপ ধারণ, ছাগরক্ষণে নিযুক্তা খুল্লনার সম্মুখে বনের উপান্তে সহসা বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব, সুশীলার বারমাসী, প্রভৃতি বিবিধ চিত্রে সংস্কৃত শব্দের সোনার রং ঝলমল করিতেছে। সুতরাং কবিকঙ্কণ প্রাচীন ও নূতন যুগের সন্ধিস্থলের কবি।"

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন কবিকঙ্কণের সমালোচনাপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে দুইটি কথার ব্যঞ্জনা বেশ স্পষ্টভাবে তিনি দিয়াছেন।

(১) বঙ্গ সাহিত্যের প্রাচীন যুগটি খাঁটি বাংলা শব্দের এবং নূতন যুগেব বৈশিষ্ট্য সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্যে।

(২) কবিকঙ্কণ এই সাহিত্যিক ধর্মযুগের মাহাত্ম্যে কতকটা যেন অসহায়ভাবে সংস্কৃত ও বাংলা শব্দে মিশাইয়া কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।

একটু আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে মত দুইটির কোনটিই প্রমাণসহ নহে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, প্রাচীন যুগটি সত্যই খাঁটি বাংলাশব্দমূলক ছিল, তবে তাহা কত প্রাচীন? যে সময় হইতে বঙ্গসাহিত্য লিখিত আকারে পাওয়া যায় আমরা আলোচনা সেই কাল হইতেই আরম্ভ করিতে রাজী আছি। কিন্তু তৎপূর্বে মনে রাখা উচিত ডাক ও খনার বচন প্রভৃতি মহামূল্য বচনসমষ্টিকে সাহিত্যের পঙ্‌ক্তিভোজে আমরা আহ্বান করিতে রাজী নহি। কারণ ঐ জাতীয় রচনা সাহিত্যে নহে, এবং দীনেশবাবুর পূর্বে বোধকরি কেহ উহাদের মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া লিপিবদ্ধ করে নাই। যেখানে আলোচনার বিষয় প্রধানত ভাষা, সেখানে লিখিত আকার ব্যতীত স্বরূপ আলোচনা চলে না। ময়নামতি গোপীচাঁদের গাথাগুলিও অতিশয় হালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কাজেই এগুলিকে আশ্রয় করিয়া বঙ্গসাহিত্যের কোনো বৌদ্ধযুগ যদি থাকে, তবে সে সম্বন্ধে নির্বিকার হওয়া ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তব নাই। শূন্যপুরাণ একখানা প্রাচীন গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহাও প্রাচীন ও নূতন লেখকদের কৃপায় এমন বিকৃত হইয়াছে যে তাহাকেও একই কারণে আমবা বাদ দিতে বাধ্য। যে সমস্ত পুঁথি অপেক্ষাকৃত অবিকৃত ও লিখিত আকারে পাওয়া গিয়াছে প্রধানত সেইগুলি লইয়াই আমরা আলোচনা করিব।

খাঁটি-বাংলা শব্দের যুগ কবিকঙ্কণের সময় হইতে কত পুরাতন? মুকুন্দরাম ষোড়শ শতকের শেষ ভাগের লোক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে কেহ

কেহ ১৪শ শতকের শেষ ভাগের, কেহ ১৫শ শতকের প্রথম ভাগের মনে করেন। ইহাতে সংস্কৃত শব্দ অবিরল; সংস্কৃত অলঙ্কার ও ভাব প্রচুর; ইহার কাঠামোটাই সাংস্কৃত। সত্যকথা বলিতে কি এখানা সংস্কৃত কাব্য গীতগোবিন্দের আদর্শে লিখিত। গীতগোবিন্দের মতই ইহা পাত্রপাত্রীর মধ্যে উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক একখানা গীতি-নাট্য। ইহাতে দীনেশবাবুর বর্ণিত খাঁটি বাংলা কাব্যের লক্ষণ কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য হইতেও স্বল্পতর। প্রাচীন যুগ যদি সত্যই খাঁটি বাংলা শব্দের হইত তবে চণ্ডীকাব্যের দেড়শত, দুইশত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী রচনায় খাঁটি বাংলা শব্দ অধিকতর থাকিত।

চণ্ডীকাব্যের প্রায় একশত বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণবিজয় লিখিত। ইহাতেও সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য চণ্ডীকাব্য হইতে অনেক বেশী। আবার ইহাও একখানা সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত। দীনেশ-বাবুর উক্তি সত্য হইলে চণ্ডীকাব্য হইতে ইহাতে খাঁটি বাংলা শব্দ অধিক হওয়া উচিত। কিন্তু বস্তুত তাহা নয়।

অতএব দেখা গেল, চণ্ডীকাব্য রচনার পূর্বে খাঁটি বাংলা শব্দের যুগ ছিল না। যদি থাকিত, তবে তৎপূর্ববর্ত্তী দুইশত বৎসরের লিখিত সাহিত্যে অবশ্যই তাহার প্রমাণ মিলিত।

এবার দীনেশবাবুর দ্বিতীয় মতটি আলোচনা করা যাক। সত্যই কি মুকুন্দরাম সাহিত্যিক যুগধর্মের প্রভাবে অসহায়ভাবে যেখানে সেখানে সংস্কৃত ও বাংলা শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন? যুগ বিভাগ যখন আমরা মানি নাই, কাজেই তাহার প্রভাবকেও স্বীকার করা চলে না। তবে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে মুকুন্দরামের কাব্যে সংস্কৃত ও খাঁটি বাংলা শব্দের মিশ্রণ আছে। কিন্তু তাহা যথেচ্ছভাবে করা হয় নাই। তাহার একটি নিয়ম আছে।

লিখিত বাংলা সাহিত্য যে সময় হইতে পাওয়া যায়, তখন হইতেই তাহাতে সংস্কৃত ও খাঁটি বাংলা শব্দ দুই-ই দৃষ্ট হয়। কোন যুগসন্ধির প্রভাবে ইহা ঘটে নাই। ইহার কারণ বাঙালী লেখকদিগের স্বাভাবিক রসবোধের মধ্যেই নিহিত। বর্ণনীয় বিষয়ের প্রকৃতি ও প্রয়োজন

অনুসারে তাঁহারা ভিন্নধর্ম শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অবশ্য ভিন্নধর্ম শব্দ প্রয়োগের নিয়মটি সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে নাই। মুকুন্দরাম অস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত ও বাংলা শব্দ প্রয়োগের একটা নিয়ম আছে, এবং কতক পরিমাণে সে-নিয়মকে তিনি অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। প্রাক্-বৃটিশ যুগের কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্র সর্বপ্রথমে নিশ্চিতরূপে এই নিয়মকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলেও ঘনরাম, মাণিক গাঙ্গুলি প্রভৃতি কবিত্বস্পর্ধাকারী লেখকগণও কতক পরিমাণে এই নিয়মকে অনুসরণ করিয়াছেন।

সকলেই জানেন প্রাক্-বৃটিশ বাংলা কাব্যে দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কীর্তনই কাব্যের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কাজেই কাব্যের একটা অঙ্গ ছিল দেবখণ্ড। সাধারণতঃ দেখা যায়, এই দেবখণ্ডে দেবভাষার প্রয়োগ কিছু বেশি। মানবখণ্ডে অপেক্ষাকৃত কম। মুকুন্দরাম নিজের অজ্ঞাতসারে মোটেব উপব এই নিয়ম অনুসারে চলিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাব মধ্যে এই নিয়মটি সুস্পষ্ট হইয়া ধরা দিয়াছে, সেই ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতেই আমরা প্রধানতঃ আলোচনা করিব।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের তিনটি ভাগ। প্রথম বা স্বর্গখণ্ড, দ্বিতীয় বা বিদ্যাসুন্দর, তৃতীয় মানসিংহ, অর্থাৎ একটি পারলৌকিক, একটি অলৌকিক, এবং একটি লৌকিক বৃত্তান্ত। ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন, পাঠকের বোধসৌকার্যার্থে যবনীমিশাল ভাষা ব্যবহার করিবেন। কিন্তু তিনি যবনীমিশাল শব্দ লৌকিক ইতিহাসেই প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য সমালোচকের দৃষ্টিতে পড়িলে দেখা যাইবে দেবখণ্ডে সংস্কৃতশব্দ সর্বাধিক, বিদ্যাসুন্দরে কিছু কম, মানসিংহে আরো কম।

কিন্তু দেবখণ্ডের আগাগোড়া সংস্কৃতশব্দপ্রধান, ইহা সত্য নহে। যেখানে দেবতারা মানুষের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের গৃহস্থালীর বর্ণনায়, নর-সুলভ কোন্দল কলহেব বর্ণনায় বাংলা শব্দই অধিক। কারণ সেখানে মানবধর্মের প্রাবল্যের জন্য তাঁহারা দেব-মাহাত্ম্য হারাইয়াছেন, কাজেই কবিকেও বাধ্য হইয়া বাংলা শব্দ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। আবার যেখানে সাধারণ মানবকে অসাধারণত্ব দিবার

প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার সমধিক। তবেই দেখা যাইতেছে, ইহার ব্যবহার অনেকটা পরিমাণে শিল্পীর রসাবেগের আতিশয্য বা intensityর উপর নির্ভর করিতেছে। শেক্সপীয়রবিদ্ পণ্ডিতগণ কবির গদ্যব্যবহারের একটা নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন। কবির রসাবেগ যেখানে মন্দ সেখানে তাঁহার কাব্যে গদ্যের ব্যবহার। যেখানে তিনি তুচ্ছ বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে গদ্য; হাস্য-রসের বর্ণনায় প্রধানত গদ্য। কিন্তু যেখানেই রসাবেগ প্রবল, গদ্যের উষর বেলাভূমিকে লঙ্ঘন করিয়া কবিতা সেখানে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন বাংলাকাব্যে গদ্যের ব্যবহার ছিল না, কিন্তু যেন এই অভাব পূরণের জন্যই কবিদিগকে সংস্কৃত ও বঙ্গ-রীতির ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, এমন একটা ধারণা আমার ক্রমে হইতেছে এবং প্রসঙ্গত একটা কথা বলিয়া রাখি মধুসূদনোত্তর বাংলা সাহিত্যে গদ্য-পদ্যের দুই ধারা বর্তমান থাকায়, আমাদের আর এ অসুবিধা নাই। আগেকার কালে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি গদ্যাত্মক বা পদ্যাত্মক, যেমনি হোক তাহাকে ছন্দে না গাঁথিয়া উপায় ছিল না। এখন যাহা স্বভাবত গদ্যাত্মক তাহা গদ্যেই লিখিত হওয়াতে পদ্যের দায়িত্ব অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

ভারতচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন বাংলা কাব্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে লেখকগণ সাধারণ নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। স্বর্গখণ্ডে দেবদেবীর রূপ বর্ণনায়, দেবদেবীর দেবোচিত কার্যকলাপে, দেবদেবীর বন্দনায়, স্তবে, নিসর্গবর্ণনায়। যেখানে মানুষকে অলৌকিকত্ব বা অসাধারণত্ব দিবার ইচ্ছা হইয়াছে, সেখানেও সংস্কৃত শব্দ বেশী। এইরূপ যে একটা নিয়ম ছিল তাহা দীনেশবাবু ধরিতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি কবিকঙ্কণের কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়াছেন।

"ফুল্লরার বারমাসী, কালকেতুর শৈশবলীলা, মুরারি শীলের সহিত কথাবার্তা, বণিক সভায় চন্দন ও মালাদান উপলক্ষে বাগ বিতণ্ডা, লহনা খুল্লনার কোন্দল প্রভৃতি নানা বিষয়ের বর্ণনায় পল্লীভাষার পল্লীচিত্রগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।" ইহাই স্বাভাবিক, যে কয়েকটি বিষয়ের কথা

উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহা নিতান্ত লৌকিক, সামান্যতাই তাহাদের ধর্ম, কাজেই এস্থলে পল্লীভাষা প্রয়োগ করিয়া মুকুন্দরাম প্রকৃত রসিকের কার্য করিয়াছেন।

"অপর দিকে সুবর্ণ গোধিকারূপধারিণী চণ্ডী দেবীর সহসা দশভুজারূপধারণ, ছাগরক্ষণে নিযুক্তা খুল্লনার সম্মুখে বনের উপান্তে সহসা বসন্তঋতুর আবির্ভাব, সুশীলার বারমাসী প্রভৃতি বিবিধ চিত্রে সংস্কৃত শব্দের সোনার রং যেন ঝলমল করিতেছে।"

উদ্ধৃত কয়েকটি বিষয়বস্তুতেই অসামান্যতার, চমৎকারিত্বের, অলৌকিকত্বেব ভাব আছে। এগুলির কল্পনাতে স্বভাবতই কবিচিত্তের রসাবেগের আতিশয্য প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এবং সেই প্রবল টানেই সংস্কৃত শব্দগুলি অভিধানের গুহা হইতে উজ্জ্বল উপলখণ্ডের মত বাহির হইয়া আসিয়া আলোকে ঝলমল ও স্রোতে ঝঙ্কার করিয়া উঠিয়াছে।

অবশ্য মুকুন্দরামের অনেক স্থলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে; ভারতচন্দ্রও সম্যকভাবে ইহাকে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। সত্য কথা বলিতে কি বাংলাকাব্যে সাংস্কৃত ও বঙ্গ্য রীতির দ্বন্দ্ব আজো মিটিয়া যায় নাই। এ দুটির মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি, কাহাব কোথায় স্থান, কাহাব কতখানি স্থান, তাহা আজো সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট হয় নাই। তবে মোটা-মুটি একটা কথা বলা যায়;—ভাষার দুইটি রূপ আছে একটি গতিময়, একটি স্থিতিময়। ভাব যেখানে প্রবহনশীল, ভাষা সেখানে গতিবান; ভাব যেখানে বহনীয়, অর্থাৎ অচঞ্চল, ভাষা সেখানে মন্দবেগ, স্থিতিধর্মী, কারণ ভাষা ভাবের আবরণ নহে, ভাবই ভাষা। প্রবহনশীল ভাব স্বভাবত লঘু, চটুল, স্বল্পভার বাংলা শব্দকে টানিয়া আনিবে। আর ভাব যেখানে বহনীয়, অর্থাৎ ধীর মন্দ গতিতে চলিতেছে, যেন তাহাকে বহন করিয়া লইয়া গেলেই সুবিধা হয়, আপন মাহাত্ম্য, ঐশ্বর্য ও গম্ভীরতায় আত্মনিহিত, সেখানে তাহার প্রকৃত বাহন অচপল, দীর্ঘ, বহু কবির প্রয়োগের দ্বারা বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও ব্যঞ্জনাসম্পন্ন পুরাতন ভৃত্যের মতো সহনশীল সংস্কৃত শব্দসমূহ। গল্পের অবিরাম স্রোতের জন্য বাংলা শব্দেব প্রয়োজন, ভাবের গম্ভীরতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য সংস্কৃত শব্দ।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের বাংলা কাব্য অতিমাত্রায় আত্মমুখী হইয়া পড়িয়াছে। এখন, এই অন্তর্মুখিতার জন্য বাংলা কাব্যে সংস্কৃতশব্দের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার পরে বাংলাকাব্যে যদি উচ্চদরের narrative কবি কেহ আসেন তবেই আবার বাংলাশব্দের সংখ্যা বাড়িবে, নতুবা যতদিন অন্তর্মুখিনতার প্রভাব প্রবল থাকিবে, সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা না বাড়িয়া গত্যন্তর নাই।

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে জল্পনা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে সর্বপ্রধান কথা এই যে, ইহার কোন ইতিহাস নাই। ইতিহাস যে নাই তাহার কারণ উনবিংশ খৃষ্ট শতকের পূর্বে বাংলা সাহিত্যই ছিল না। সাদাব উপরে কালির দাগ দিলেই তাহা সাহিত্য হয় না, সে দাগ কালের উপরেও পডা চাই। সাদার-উপবে-কালির-দাগ-রচনা যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাহা সাহিত্য নহে। আর যে-কয়টি রচনা কালের উপরেও দাগ রাখিয়া গিয়াছে, তাহা এতই সামান্য যে ইতিহাসেব ধারাবাহিকতা রক্ষার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। ধারাবাহিক সত্যই ইতিহাস। কাজেই বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলাব অর্থ ইহার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলা।

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান আর বিদ্যমান নহে। কারণ যে-যুগটাকে এখনো আমরা বর্তমান বলিতেছি বস্তুত তাহা অতীতের কোঠায় গিয়া পড়িয়াছে। রাজনৈতিক যুগ-গণনার একটা সুবিধা যে তাহা অনেক পবিমাণে রাজার দৈহিক জীবনের উপর নির্ভর করে। রাজা মরিল, 'রাজা দীর্ঘজীবি হোক' বলিয়া লোকে নূতন যুগ আরম্ভ করে, কিন্তু ভাব-জগতের যুগান্তর এমন প্রত্যক্ষ নহে, ভাবুক বাঁচিয়া থাকিতেও ভাবীযুগ আরম্ভ হইতে ক্ষতি নাই। একটা যুগান্তর যে ঘটিয়াছে তাহার প্রধান লক্ষণ সাহিত্যেব ধারাবাহিকতা হঠাৎ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মধুসূদন হইতে নূতন বঙ্গসাহিত্য এবং তাহার ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। মধুসূদনের মৃত্যুর পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্রের অবিসম্বাদিত উদয়, কাজেই মধুসূদনের ধারা বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে রূপান্তর পাইলেও যুগান্তর

ঘটে নাই। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণস্বরূপ দেখা গিয়াছিল, তাঁহার মধ্যে পূর্বসূরিদের ধারা রক্ষিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বয়োভাগ্য মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের ঘটে নাই; তাঁহার বৃদ্ধ বয়সেও এমন কেহ আসিয়া জুটিল না যাঁহার হাতে ইতিহাসের ধারাকে তিনি তুলিয়া দিতে পারেন। অবশ্য শরৎচন্দ্র আছেন কিন্তু তিনি পূর্বোক্ত তিন জনের মত গ্রহ নহেন, উপগ্রহ মাত্র। তিনি বড় সাহিত্যিক, ভাবজগতের নেতৃত্ব শক্তি তাঁহাতে নাই। কাজেই মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-ববীন্দ্রনাথের ধারা উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে নষ্ট হইয়া গেল।

এখন যে যুগটা আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে বহুর যুগ বলিতে পারি। আগে ছিল মহা-র যুগ। এ-যুগের প্রধান লক্ষণ অপ্রধান সাহিত্য। মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের যুগেও বহু লেখক ছিল, অপ্রধান সাহিত্যেরও অভাব ছিল না। কিন্তু মিছরি যেমন একটি সূত্রকে অবলম্বন করিয়া দানা বাঁধিয়া ওঠে, আগের যুগে তেমনি মহাসাহিত্যিককে কেন্দ্র করিয়া বহুর সাহিত্য রূপ পাইয়াছিল। ইহাতে মহা ও বহুর মাঝে সাম্য স্থাপিত হওয়াতে অপ্রধান সাহিত্য প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু এখনকার যুগ সূত্রহীন মিছরির মত দানা বাঁধিতে পারিতেছে না, মহা-হীন বহুব সাহিত্য বহুখণ্ড হইয়া পড়িয়াছে, এ খণ্ডকালের কাব্যলক্ষ্মী একান্তভাবে খণ্ডিতা।

অপ্রধান সাহিত্য সকল সময়েই থাকে। কালিদাসের আমলেও ছিল, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র ছিল না বলিয়া যাহা মরণীয় তাহা মরিয়া গিয়াছে। সাহিত্যে এক প্রকার প্রাকৃতিক নির্বাচন আছে, তাহাতে যোগ্যতমেরই উদ্বর্তন ঘটিয়া থাকে। বর্তমান যুগের সর্বপ্রধান ভীতি মুদ্রারাক্ষস, এ রাক্ষস মারে না, বাঁচাইয়া রাখে, বোধকরি বাঁচাইয়া রাখিয়াই শেষ পর্যন্ত মারে। এ যুগে অপ্রধান সাহিত্যের প্রাধান্যের প্রথম কারণ মুদ্রাযন্ত্রের অবাধ প্রসার। প্রসারের সবটাই সার নহে, বাকিটা উপসর্গ। এই উপসর্গে মানুষের ওজনজ্ঞান নষ্ট কবিয়া দেয়। ছাপার অক্ষরে রবীন্দ্রনাথ ও রামশর্মা দুই জনের রচনাই এমন সপ্রতিভ ভাবে তাকাইয়া

থাকে যে, ক্রমে পাঠকের ভেদজ্ঞান লোপ পায়। তারপর গ্রন্থ রচনা ও বিক্রয় একটা মস্ত ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিল্পকে ক্ষুধার অন্নের বাহন করার অর্থ ভাবজীবনকে জীবনের অভাবের সহিত যুক্ত করা, ইহাতে যে দ্বন্দ্ব তাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। ছাপার অক্ষরে যেমন ভেদ বোঝা যায় না, মলাটেও তেমনি গোল বাধায়। কাচের জানালায় বিচিত্রবর্ণ গ্রন্থমালা পীতালোকদীপ্ত পণ্যনারীর মত পথিককে লুব্ধ করিতেছে। শুনিয়াছি রুশ দেশে নারীপণ্য আইন করিয়া বন্ধ করা হইয়াছে, গ্রন্থপণ্য সম্বন্ধে সেখানে কি ব্যবস্থা, জানি না। বোধ করি সে সাহস আধুনিক-স্বর্গ রুশদেশেরও নাই। শিক্ষা ও শিল্পের নামে নূতন ধরণের পাপবৃত্তি প্রশ্রয় পাইতেছে। কোন্‌টা বেশি ভীতিকর? নারীর পণ্যে দেহ-মনের অপচয়, গ্রন্থপণ্যে শুধু মনের। আমার তো মনে হয় শেষেরটাই অধিকতর ভয়ঙ্কর, সুস্থদেহে অসুস্থ মনের মত ভীষণ জিনিস কমই আছে। অসুস্থ-দেহ-মনে খারাপ কাজ করিবার শক্তিই চলিয়া যায়, সুস্থদেহে অসুস্থ মন যাবতীয় অশুভ কার্যের মূলে। বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক জগতের মূল সমস্যাই ইহা।

ইহার পরে আমাদেব দেশে বেকাব সমস্যা আছে। কেরানীগিরির জন্য যাহার কলম, সে লিখিতেছে কবিতা; মাটি খুঁড়িবার জন্য যাহার কোদাল, সে করিতেছে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান; পকেট কাটিবার জন্য যাহার কাঁচি, সে এক শিশি আঠা লইয়া সমালোচক সাজিয়াছে আর সম্পাদকের কলম বোধকরি সিঁধকাঠি পিটিয়া প্রস্তুত। আমাদের দেশে সাহিত্য রচনার ন্যূনতম গুণ একখানা হাত।

এতক্ষণে আমরা ছুটি বিষয় দেখিলাম, নূতন কালের সাহিত্যিক চিন্তানেতার আবির্ভাব হয় নাই এবং অপ্রধান সাহিত্যের প্রাচুর্ভাব হইয়াছে। ছুটিই যে কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত ইহা সহজেই বোঝা যায়। এখন সাহিত্যকে এই অরাজকতা অথবা বহুরাজকতা হইতে বাঁচাইবার উপায় কি? একথা সত্য যে আমরা প্রতিভাবান ব্যক্তি সৃষ্টি করিতে পারি না, কিন্তু এমন একটা প্রতিষ্ঠাপন্ন প্রতিষ্ঠানকে সৃষ্টি করিতে পারি, কিছু পরিমাণে যাহা এই অরাজকতাকে শাসন করিতে পারে।

বহু চেষ্টা করিলেই মহা হইয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু মহা-প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিতে বাধা কোথায়! ফল কথা আমরা এমন একটা সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারি, বিপদকালে যাহা আমাদের আশ্রয়-স্বরূপ এমন হইতে পারে, হওয়া উচিত, অন্য দেশে হইয়াছে।

কিন্তু প্রতিষ্ঠানের নামে অনেকেই বিরক্ত হইবেন, কোনরূপ স্থাপনার উপর আর আমাদের আস্থা নাই। সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা সকলেই চায়, কিন্তু প্রতিষ্ঠান নাকি কেবল অনুদারের আবদার। একদল লোক আছেন যাঁহারা কোনরূপ শৃঙ্খলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে অনিচ্ছুক। সীমাকে ইঁহারা সঙ্কীর্ণতা মনে করেন। ইঁহাদের মতে ভাঙা কলসীই সার্থক, কারণ তাহার সীমা না থাকাতে সঙ্কীর্ণতাও নাই।

বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক কালের যুগ-লক্ষণ ভঙ্গপ্রবণতা। কিন্তু কালাপাহাড়দের মনে রাখা উচিত ভাঙনের নেশায় ভাঙিবার হাতুড়িটা পর্যন্ত ভাঙিয়া ফেলা চলে না। এযুগে ঘটিয়াছে তাহাই, সেই জন্যই এযুগ এমন অসহায় ভাবে নিরস্ত্র।

বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতির আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিব কেন এই জাতীয় একটা প্রতিষ্ঠান আসন্ন ভাবে আবশ্যক।

বাংলা সাহিত্যের ভাবের প্রধান বাহন পদ্য। মধুসূদন প্রধানত কবি। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য আংশিকভাবে কাব্যলক্ষণগ্রস্ত। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি ও কবিপ্রধান। তাঁহার গদ্য কবির গদ্য। অত্যাধুনিকদের মধ্যে যাহাদের গদ্য অপাঠ্য, তাহাদের পদ্য অপেক্ষাকৃত সুখপাঠ্য। এখন, পদ্য রচনার বাঁধাধরা নিয়মপ্রস্তুত সম্ভব নহে, কাজেই তাহা ব্যক্তিগত ও জন্মগত সম্ভাবনার উপরে ছাড়িয়া দিতে হয়। কিন্তু গদ্যকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করা অসম্ভব নহে। অবশ্য, আমাদের প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এ নহে যে তাহার সদস্যগণ উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ রচনা করিবেন। যে-গদ্য আমাদের জাতির পক্ষে স্বাভাবিক নহে, অর্থাৎ চেষ্টা ও শিক্ষাসাপেক্ষ তাহার সংস্কৃতি ও পরিষ্কৃতিসাধন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব। যেমন অস্ত্র প্রস্তুত করা আর সেই অস্ত্র ব্যবহার করা। ভাষাকে গড়িয়া পিটিয়া তৈয়ারী-করা এক, আর তাহাকে সুনিপুণভাবে

ব্যবহার করা আর। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বাংলা ভাষায় কিছু পরিমাণে ফার্সি ও ইংরেজী শব্দ পাঙ্‌ক্তেয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের পঙ্‌ক্তি-ভোজনে অজস্র পরিচিত ফার্সি ও ইংরেজী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। ইহাতে ভাষার ঐক্য নষ্ট করিয়া ইহাকে শিথিল করিয়া দিতেছে। এই সভা, ভাষায় প্রচলিত ও যাহা চলা উচিত এমন সব বিদেশী শব্দের একটা অভিধান সঙ্কলন করিতে পারে, এই সব বিদেশী শব্দের প্রয়োগ দেখাইয়া গ্রন্থ লিখিতে পারে। অবশ্য বড় লেখকরা ইহার ব্যতিক্রম করিবেন, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য বড় লেখক সৃষ্টি নয়; আটপৌরে লেখকদের ব্যবহারোপযোগী ভাষার সংস্কার। কিন্তু মুস্কিল এই আমাদের দেশে সকলেই নিজেব মানদণ্ডে বড়, কিন্তু ভুলিয়া যাই যে মানদণ্ডখানা প্রমাণ (Standard) দণ্ড হওয়া আবশ্যক। এই সভার হাতে বাংলা সাহিত্যের মানদণ্ড থাকিবে। নিরপেক্ষ হাতে মানদণ্ড রাজদণ্ডের গৌরব ধারণ করে।

আবও একটি কারণে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। আমাদের ভাষায় একটি যথেচ্ছাচাবের ভাব আছে, ইহার খানিকটা স্বভাবসিদ্ধ, খানিকটা বাহিরের নানা কারণে ঘটিয়াছে। বাহ্য কারণটা ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব।

ইংরেজী সাহিত্যে নিয়মচর্যার অভাব লক্ষিত হয়। এই নিয়মমুক্তিই ইংরেজী কাব্যকে এমন অবাধ প্রাণপূর্ণ ও ইংরেজী গদ্যকে এমন বর্বরোচিত সম্পদ দিয়াছে, বর্ববের শিক্ষার অভাব ও দুরন্ত প্রাণবেগ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইংরেজী সাহিত্য রূপসার্থক। তার কারণ এ জাতিটার মধ্যে এমন অমোঘ .নিয়মশৃঙ্খলা আছে, যাহার সুদৃঢ়ভিত্তি জাতীয় সংস্কৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এই বর্বরোচিত গদ্যসাহিত্য নিরর্থক হইয়া পড়ে নাই। ইংরেজ দোকানদারের জাতি; লোকব্যবহারে সে অত্যন্ত চাপা কিন্তু এই জাতিই আধুনিক জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রোমাণ্টিক কাব্য লিখিয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক, কারণ সাহিত্য জীবন নহে, জীবনের ছায়াও নহে, সাহিত্য না-জীবন অর্থাৎ জীবনে যাহা ঘটে না, সাহিত্যে তাহার ঘটনা। সাহিত্য ও জীবন পরস্পর পরিপূরক।

আবার দেখি ফরাসি জাতি লোকব্যবহারে অনেকটা আমাদের মতো, মন তাহাদের মুখে। লোকব্যবহারে রোমান্টিক এই জাতির বৈশিষ্ট্য কাব্যে নয়, রোমান্টিক কাব্যে নয়, অনেক পরিমাণে ক্লাসিকাল গুণপ্রাপ্ত গদ্য সাহিত্যে! জাতীয় সম্পদকে বাঁচাইবার জন্য, রক্ষা করিবার জন্য, উন্নত প্রয়োগযোগ্য করিবার জন্য তাহাদের সাধনার অন্ত নাই। কবিত্ব-শক্তি জন্মসিদ্ধ, আর গদ্যলেখার ক্ষমতা আজন্ম সাধনার ফল। ফরাসি দেশে গদ্যসাহিত্যের অধিনায়ক বিখ্যাত ফরাসি একাডেমি।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ইংরেজী কাব্য যে গৌণ তাহার কারণ ফরাসি-সাহিত্যের প্রভাব। প্রকৃত পক্ষে বর্তমান ইংরেজী গদ্যের আবির্ভাব এই সময়টাতে, তাহার মূলেও ফরাসি গদ্যের প্রভাব। অষ্টাদশ শতকের শেষ হইতে ইংরেজী কাব্য আবার স্বধর্ম লাভ করিয়াছে, তখনকার কাব্য চূড়ান্তভাবে রোমান্টিক।

এখন, বাংলা সাহিত্যের মূলে যে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব তাহা এই রোমান্টিক পর্বের কাব্য। একে আমাদের জাতীয় মনোবৃত্তি রোমান্টিক তার উপরে বাহিরের রোমান্টিক কাব্যের প্রভাব, দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড রোমান্টিক বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিল; এমন কি আমাদের গদ্য, ভাবে, উপজীব্যে ও ভাষায় পর্যাপ্ত রোমান্টিক মূর্তি গ্রহণ করিল, বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক-উপন্যাস। কিন্তু আমাদের গদ্যের বালকত্ব ঘুচিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তাহা গিরিলঙ্ঘন করিয়াছে বটে, কিন্তু সাধারণ লেখকদের হাত নেহাৎ বেহাত হইয়া রহিল। আমাদের সাহিত্যের গঠন সময়ে ফরাসি সাহিত্যের এমন কি ফরাসি প্রভাবগ্রস্ত ইংরেজী গদ্যের প্রভাব পড়িলে গদ্যের এ দুর্দশা হইত না; কাব্যও অবিকৃত রহিত কারণ তাহা জাতীয় মনোবৃত্তিজাত।

যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন গদ্যকে সংস্কার করিবার উপায় কি। 'ফরাসি একাডেমি'র উদ্দেশ্য অনুধাবন করিয়া একটি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত। আর একটি কথা ব্যক্তিগতভাবে লেখক-দের মনে রাখা আবশ্যক। সব দেশের একটি করিয়া ক্লাসিকাল সাহিত্য

আছে, কালের কষ্টিপাথরে ইহার বিচার হইয়া গিয়াছে, সাহিত্যের ইহা ধ্রুবপদ অংশ। লেখকের মানসিক পটভূমি হইবে এই ক্লাসিকাল সাহিত্য। ইহার অর্থ এ নয় যে, প্রত্যেক লেখককে হোমার বা বাল্মীকির ছাঁচে কলম কাটিয়া লইতে হইবে বা সব ছাড়িয়া মহাকাব্য লিখিতে বসিতে হইবে। সব সাহিত্যই জন্মকালে রোমান্টিক, টিকিয়া গেলে ক্লাসিকাল। মানুষের স্মৃতির ছাঁকনীতে যাহা টিকিয়া যায়, সেই সাহিত্যই শরেণ্য ও অনুধাবনযোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের প্রধান মানসিক খাদ্য বর্তমান সাহিত্য, কঁতিনাতাল সাহিত্য, যাহার সানুনাসিক উচ্চারণে পাঠকের সংস্কৃতির জিহ্বা সজল হইয়া ওঠে। এ কঁতিনাতাল, ফরাসী সাহিত্য হইলেও চলিত, কারণ যদি কোন আধুনিক সাহিত্যে ক্লাসিকাল সাহিত্যের গুণ থাকে তবে তাহা ফরাসি সাহিত্যে। সংস্কৃত সাহিত্য হইলেই সব চেয়ে ভালো হয়; সংস্কৃতির সহিত সংস্কৃতের নিত্যসম্বন্ধ।

যদি আমরা বঙ্গ সাহিত্যের এই অধিনেতৃহীন দুঃসময়ে সাহিত্যিক ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চাই, কাব্যকে রক্ষা করিতে চাই, গদ্যকে সংস্কার করিতে চাই, তবে ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। সকলে সংঘ-গত ভাবে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারি, আর প্রত্যেকে ব্যক্তিগত-ভাবে মানসিক পটভূমিতে ক্লাসিকাল সাহিত্যের আদর্শকে স্থাপন করিয়া সেই অত্যুচ্চ মহিমার প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইতে পারি, তবেই হয়তো কোনো গতিকে এই দুঃসময়টা অতিক্রম করিতে পারিব। নতুবা ইতিহাসহীন বঙ্গসাহিত্য পুনরায় যবনিকার অন্তরালে চলিয়া যাইবে। তখন মাঝখানের এই অত্যুজ্জ্বল পর্বটাকে লোকে ভুলিয়া গিয়া হয়তো নিশ্চিন্ত মনে আবার পাঁচালী, টপ্পা, যাত্রা, রূপকথা ও পল্লীগাথা রূপ মহা সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করিবে। আর ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক আনন্দাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে বলিবে, আহা এতদিন পরে Prodigal পুত্র আবার পল্লীসাহিত্যের গোয়ালে ফিরিয়া আসিয়াছে।

মাইকেল মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব ও কবিত্ব

সম্প্রতি বাঙলাদেশে মাইকেল মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব ও কাব্যের পুনরুজ্জীবনের একটা আভাস যেন দেখা যাচ্ছে। এই কলকাতা শহরে এক সঙ্গে দু'টি রঙ্গমঞ্চে মাইকেলের জীবন-নাটকের অভিনয় চ'লছে, এমন যে দুঃসময় যা'তে দর্শকের মন লঘুপাক খাদ্য চায়, তখন মাইকেলের ব্যক্তিত্ব যে দর্শকদের আনন্দ দান ক'রছে, তা' বিস্ময়ের বটে, কিন্তু একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়।

মাইকেলকে নিয়ে গত দশবছরের মধ্যে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হ'য়েছে। কবি মোহিতলাল আধুনিক কালে সর্বপ্রথম মধুসূদনের কাব্য নিয়ে নূতনভাবে আলোচনা আরম্ভ করেন। তারপরে বনফুল তাঁর চরিত্র নিয়ে শ্রীমধুসূদন নাটক লিখেছেন। তা'ছাড়া আরও একজন কুখ্যাত লেখক মাইকেল-চরিত্র বিশ্লেষণ করে নূতন একখানা জীবনী-রচনা ক'রেছেন। রবি-রশ্মির বিচিত্র বর্ণলীলায় বাংলা সাহিত্যের পশ্চিম আকাশ যখন শোভন এবং উজ্জ্বল সেই সময় 'রবি-উদয়ের আগে যে শুক্র-গ্রহ' বাংলা সাহিত্যের পূর্বাকাশে ক্ষণকালের জন্য উদিত হ'য়ে আবার নিমজ্জিত হ'য়ে গিয়েছিল, তা'র প্রতি ঔৎসুক্য—একি কেবল আকস্মিক না যুগলক্ষণাক্রান্ত ঘটনা? একে কেবল আকস্মিক ব'লে গ্রহণ ক'রতে আমার মন চায় না। এই ব্যাপারের মধ্যে বিশেষ ক'রে বর্তমান যুগের লক্ষণ যেন আছে। সেই যুগলক্ষণটি কি?

কিন্তু তা'র আগে আর একটা কথা নিজের কাছে স্পষ্ট ক'রে

নেওয়া দরকার। সম্প্রতি মাইকেলের প্রতি যে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, তা' যতটা তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি, তাঁর কবিত্বের প্রতি যেন ততটা নয়। নূতনলেখা নাটকে ও জীবনীতে কবিত্বের ব্যাখ্যা হয়তো আছে, কিন্তু লেখকদের ঝোঁক প'ড়েছে মানুষ-মাইকেলটার উপরে। মানুষ-মাইকেল কেমন ছিলেন? অর্থাৎ তাঁর চরিত্রে এমন কি ছিল যা' আজ তাঁর মৃত্যুর সত্তর বছর পরে আমাদের মনকে এমন চৌম্বক শক্তিতে আকর্ষণ ক'রছে?

কবিদের কাব্যই মুখ্য, জীবনটা গৌণ। তবু এই কবির জীবন আজ প্রধান আকর্ষণের বিষয় হ'য়ে উঠল কেন। ধর্ম-প্রচারক, সমাজ সংস্কারক,কর্মী জীবনটাই লোকের সম্মুখে রেখে যান, কিন্তু এসব গুণ যাঁর নেই, যিনি কবিমাত্র, মানবমনের কোন গোপন চাহিদার ফলে তাঁর জীবনের পুনরভ্যুদয় ঘটলো? তা' হ'লে প্রশ্নটা দাঁড়ায় গিয়ে মাইকেলের ব্যক্তিত্ব কোন্ সমবেদনার সূত্রে বর্তমান যুগের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ?

আমার তো মনে হয় মাইকেল যে সময়ে বাস ক'রছিলেন, আর আমরা যে সময় বাস করছি, এই দুই যুগের একই লক্ষণ। সে যুগ ছিল অশান্তির ও অনিশ্চয়তার, এই যুগেরও কি সেই লক্ষণ নয়?

১৮৪৩ এ মাইকেল খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন, আজ ১৯৪৩, ঠিক একশো বছর গত হ'য়েছে। ১৮৩৭-এ তিনি হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবার পরেও কয়েক বছর তিনি বাংলাদেশে ছিলেন। ১৮৩৭ থেকে এই কয় বছরেই তাঁর চরিত্র গঠিত হ'য়ে উঠেছিল, সেই যুগের ভালোয় এবং মন্দয়। যুগলক্ষণাক্রান্ত এই ব্যক্তিত্বেরই বিকাশ তাঁর কাব্যে—যদিও সে সব কাব্য লিখিত হয়—অনেক পরে।

তখন হিন্দু কলেজের আবহাওয়া কেমন ছিল? অনেকের ধারণা তখনকার আবহাওয়া খৃষ্টধর্মের অনুকূল ছিল। বস্তুত তা' নয়। হিন্দু কলেজের সবচেয়ে প্রভাবশালী অধ্যাপক ছিলেন—ডিরোজিও, তিনি ছিলেন নাস্তিক। আর তখনকার দিনে ইংরেজীশিক্ষিত সমাজে হেয়ার সাহেবের অগাধ প্রতিপত্তি ছিল, তিনিও চাইতেন না যে ছেলেরা

খৃষ্টান হয়। একবার কয়েকজন ছেলে কোন পাদ্রীর কাছে গিয়ে বাইবেল উপহার নিয়ে এসেছিল। হেয়ার তা' জানতে পেরে তা'দের বাইবেল কেড়ে নিয়ে বেত মেরে শাসন করে দেন। খৃষ্টান করা যা'দের উদ্দেশ্য নিশ্চয় তা'রা এমন কাজ ক'রতো না। মাইকেল প্রত্যক্ষভাবে ডিরোজিওর ছাত্র নন্—মাইকেল যখন হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন—তখন ডিরোজিওর মৃত্যু হ'য়েছে, কিন্তু তাঁর ছাত্রদের মধ্য দিয়ে তখনও তাঁর প্রভাব কাজ ক'রছিলো। হিন্দু কলেজে যদি কোনো আবহাওয়া থেকে থাকে—তবে তা' ছিল নাস্তিক্যের।

সেকালের সামাজিক ইতিহাস যাঁরা লেখেন তাঁর এই সত্যটি তেমন ক'রে প্রণিধান করেননি, ফলে অনেক গোলমালের সৃষ্টি হ'য়েছে। এই ভুলের গোড়ার কারণ হ'চ্ছে, তৎকালীন ইংরেজী শিক্ষিতদের উপরে ফরাসী-বিপ্লবের নাস্তিক্যতত্ত্ব যে প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল—সেটা আমরা হিসেবের মধ্যে ধরি না। তখনকার দিনের এদেশের অনেক ইংরাজ নাস্তিক্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন, ফলে সেই প্রভাব পড়েছিল এদেশের ইংরেজী শিক্ষিতদের উপরে। মাইকেল যখন খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করেন, তখন তিনি কোন ধর্মেই বিশ্বাস ক'রতেন না, না হিন্দুধর্ম না খ্রীষ্টানধর্ম। তবে যে তিনি খ্রীষ্টান হ'য়েছিলেন—তা' সাংসারিক সুবিধা হ'বে এই আশায়। এই তো নাস্তিক্য—যখন সব ধর্মই সমান হীন মনে হয়—ধর্ম যখন সাংসারিক সুবিধার উপায় ব'লে প্রতিভাত হয়। তখনকার দিনের সামাজিক ইতিহাস বোঝা যাবে না ফরাসী-বিপ্লবকে গণ্য না ক'রলে, আবার এখনকার দিনের শিক্ষিত সমাজের ইতিহাস বুঝতে অসুবিধা হ'বে যদি আমরা রুশ-বিপ্লবকে হিসাবের মধ্যে না ধরি। এ দু'টি বিপ্লবই আমাদের মনের চেহারা কতক পরিমাণে বদলে দিয়েছে। এদের সুফল ও কুফল দুই-ই এসে প'ড়েছে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের অভিব্যক্তির উপরে। তা'র ফলে ছোট বড় সমান হ'য়ে গিয়েছে; পুরাতনের প্রতি বিশ্বাস শিথিল হ'য়েছে, কিন্তু নূতনের প্রতি তেমন আস্থা হয়নি, ব্যক্তিত্ববাদের প্রতি অনাস্থা দেখা দিয়েছে, কিন্তু সমষ্টিসত্তা এখনো তেমন সত্য হ'য়ে

ওঠেনি। এখন আমরা ত্রিশঙ্কুর মত ভূতকালের পৃথিবী এবং অভূত-কালের স্বর্গের মধ্যে দোদুল্যমান। পায়ের তলায় বিশ্বাসের কোন দৃঢ়ভিত্তি আমাদের নেই। এ যদি নাস্তিক্য না হয়, তবে নাস্তিক্য আর কা'কে বলে? এ-দিক দিয়েও মাইকেলের যুগ আর আমাদের যুগ সমলক্ষণাক্রান্ত। কালের চাকা একশো বছরে আবর্তিত হ'য়ে আবার ঠিক পুরাতন লক্ষণটি প্রকাশ ক'রেছে—অশান্তি, অনিশ্চিয়তা, নাস্তিক্য। দুই যুগের শিক্ষিত বাঙালী সমধর্মী।

আমার তো মনে হয় ঠিক এই কারণেই দুঃসময়ের সাথী খুঁজবার জন্য বাঙালী চিত্ত ইতিহাসের মধ্যে বেরিয়ে প'ড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শনিষ্ঠা তার নয়, কেশবচন্দ্রের জ্বলন্ত বিশ্বাস তার নয়, রামকৃষ্ণের সর্বধর্মের মূলগত শান্তি তার নয়, বিবেকানন্দের বহুদূরশ্রুত 'উত্তিষ্ঠত' শুনে সে ভাবে, কেন উঠতে যাবে? বিধর্মী, নাস্তিক, পরাচারী, পয়ার ও হিন্দুধর্মের শিকলভাঙা মাইকেলের দুরন্ত অশান্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যেই যেন সে নিজের দোসর খুঁজে পেয়েছে—তা'কেই তা'র আজ বিশেষভাবে আপনার ব'লে মনে হ'চ্ছে। তাই আজ শিক্ষিত বাঙালীসমাজে মানুষ-মাইকেলের এত আদর। মাইকেল চল্লিশ হাজাব টাকায় বর্ষ যাপন করতে চাইতেন, আর আজ আমরা প্রত্যেকে মনে মনে চল্লিশলক্ষ টাকার চেক্ কাটছি।

এবারে মাইকেলের ব্যক্তিত্ব থেকে তাঁর চবিত্রে যাওয়া সহজ হ'বে। এইরকম ব্যক্তির দ্বারা কী রকম কাব্য রচিত হওয়া সম্ভব? 'মেঘনাদ বধ' যে তাঁব কেবল প্রধান সৃষ্টি তা নয় তাঁর বিশেষ সৃষ্টি। এই কাব্যের মধ্যে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব ও তাঁব কালের ব্যক্তিত্ব হাত মিলিয়েছে। রামায়ণের কাহিনীকে তিনি তাঁর কালের ছাঁচে ঢালাই ক'বে গড়েছেন। বড় কবিরা পুরাতন কাহিনীকে এমনি ক'রেই গড়ে থাকেন। তুলসীদাসী রামায়ণের ভক্তিবাদ বাল্মীকির নয়; কৃত্তিবাসী রামায়ণের রামলক্ষ্মণ দোষেগুণে বাঙালী। মাইকেলের আগে পর্যন্ত রামায়ণ কাহিনীর রূপান্তর ঘটেছে, ভিন্নকালের কবিরা ভিন্নকালের গুণে কাহিনীকে ভূষিত ক'রেছেন, কিন্তু moral valueব পবিবর্তন করেননি। রামচন্দ্র

বনবাসী হ'য়েও বড় ছিলেন, রাবণ প্রতাপশালী হ'য়েও ছোট ছিল। মাইকেলের হাতে এসে এসব ওলটপালট হ'য়ে গেল। মেঘনাদ বধের moral value বাল্মীকির নয়, তুলসীদাসের নয়, কৃত্তিবাসের নয়, ভারতবর্ষের নয়, বিশেষ ক'রে মাইকেলের এবং মাইকেলের যুগের ; যুগ-ধর্মের প্রভাবে রামলক্ষ্মণ ছোট হ'য়ে গেল—রাবণ হয়ে উঠলো বড়, মেঘনাদ হোলো নায়ক। মাইকেল ব'লতেন, 'রাম ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদের আমি ঘৃণা করি। ইন্দ্রজিতের কথা মনে হ'লে আমার কল্পনা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে ; হাঁ—একটা লোক ছিল বটে !'—অনাচারী, বিধর্মী, ঐশ্বর্যশালী রাবণ মাইকেলের কল্পনাকে অনুপ্রাণিত ক'রতো আর বনবাসী জটাচীরধারী রামলক্ষ্মণের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ও অনুকম্পার অবধি ছিলনা। মাইকেলীযুগের প্রত্যেক ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিই একটি ক'রে ক্ষুদে রাবণ ছিল ; মাইকেলের রাবণে ইন্দ্রজিতে এই যুগ-মূর্তিরই বিরাট রূপ। কেউ কেউ বলেছেন মাইকেল বিধর্মী ছিলেন ব'লে রামচরিত্রের মাহাত্ম্য বুঝতে না পেরে এমন বিপরীত কাণ্ড ক'রেছেন, বস্তুত তা নয় ; মাইকেল হিন্দু থাকলেও ঠিক এমনটিই ক'রতেন ; কোন হিন্দু প্রতিভাবান কবি লিখলেও ঠিক এমনি ক'রেই লিখতেন, শুধু মাইকেল নয়, সে যুগটাও যেন ধর্মান্তর গ্রহণ ক'রেছিল ; তা' খৃষ্টধর্ম নয়, নাস্তিক্যের ধর্ম।

এখন এ যুগকে মাইকেলের যুগের সমধর্মী বলেছি। তা' যদি হয় এ যুগের বিশেষ কাব্যরূপ কি ? এ যুগের অনেক কবি রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে থাকেন, অন্তত তাঁরা তাই বলেন। রবীন্দ্রনাথ এ যুগের লোক হ'লেও তাঁর কবিমন গড়ে উঠেছে এমন এক সময়টা যে সময় আদর্শবাদের অনুকূল ছিল। এইসব কবিরা বলেন তাঁরা আদর্শবাদ মানেন না, কিন্তু কী তাঁরা মানেন ? তাঁদের বিশেষ সৃষ্টি কি ? তাতে যুগধর্মের কী লক্ষণ আছে ?

মাইকেলও তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রেছিলেন, ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে, যাঁকে তিনি ব'লতেন—'কৃষ্ণনগরের লোকটা' ; আর ঈশ্বরগুপ্তের বিরুদ্ধে যাঁকে ব'লতেন—'বুড়ো ঈশ্বরগুপ্ত'। এখনকার

কোন কোন কবিও সেই অনুকরণে রবীন্দ্রকাব্যের বিরোধিতা ক'রছেন। কিন্তু তফাতের মধ্যে এই যে তাঁদের কারো মাইকেলী প্রতিভা নেই! থাকলে এ যুগের লক্ষণাক্রান্ত বিশিষ্ট কাব্য পেতাম।

ধরা যাক, আধুনিক কালের কোন প্রতিভাবান্ কবি মহাভারতের গল্প নিয়ে নূতন ক'রে কাব্য রচনা করছেন। তাঁর কাহিনী কি রূপ নিত? মেঘনাদবধে যেমন রাবণ, ইন্দ্রজিৎ বড় হ'য়ে উঠেছে, এখনকার কবির হাতে তেমনি দুর্যোধন, দুঃশাসন বড় হ'য়ে উঠে আদর্শবাদা যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম হীনপ্রভ হয়ে পড়তো। তার কারণ দুর্যোধনের চরিত্রে এমন সব উপাদান আছে যা'তে তা'কে জবরদস্ত Dictator ক'রে গড়া যায়—আর এতো স্পষ্টই ডিক্টেটারদের যুগ। পৃথিবীময় অশান্তি, অনিশ্চয়তা, নাস্তিক্যই হচ্ছে ডিক্টেটারশিপের উদ্ভবের মূল কারণ। মানুষ যখন অশান্তি, অনিশ্চয়তার মধ্যে অসহায় অনুভব করে, তা'দের সেই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই ডিক্টেটাররূপে দেখা দেয়। নাস্তিক্যের স্রোতে মানুষ যখন মন থেকে দেবতার মূর্তি বিসর্জন ক'রেছে, ডিক্টেটাররা সেই সুযোগে অত্যন্ত সুকৌশলে নিজেকে সেই শূন্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। ডিক্টেটারশিপের উত্থানের ইতিহাস যদি অনুধাবন করা যায় তা'হলে দেখা যাবে অশান্তি, অনিশ্চয়তা ও নাস্তিক্যই তা'র প্রধান কারণ।

এখন দুর্যোধন চরিত্র নিয়ে যুগোচিত ডিক্টেটার গড়বার সুযোগ প্রচুর ছিল। এখনকার বিদ্রোহী কবিদের প্রতিভা ও যুগধর্ম-চৈতন্য থাকলে তাঁদের হাতে দুর্যোধন প্রচণ্ড ডিক্টেটার হ'য়ে উঠতে পারতো। তাঁরা এ কাজে হাত দেননি বটে, কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই দুর্যোধন চরিত্রকে কতক পরিমাণে এই গুণে ভূষিত করেছেন। 'গান্ধারীর আবেদনের' দুর্যোধন চরিত্র যুগধর্মী ডিক্টেটার ছাড়া আর কিছু নয়।

লোকধর্ম, রাজধর্ম এক নহে পিতঃ!

* * *

রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই,

শুধু জয়ধর্ম আছে............

ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুমাঝে আত্মসমর্পণ
যুদ্ধ নহে...... ......

নিন্দা আর নাহি ডরি,
নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠ রুদ্ধ করি।
নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী
স্পর্ধিতরসনা তার দৃঢ় বলে চাপি
মোর পাদপীঠ-তলে। দুর্যোধন পাপী,
দুর্যোধন ক্রুরমনা, দুর্যোধন হীন
নিরুত্তরে শুনিয়া এসেছি এতদিন,
রাজদণ্ড স্পর্শ করি কহি মহারাজ
আপামর জনে আমি কহাইব আজ
দুর্যোধন রাজা! দুর্যোধন নাহি সহে
রাজনিন্দা আলোচনা, দুর্যোধন বহে
নিজ হস্তে নিজ নাম।............

আমি চাহি ভয়
সেই মোর রাজপ্রাপ্য, আমি চাহি জয়
দর্পিতের দর্প নাশি।

এই উক্তি কি আধুনিককালের যে কোন ডিক্টেটার করতে পারতেন না? তাঁদের বক্তৃতাগুলো খুঁজে দেখলে কি এই ভাবই ভাষান্তরে পাওয়া একান্ত দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের আদর্শনিষ্ঠা আছে ব'লেই দুর্যোধন চরিত্রকে স্বাভাবিক পরিণামে নিয়ে যাননি, গান্ধারীর মহৎ আদর্শের কাছে দুর্যোধনকে খাটো করে দিয়েছেন।

কিন্তু ধরুন এইভাবে দুর্যোধন চরিত্র গড়ে তুলে তা'র কাছে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে যদি ছোট করে ফেলা হ'ত তাহ'লে শঙ্কিত পাঠকসমাজ কি আবার প্রতিবাদের চিৎকার করতো না, যেমন করেছিল "'মেঘনাদবধ' কাব্য রচনার পরে, রাবণ ইন্দ্রজিতের কাছে রামলক্ষ্মণ ছোট হ'য়ে পড়াতে। এ সম্ভাবনা তো খুবই ছিল; কিন্তু এ সম্ভব হয়নি এই

কারণে যে এ যুগের কোন কবির মাইকেলের প্রতিভা নেই। মাইকেল ঘন ঘন জন্মগ্রহণ করে না।

তারপরে মাইকেলের বীরাঙ্গনার নায়িকারা কি সকলেই সামাজিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নয়? রবীন্দ্রনাথের দেবযানী, অমাবাঈ, বাঁশরী সরকার, বিনোদিনী, শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী, অভয়া, অচলা—এরা সবাই মাইকেলের বীবাঙ্গনার সগোত্র। তফাৎ যেটুকু তা কেবল লেখকদের শিল্পধর্মের প্রভেদের জন্য—কিন্তু যুগধর্মের বিচারে এরা সবাই এক ছাঁচে গড়া। অশান্তির যুগেই মানুষ বিদ্রোহ করে, শান্তিব সময়ে সেই বিদ্রোহের যা' কিছু সফল তা' সংগ্রহ করতে নিযুক্ত থাকে।

কিন্তু মাইকেলকে কেবল যুগধর্মমাত্র দিয়ে বিচার করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তাঁর কাব্যে উচ্চাঙ্গের কবিত্ব এত আছে, যা কোন বিশেষ যুগের নয়—তা সর্বকালের—সে হিসেবে মাইকেল অমরকবি। যুগে যুগে বিশেষ ধর্মের বিশেষরূপ দেখা যাবে, কখনো মাইকেলের আদব হবে, কখনো অপেক্ষাকৃত অনাদর। কিন্তু তাঁর মধ্যে একটা অংশ আছে যা'র অনাদর হওয়া কখনো সম্ভব নয়—যেখানে তিনি যুগাতীত মানব মনের কবি।

হায় চ্ছা করে
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুমদাম সজ্জিত, দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি;
নীরব রবাব, বীণা মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকিরে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?

এ কি কেবল রাবণের বিলাপ? এ যে হতাশ, শোকাতুর মানুষের

চিরকালীন খেদোক্তি! এ মাইকেল কোন বিশেষ যুগের, কোন বিশেষ সমাজের নন; চিরকালের, সর্বদেশের।

রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বলেছেন তাঁর কাব্য যৌবনের কাব্য। তা' যদি হয় মাইকেলের কাব্য প্রৌঢ়ত্বের কাব্য। অল্প বয়সে তাঁর অমিত্রাক্ষরের প্রশান্ত বিষাদপূর্ণ ছন্দঃস্পন্দ ভালো লাগবার কথা নয়। জীবনে আঘাতের, আশাভঙ্গের অভিজ্ঞতা বাড়লে তবেই সেই ভাঙা দরজা দিয়ে তাঁর কাব্য প্রতিমাশূন্য হৃদয়ে প্রবেশ করবার সুযোগ পায়। মাইকেলের কাব্যের পুনরুজ্জীবন আসন্ন হয়ে উঠেছে—সে কি কেবল যুগধর্মের প্রভাবে, না, বাঙালীজাতির জীবনে আঘাতের ফলে, আশাভঙ্গের ফলে প্রৌঢ়ত্বের অভিজ্ঞতার অন্তর্মুখিতা ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছে!

মধুসূদন ও আমরা

মধুসূদনের সমাধির উপরে তাঁহার মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। কাজটি অনেক দিন আগেই হওয়া উচিত ছিল কিন্তু হয় নাই, এখন যে হইবে সেটাও মন্দের ভালো। মধুসূদনের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তাঁহার সমাধিস্তম্ভ রচিত হইয়াছিল, মৃত্যুব ঠিক পরেই হয় নাই, সেটাও মন্দের ভালো ছিল।

কবির সমাধিস্তম্ভ রচিত হইবার পরে ষাট বৎসরের বেশি অতিবাহিত হইয়াছে, এতদিন পরে তাঁহার মর্মব-মূর্তি প্রতিষ্ঠার বিশেষ কারণ থাকিলেও, একটি সাধারণ কারণ আছে বলিয়া মনে হয়।

গত ১০।১৫ বৎসরেব মধ্যে মাইকেল মধুসূদন সম্বন্ধে বাঙালীর মনে একটা বিশেষ কৌতূহল ও আগ্রহের ভাব নূতন কবিয়া দেখা গিয়াছে। এই সময়েব মধ্যে মাইকেল সম্বন্ধে জীবনী, সমালোচনা ও নাটক লিখিত হইয়াছে। কলিকাতা শহরে অন্তত দুটি নাট্যমঞ্চে মাইকেলের জীবননাট্য অভিনীত হইয়াছে, নাটক দুটি আবার অনেক দিন পাশাপাশি অবস্থিত নাট্যমঞ্চে একই সময়ে অভিনীত হইয়াছে। তার পরে কিছুদিন আগে মাইকেল-জীবনী চলচ্চিত্র হইয়া হাজার দর্শককে আকর্ষণ করিয়াছে। এখন স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিলে এ সব অল্প বিস্ময়ের ব্যাপার নয়।

মাইকেল কাব্য লিখিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্রের মতো মনোরম উপন্যাস লেখেন নাই, কিংবা রবীন্দ্রনাথের মতো সহস্র রশ্মি নিক্ষেপ করিয়াও দেশের সর্বজনীন চিত্তকে আকর্ষণ করেন নাই;

মাইকেলের কাব্য আবার দুরূহ, তাহার প্রতিষ্ঠানভূমি আধুনিক জীবন নয়; তাঁহার নাটকগুলি নামমাত্রে পরিজ্ঞাত; তাঁহার চতুর্দশ-পদী বা অন্যান্য কবিতা স্কুল-কলেজের সীমার মধ্যে আবদ্ধ; এমন ক্ষেত্রে, এমন এক কবির বিষয়ে এতদিন পরে সহসা আগ্রহের পুনরভ্যুদয় বিস্ময়কর ছাড়া আর কি! তারপরে দেশটা আবার বাঙালাদেশ! এখানে ভূততত্ত্ব (প্রাচীন ইতিহাস) ও প্রেততত্ত্ব (রাজনীতি) ছাড়া আর কোন বিষয়ে কৌতূহল জাগ্রত করা দেবতাদেরও অসাধ্য।

মাইকেল সম্বন্ধে সাম্প্রতিক কৌতূহলের একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো। এ কৌতূহল কবির ব্যক্তিত্ব ও জীবন সম্বন্ধে যেমন, তাঁহার কাব্য ও কবিকৃতি সম্বন্ধে তেমন নয়; মধুমক্ষিকা যেমন আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে, মধুচক্র তেমন করিতে পারে নাই জীবনী, নাটক ও চলচ্চিত্র, এই সত্যেরই সাক্ষ্য দিতেছে।

এর কারণ আর কিছুই নয়, কালের আবর্তনে মাইকেলের সময় আর আমাদের সময় আবার কাছাকাছি আসিয়া পড়ায়, দূরের মানুষ মাইকেল ঘরের মানুষ বলিয়া বোধ হইতেছে; পৌরাণিক বিষয়ের কবিকে প্রাত্যহিক জীবনের বন্ধু বলিয়া বোধ হইতেছে।

মাইকেলের সমকাল এবং অব্যবহিত পরবর্তীকাল তাঁহাকে সাধারণ জীবন প্রবাহ হইতে একটু বিবিক্তরূপে কল্পনা করিয়াছে। সত্যেন্দ্র দত্ত মধুসূদনকে রবি উদয়ের আগে উদিত শুক্র তারারূপে কল্পনা করিয়াছেন; মাইকেল নিজে মিল্টনের প্রসঙ্গে—তাঁহার কাব্যকে নির্জন বনের সিংহগর্জন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, মাইকেলের সমকালীনগণ তাঁহার কাব্যকেও ঐরূপে বর্ণনা করিতে পারিত। দুটি বর্ণনাতেই একটা দূরত্বের বোধ আছে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, কালের গতিকে এবং কালচক্রের গতিতে সেই দূরের মানুষ আজ ঘরের মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। কালের এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারকে যদি স্বীকার করিয়া লই, তবে মাইকেলকে ঘরের মধ্যে দেখিয়া আর বিস্ময়বোধ করিব না।

স্থূলভাবে মধুসূদনের জীবনকথা আমরা সবাই জানি। তবু দু'চারটি তথ্যের উল্লেখ প্রয়োজন। ঊনআশী বছর আগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে, তিরানব্বই বছর আগে তাঁর প্রথম বাঙালা বই প্রকাশিত হয়—আর আজ থেকে ঠিক একশ বৎসর আগে ১৮৫২ সালে তিনি মাদ্রাজ নগরে বাস করিতেছিলেন। তখনকার মাদ্রাজ বাংলাদেশ হইতে এমন বিচ্ছিন্ন ছিল যে, মাদ্রাজপ্রবাসীকে বাঙলার লোকে মৃত বা গ্রহান্তরিত বলিয়া মনে করিত; মাইকেলকেও ঐ দুটির কোন একটি মনে করিয়া তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে জ্ঞাতিরা তাঁহাব পৈতৃক সম্পত্তি ভাগজোগ করিয়া লইবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল। অর্থাৎ ১৮৫২ সালে লোকে যাঁহাকে মৃত বা বিস্মৃত মনে করিয়াছিল—তার কয়েক বৎসর পরেই দেখা গেল, তিনি সবচেয়ে স্মরণযোগ্য। প্রাচীন সাহিত্যের পয়াররূপ Gordon গ্রন্থি অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়া মাইকেল বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভ্যুদিত হইলেন—একমুহূর্তে বাংলা সাহিত্যের জন্মান্তর ঘটিয়া গেল। সাহিত্যিকের এমন পূর্ণ সচেতন অভ্যুদয় সাহিত্যের ইতিহাসে একান্ত বিরল।

মাইকেলের বাহুতে এই 'অচল-চলন' শক্তি জোগাইয়াছিল কে? তাঁহার কালের বেদনাই তাঁহার বাহুকে শক্তিমান করিয়া তুলিয়াছিল। কাল-বেদনা সেকালের আর কোন কবিকে এমন গভীরভাবে, এমন সচেতনভাবে আলোড়িত করে নাই, ইহারই অভাবে সেকালের কবিদের কাব্য, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের কাব্য আজ এমন শূন্যগর্ভ এমন ব্যর্থ বাগাড়ম্বরপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। আর মাইকেল স্বকাল হইতে জীবনরস শোষণ করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার কাব্য আজও সরস! শুধু তাই নয়, জীবনবেদনা হইতে উদ্ভূত সেই কাব্য আজ কবির উত্তরপুরুষদের জীবনবেদে পরিণত হইবার লক্ষণ দেখাইতেছে। কালধর্মের ঐক্যে মাইকেল ও আমরা সমকালীন, কালবেদনার পীড়নে মাইকেল ও আমরা সহব্যথী; ইতিহাসের শ্লেষে এক শতাব্দী অতিক্রম করিয়া মাইকেল ও আমরা আজ করমর্দন করিতেছি।

মাইকেলের কাল বলিতে ঠিক কোন্ সময়টিকে বুঝিব? ১৮৪৩ সালে তাঁহার খৃষ্টধর্ম গ্রহণের সময়টাকে কেন্দ্র করিয়া বোঝা যাক্। এই সময়ের লক্ষণ কি? নাস্তিক্যবুদ্ধি এবং এক প্রকার মেটিরিয়ালিজমের প্রতি আসক্তিই উক্ত সময়ের বিশেষ লক্ষণ। আর এ দুয়ের পরিণাম হইতেছে পূর্বতন moral value সমূহের পরিবর্তন। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের এই সময়টারও বিশেষ লক্ষণ ঐ দুটি গুণ—যাহার ফলে আর একবার moral value পরিবর্তিত হইতে শুরু করিয়াছে। আর যুগলক্ষণের সাম্যে মধুসূদন ও আমরা কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি—তাই তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রতি, জীবনকাহিনীর প্রতি এবং অনেক পরিমাণে তাঁহার কবিকৃতির প্রতি নূতন করিয়া আগ্রহ দেখা দিয়াছে। মাইকেলকে সম্যকভাবে বুঝিবার আমাদের যে সুযোগ আসিয়াছে—এমন আর আগে আসে নাই।

হিন্দু কলেজের সেই যুগে অনেক শিক্ষিত মেধাবী বাঙালী ছাত্র খৃষ্টান হইয়াছিল—এই ঘটনা হইতে পরবর্তীকালের ধারণা হইয়াছে যে, সে যুগের শিক্ষা খৃষ্টানধর্মের অনুকূল ছিল। ডেভিড হেয়ার নাস্তিক ছিলেন, তাঁহার কয়েকজন ছাত্র এক পাদ্রীর নিকট হইতে বাইবেল উপহার লইযাছিল জানিতে পারিয়া তিনি তাহাদের ডাকিয়া আনিয়া বেত মারিয়াছিলেন। নাস্তিক অপবাদে হেয়ার সাহেব খৃষ্টানী গোরস্থানে স্থান পান নাই—কলেজ স্কোয়ারে সমাহিত হইয়া আছেন।

ডিরোজিও ঠিক নাস্তিক না হইলেও সন্দেহবাদী ছিলেন, একথা তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তরে তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

আর রিচার্ডসন আর যাই হোন ভক্ত খৃষ্টান ছিলেন না। ইঁহারা তিনজনেই ছিলেন সেকালের ইংরাজি শিক্ষানবীশ বাঙালী সমাজের বুদ্ধির কর্ণধার।

ফরাসী বিপ্লবের বাণী ইংরাজের হাত ঘুরিয়া আমাদের সে যুগের জীবনবাদ তৈয়ারি করিয়া তুলিয়াছিল—এ সত্যটি এখনো আমরা

সম্পূর্ণ স্বীকার করি নাই বলিয়াই এই ভ্রান্তি ঘটে। আর ফরাসী বিপ্লবের বাণী সেকালের চোখে ছিল রাষ্ট্রে ও ধর্মে সর্বজনীন নাস্তিক্যের বাণী। এই নাস্তিক্যের আবহাওয়া মাইকেলের কাব্যের পরিমণ্ডল। সেইজন্য তাহার রাম ও রাবন কেহই বুঝিতে পারে নাই যে, কেন তাহাদের এ দুর্দশা। অন্যথা একথা না বুঝিবার নয়।

তারপব মেটিরিয়ালিজ্‌ম্‌-এর প্রতি আসক্তি। এখানেও দেখি সেই ফরাসী বিপ্লবের দূরাগত প্রভাব। মাইকেল এক মোহর দিয়া চুল ছাঁটিতেন; না গুনিয়া বকশিস দিতেন; এবং চল্লিশ হাজার টাকার কমে ভদ্রভাবে জীবনযাপন করা যায় না বলিতেন। স্বর্ণলঙ্কেশ্বর রাবনের প্রতি তাঁহার আগ্রহ এবং ভিখারী রামের প্রতি তাঁহার তাচ্ছিল্যের ভাব অকারণ নয়। তাঁহার সমস্ত জীবন স্বর্ণমৃগ অনুসরণ করিবার শোচনীয় কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এই যে অপরিমিত ধনাসক্তি তাহা মেটিরিয়ালিজমের একটি প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়।

ফরাসীবিপ্লব নবোত্থিত মধ্যবিত্ত সমাজের রামায়ণ-কাহিনী। সার্থক, স্বপ্রতিষ্ঠ, বিত্তবান মধ্যবিত্তের অভ্যুদয় ফরাসীবিপ্লবের পরিণাম। ইহার প্রতিনিধিস্থানীয় অগ্রদূত ভল্‌টেয়ার। প্রভূত ধন (সব সময়ে সদুপায়ে নয়, চোরাবাজারী ব্যবসায় অন্যতম উপায়) তিনি উপার্জন করিয়াছিলেন। এই সার্থক মধ্যবিত্তের প্রসাদলাভের আকাঙ্ক্ষায় ফ্রেডরিক দি গ্রেট, ক্যাথরিন দি গ্রেট প্রভৃতি অভিজাত রাজা ও রানীগণ সর্বদা উন্মুখ থাকিতেন। ফরাসীবিপ্লবের এই বাণীটিও ইংরেজী সাহিত্যের ও ইংরাজ মনীষিগণের মাধ্যমে তৎকালীন ইংরাজিশাসিত বাঙ্গালী সমাজকে প্রভাবিত করিয়াছিল। মধুসূদনকে এই দলের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

এখন এ দুয়ের পরিণাম পূর্বতন moral valueর পরিবর্তন। বাল্মীকির পরে ও মধুসূদনের আগে যতজনে রামায়ণ কাহিনী লিখিয়াছেন সকলেরই moral value এক এবং অপরিবর্তিত। মাইকেলের বেলায় আসিয়া দেখি সব ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। রাম ছোট আর রাবন বড় হইয়াছে; মাইকেলের চোখে রাম ও তাঁহার

অনুচরগণ, 'Rama and his rabbles'; আর 'Indrajit is a grand fellow!'

ফরাসীবিপ্লবজাত নাস্তিক্যবুদ্ধি এবং মেটিরিয়ালিজমের পরিণাম একপ্রকার অনিশ্চয়তা—আর এই অনিশ্চয়তার সুযোগ ও রন্ধ্র দিয়া আসিয়াছে ডিক্টেটরের দল, নেপোলিয়ান যাহাদের প্রথম। অনিশ্চয়তাভীত অসহায় মানুষের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ডিক্টেটর-রূপে হাতুড়ের দল আসিয়াছে—বলিয়াছে যে, একমাত্র তাহারাই এই ব্যাধির নিরাকরণ করিতে সক্ষম। আমাদের দেশে ডিক্টেটরগণের প্রথম মেঘনাদবধ কাব্যের রাবন। তাহার পরিণাম শুভ নয়—কোনো ডিক্টেটরের পরিণামই শুভ হইতে পারে না। কিন্তু তাহাদের অনিবার্য পতনের আগে সমস্ত সমাজকে তাহারা টানিয়া নামাইয়া দিয়া যায়; রাবনের লঙ্কা ধ্বংস হইয়াছে, কোন লঙ্কাই চিরস্থায়ী হইবে না; প্রত্যেক বিপ্লবের মধ্যেই প্রতিবিপ্লবের (Counter Revolution) বীজ নিহিত।

মাইকেলের যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ফরাসীবিপ্লবের যে স্থান, আমাদের যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সেই স্থান রুশবিপ্লবের। দুয়েরই মূল বাণী নাস্তিক্যবুদ্ধি এবং মেটিরিয়ালিজম্; দুয়েরই পরিণাম অনিশ্চয়তা ও ডিক্টেটরশিপ; দুয়েরই ফলশ্রুতি moral valueর অবনমন। রুশ-বিপ্লবের লাল আলোর শিখায় মেঘনাদবধ কাব্য পড়িলে নূতনতর অর্থ পাইবার সম্ভাবনা। এখানেই মেঘনাদবধ কাব্যের ক্লাসিক্যাল অস্তিত্ব। সাহিত্যের ধ্রুবপদ অংশ, যাহাকে বলা হয় classics, তাহার বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেক যুগ তাহাতে নূতন অর্থ আবিষ্কার করে। মেঘনাদবধ কাব্যেও নূতন অর্থ পাঠ করিতে হইবে—সে অর্থ আমাদের জীবনের একান্ত সন্নিহিত। মার্ক্সীয় সমালোচকগণের শনির দৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপরে পড়িয়াছে, মাইকেলের উপরে এখনো পড়ে নাই। আশা করি এবারে পড়িবে। কিন্তু অন্ধের আবার দৃষ্টি কি?

আরও একটি কারণে মেঘনাদবধ কাব্য একালের পাঠকদের ভালো লাগিবার কথা। মেঘনাদবধ প্রৌঢ় অভিজ্ঞতার কাব্য। কি ব্যক্তির,

কি সমাজের অল্পবয়সে এ কাব্য ভালো লাগে না। কিন্তু বয়স যতই বাড়ে, অদৃষ্টের চড়-চাপড়ে সর্বাঙ্গে যতই টোল পড়িতে থাকে, নিয়তির গতি যতই দুর্জয় এবং নিয়তির ফাঁস যতই দুর্বোধ হইয়া ওঠে, সমস্ত দম্ভকেই যখন অকারণ বলিয়া মনে হয়, যখন মন বলিতে থাকে :

"হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুমদামসজ্জিত, দীপাবলি-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিস
এ মোর সুন্দর পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি;
নীরব ববাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?"

এ তো কেবল রাবনের বিলাপ নয়, এ যে হতাশ, শোকাতুর, ভাগ্যহত মানুষেব চিরকালীন খেদোক্তি। আব বিশেষভাবে এ খেদোক্তি নানাভাবে বিড়ম্বিত বর্তমান বাঙালী সমাজের! অল্প বয়সে তাঁর অমিত্রাক্ষরেব প্রশান্ত বিষাদপূর্ণ ছন্দ-স্পন্দ ভালো লাগিবার কথা নয়। জীবনে আঘাতের, আশাভঙ্গের অভিজ্ঞতা বাড়িলে তবেই সেই ভাঙা দরজা দিয়া তাঁহার কাব্যপ্রতিমা শূন্য হৃদয়ে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়। বাঙালীসমাজের সমষ্টিগত জীবনে আজ সেই আশাভঙ্গের ও প্রৌঢ়ত্বের অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে দেখা দিতেছে—মধুসূদন ও তাঁহার কাব্য আজ তাই এমন ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনা

গণিতে উদাসীন সাহিত্যামোদী মধুসূদন একদিন ক্লাসে একটি দুরূহ অঙ্কের সমাধান করিয়া সহপাঠী ভূদেবকে বলিলেন, দেখো শেক্সপীয়র ইচ্ছা করলে নিউটন হতে পারে কিন্তু নিউটনের পক্ষে শেক্সপীয়র হওয়া অসম্ভব।

তার পরে বলিলেন, কিন্তু আমার অঙ্ক কষা এই পর্যন্তই—বলিয়া তিনি একখানি সাহিত্যের পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন।

এখন ছাত্রদের মধ্যে অনুপস্থিত নিউটনের পক্ষ গ্রহণ করিবার মতো দুঃসাহসী ব্যক্তি না থাকায় নিউটনের মামলা একতরফা ডিসমিস হইয়া গেল। কিন্তু মামলাটি 'সত্যই কি সংক্ষেপে ডিসমিস-যোগ্য! বৈজ্ঞানিকের পক্ষে কি কবি হওয়া একেবারেহ অসম্ভব? পৃথিবীর সাহিত্যের ও বিজ্ঞানের ইতিহাস সন্ধান করিলে নিশ্চয় দেখা যাইবে যে, কবি ও বৈজ্ঞানিকে ব্যবধান দুস্তর নয়—অর্থাৎ প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রখ্যাত কবি হইয়া না উঠিলেও, কখনো কখনো বৈজ্ঞানিকের হাতে কবির কলম স্বচ্ছন্দে চলিয়াছে। তাহার বেশি আশা করা অন্যায় হইবে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র কবি ও বিজ্ঞানীর ব্যবধান-দুস্তরতায় বিশ্বাসী নন। তাঁহার মতে কবি ও বিজ্ঞানীর লক্ষ্য এক—সত্যানুসন্ধান। তবে পথ স্বতন্ত্র বটে। বিজ্ঞানী প্রমাণ ও যুক্তির খুঁটি ধরিয়া ধরিয়া চলেন, কবি চলেন অনুভূতি ও অনুমানের ইঙ্গিতে। কল্পনা দুজনেরই প্রেরণাদাত্রী; এখানেই নিউটনে ও শেক্সপীয়রে ঐক্য।

তিনি স্পষ্টতঃ বলিতেছেন—"কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিন রাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানবভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।"

এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলিয়াছেন—"সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইজন্য প্রতিদিন দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব রসায়নতত্ত্ব প্রকৃতিতত্ত্ব আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে। বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না।"

এই মন্তব্যটি কাহার কলমে লিখিত—কবির না বৈজ্ঞানিকের! রবীন্দ্রসাহিত্য হইতে অনুরূপ বা সমান্তরাল মন্তব্য খুঁজিয়া বাহির করা মোটেই অসম্ভব নয়। তাই বলিয়াছিলাম কবির কলমে ও বিজ্ঞানীর কলমে আড়াআড়ি নাই, প্রচ্ছন্ন সহযোগিতাই আছে—তবে ক্ষেত্র ভিন্ন বলিয়া সেটা সব সময়ে ধরা পড়ে না।

জগদীশচন্দ্রের কলম কখনো কখনো কবির চালে, অনেক সময়েই সাহিত্যের চালে, চলিয়াছে। আবার তাঁহার হাতে বিজ্ঞানের যন্ত্রগুলি খুব সম্ভব অনেক সময়ে কবির চিহ্নিত পথে চলিয়া কবি ও বিজ্ঞানীর

অচ্ছেদ্যতা প্রমাণ করিয়াছে। তাঁহার মধ্যে একজন প্রচ্ছন্ন কবি না থাকিলে জড়বিজ্ঞানের পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ জড় ও চৈতন্যের সুনির্দিষ্ট বেড়া ভাঙিয়া দিয়া, জড় ও চৈতন্য যেখানে একাকার হইয়া গিয়াছে সেই নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিতেন না। তাঁহার ভিতরকার প্রচ্ছন্ন কবিই খুব সম্ভব আর-একটি প্রদীপ্ত কবিপ্রতিভাকে কাছে টানিয়া পরম বান্ধব করিয়া তুলিয়াছিল। তখন দেখা গেল যে, অন্তরের মতো বাহিরেও কবি ও বিজ্ঞানীর সান্নিধ্য অতি ঘনিষ্ঠ, একের মন হইতে অপরের মনে এক ধাপের ব্যবধান। অন্তরে বাহিরে কবি ও বিজ্ঞানী প্রতিবেশী।

২

মাতৃভাষায় প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র যথেষ্ট বাংলা রচনা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। অব্যক্ত নামে প্রকাশিত প্রবন্ধসমষ্টিই তাঁহার লিখিত একমাত্র বাংলা গ্রন্থ। কুড়িটি প্রবন্ধের মধ্যে নিছক সাহিত্যগুণ-সম্পন্ন রচনার সংখ্যা সামান্য কয়টি মাত্র। এখন, এই ক'টি অবলম্বনে আলোচনায় বিপদ আছে। প্রথমতঃ লেখকের প্রতি অবিচার হইতে পারে, বিশেতঃ সমালোচক যেখানে নিশ্চিত যে রচনায় প্রকাশিত সাহিত্যগুণের চেয়ে লেখকের অন্তর্নিহিত সাহিত্যিক শক্তি অনেক বেশি। কিন্তু এই অদৃশ্য অনেক-বেশিটাকে তথ্যপ্রমাণাদিযোগে অপরের বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তোলা সব সময়ে বড় সহজ নয়। দ্বিতীয়তঃ এমন আলোচনা অনেক সময়েই সম্ভাবনার বিবরণ হইতে বাধ্য। যে-সব সাহিত্যিক গুণের সম্ভাবনা তাঁহার মধ্যে ছিল সুযোগের অভাবে বা অন্য কারণে তাহা প্রকট হইয়া ওঠে নাই, এক-আধটা সূক্ষ্ম নিরিখ মাত্র রাখিয়া গিয়াছে—সে নিরিখ সমালোচকের চোখেই সব সময়ে পড়িতে চায় না, পাঠকের চোখে তুলিয়া ধরা আরো কত কঠিন। এমন ক্ষেত্রে লেখকের জীবন ও অন্য কীর্তির সাক্ষী-গুলাকে তলব করিতে হয়। বর্তমান প্রসঙ্গে তাহাও সহজ নয়। তাঁহার বৈজ্ঞানিক কীর্তি বর্তমান সমালোচকের জ্ঞানের অনায়ত্ত।

কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে তাঁহার বৈজ্ঞানিক কীর্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিলে তাঁহার সাহিত্যকীর্তিকে উজ্জ্বলতর ও স্পষ্টতর করিয়া তোলা যাইত। বাকি থাকিল আচার্যের জীবনের, অর্থাৎ ঘটনাপ্রবাহ ও প্রভাবের, সাক্ষ্য। সেটাকে কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিব।

৩

সে যুগে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই পরাধীনতার গ্লানি তীব্রভাবে অনুভব কবিতেন। ইহা ছিল একটি সর্বভারতীয় অনুভূতি। উনিশ শতকের বিচিত্র কর্মোদ্যমের মূলপ্রেরণা ছিল এই অনুভূতি। এই অনুভূতির প্রেরণায় তৎকালীন বাঙালী মনীষীগণ কর্মের ও জ্ঞানের বিচিত্র পথে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বাংলাদেশে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ ইহা সাহিত্যিক রূপ লাভ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রভৃতির সকলেরই সাহিত্যসৃষ্টির মূলে এই প্রেরণা, পরাধীনতার গ্লানিই মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জাগাইয়াছিল এই মনীষীগণের মনে। পরাধীন জাতির হাতে চরিতার্থতা লাভের অন্য অস্ত্র ছিল না। ত্রিপুরারাজের শীলমোহরে বাংলাভাষা লক্ষ্য করিয়া বিদ্যাসাগর সোৎসাহে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—ওরে, আমার মাতৃভাষা রাজভাষা। ইহাই ছিল সকলের মনের অনুচ্চারিত ভাব। মাতৃভাষাকে হয়তো রাজভাষা করা যাইবে না—কিন্তু তাহাকে চিত্তরাজ্যে রাজরাজেশ্বরী করিয়া তুলিতে বাধা কী।

বলা বাহুল্য জগদীশচন্দ্র এই গ্লানি তীব্রভাবে অনুভব করিতেন। এখন, এই ভাবের অনুষঙ্গরূপে তাঁহার মনে আসিয়াছে মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ, মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ, দেশের অতীত ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ-সঞ্জাত কৌতূহল। তার পরে তাঁহার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন কবিস্বভাব ছিল তাহা তাঁহাকে একপ্রকার অতীন্দ্রিয়বাদিতা দিয়াছিল। বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যকে দেখিবার আগ্রহে ইহার পরিচয় পাই—পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে কবি ও বিজ্ঞানীর ঐক্য প্রদর্শন উপলক্ষে তিনি ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর সে যুগের একটি সাধারণ

লক্ষণ ছিল আধ্যাত্মিক চেতনা। জগদীশচন্দ্রও ইহার অতীত ছিলেন না। সর্বশেষে উল্লেখ করিতে হয় তাঁহার সামাজিক মনে কৌতুক-পরায়ণ হাস্যোজ্জ্বলতা।

এখন তাঁহার রচনার আলোচনায় নামিলে দেখা যাইবে যে, পূর্বোক্ত কয়েকটি সূত্রই অল্পবিস্তর চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে তাঁহার সাহিত্যে। সে-সব চিহ্ন অনেক স্থলেই ক্ষীণ, অনেক স্থলেই অনুমান করিয়া লইতে হয়—প্রায় সর্বত্রই সম্ভাবনার গুহা-নিহিত। সেইজন্য পূর্বাহ্ণেই স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে, তাঁহার রচনার ইতিহাস অনেক পরিমাণেই সম্ভাবনার বিবরণ—অর্থাৎ ইহা যতটা সাহিত্যের আলোচনা তার চেয়ে বেশি একটি সাহিত্যিক মনের আলোচনা।

৪

প্রথমে অগ্নিপরীক্ষা প্রবন্ধটি লওয়া যাক। মাতৃভূমি উদ্ধারের উপায় যখন থাকে না তখন অপরকে মাতৃভূমি-রক্ষার্থ বীরের মতো প্রাণত্যাগ করিতে দেখিলে বীরের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়। অগ্নিপরীক্ষা সেইরকম একটি উৎসাহবর্ধক কাহিনী। গোর্খা-সেনাপতি বলভদ্র সত্তর জন বীর সঙ্গী-সহকারে মাতৃভূমিরক্ষার্থে অসি হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। "লেখক নেপালের সীমান্ত প্রদেশে ভ্রমণ কালে এই ঐতিহাসিক ঘটনা সংগ্রহ করেন।"

যে পরাধীনতার গ্লানিময় অনুভূতির কথা পূর্বে বলিয়াছি এই কাহিনীটি রচনার মূলে তাহাই সক্রিয়। কিন্তু মনীষীর মন গ্লানিতেই মুহ্যমান হয় নাই—নূতন প্রেরণার বশে চালিত হইয়াছে।

মাতৃভাষায় লিখিতে হইবে—কিন্তু কেন কিরূপে? "এ সম্বন্ধে ২৭ বৎসর পূর্ব্বের কয়েকটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। কোনদিন লিখিতে শিখি নাই, কিন্তু ভিতর হইতে কে যেন আমাকে লিখাইতে আরম্ভ করিল। তাঁহারই আজ্ঞায় 'আকাশস্পন্দন' ও 'অদৃশ্য আলোক' সম্বন্ধে লিখিলাম। পরে লিখাইল, 'উদ্ভিদজীবন মানবীয় জীবনেরই ছায়ামাত্র'। জীবন সম্বন্ধে বেশি কিছুই জানিতাম না। কাহার

আদেশে এরূপ লিখিলাম?" আজ্ঞাদাত্রী কে? মাতৃভাষা, না মাতৃভূমি, না বিধাতা? সেকালের লোকের মনে তিনে মিলিয়া এক ছিল।

পরাধীনতার গ্লানিবোধে মানুষের মন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না—অতীতকালে যাত্রা করিয়া প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে গৌরব ও শিক্ষা আদায় করিয়া লয়, আবার ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করিয়া প্রতিকারের উপায় সন্ধান করে। জগদীশচন্দ্রের রচনায় এই দ্বিমুখী প্রক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়।

অজন্তাগুহার চিত্রাবলী দর্শনে তিনি একাধারে শিক্ষা ও শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। "আর একখানি চিত্রে রাজকুমার প্রাসাদ হইতে জনপ্রবাহ নিরীক্ষণ করিতেছেন। ব্যাধিজর্জরিত, শোকার্ত মানবের দুঃখ তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছে। কি করিয়া এই দুঃখপাশ ছিন্ন হইবে, তিনি আজ রাজ্য ও ধনসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সন্ধানে বাহির হইবেন। আজ মহাসংক্রমণের দিন। সম্মুখে যতদূর দেখা যায়, ততদূর জনমানবের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে অকাট্য ব্যবধান, পারাপারের কোন সেতু নাই। গুহার অন্ধকারে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা যেন কোন স্বপ্নরাজ্যের পুরী। অশান্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিলাম।"

এখন, এই অশান্তি দূর হইল কিরূপে? তিনি বলিতেছেন যে, অন্যত্র বুদ্ধের আর দুইখানি চিত্র দেখিলেন। একখানিতে জননী পুত্রের মঙ্গলের জন্য বুদ্ধের আশীর্বাদ যাচ্ঞা করিতেছেন, অন্যখানিতে সুজাতা উপবাসক্লিষ্ট বুদ্ধকে পরমান্ন নিবেদন করিতেছেন। "দেখিতে দেখিতে অতীত ও বর্তমানের মাঝখানে মমতা ও স্নেহরচিত একটি সেতু গঠিত হইল এবং সেকাল ও একালের ব্যবধান ঘুচিয়া গেল।" সজীব মাতৃহৃদয় হইতেছে এই সেতু।

'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' জগদীশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই অত্যাশ্চর্য রচনাটি বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের একটি পরম সম্পদ। কবিহৃদয়ের ইহা অনবদ্য সৃষ্টি। কলিকাতায় ভাগীরথীপ্রবাহ তাঁহার

মনে প্রশ্ন জাগাইয়াছে, নদী তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? উৎসের সন্ধানে তিনি স্রোতের উজানে যাত্রা করিয়া গঙ্গোত্রীতে পৌঁছিয়াছেন, সেখানে অতীতকাল তুষারে সংহত। আবার সেই স্রোত অনুসরণ করিয়া গঙ্গাসাগরে পৌঁছিয়াছেন, সেখানে অনাগত ভবিষ্যৎ রহস্যে গম্ভীর। মাঝখানে বর্তমান কাল, কলিকাতা নিতান্ত প্রগল্‌ভ। এই ভাবে ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে তাঁহার ত্রিকালদর্শন ঘটিয়া পুণ্য প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই শ্রেণীর রচনা দেখিয়া দুঃখ হয় যে, কেন তাঁহার লেখনী আরো বহুবিধ সৃষ্টির সুযোগ পায় নাই। মনে সন্দেহ থাকে না যে, তাঁহার প্রতিভা সাহিত্যের পথে চলিলে বাংলা সাহিত্যের একটি অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করিয়া যাইতে পারিত।

জগদীশচন্দ্রের কৌতুকপরায়ণ সামাজিক মনের উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত *On the Edges of Time* নামে পুস্তকে মজলিশী জগদীশচন্দ্রের একটি চিত্র পাওয়া যাইতেছে। রথীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—Jagadish Chandra Bose had a wonderful fund of interesting stories, some very amusing, of the many lands he had visited and personalities he had met. He could go on telling them for hours and days together, yet one would never get tired of listening to him for he could always make the most trivial facts interesting, and his humour was so refreshing. He could also laugh, so few people can laugh well and at the proper time and place. I would greatly miss him when he went away.…

অব্যক্ত গ্রন্থের 'পলাতক তুফান' নামে রচনাটি একটি মজলিশী মনের সৃষ্টি। রচনাটিতে যে সার্থক হাস্যরস আছে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যে বিচিত্র ব্যাখ্যা আছে, সর্বোপরি যে সাহিত্যিকগুণ আছে তাহা যে-কোনো প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের ঈর্ষার স্থল।

সর্বশেষে তাঁহার আধ্যাত্মিক চেতনার উল্লেখ করিতে হয়। যুক্তকর, ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে, নিবেদন, হাজির প্রভৃতি রচনা সেই অরূপ রশ্মিতে উজ্জ্বল।

"জীবনের যখন পূর্ণশক্তি তখন কোলাহলের মধ্যে তোমার নির্দেশ স্পষ্ট করিয়া শুনিতে পারিতাম না। এখন পারিতেছি; কিন্তু সব শক্তি নির্জীব হইয়া আসিতেছে। একদিন তোমার হুকুমে মাঝখানের যবনিকা ছিন্ন হইবে, মৃত্তিকা দিয়া যাহা গড়িয়াছিলে তাহা ধূলি হইয়া পড়িয়া রহিবে। কি লইয়া সে তখন তোমার নিকট উপস্থিত হইবে? অল্পই তাহাব সুকৃতি, অসংখ্য তাহার দুষ্কৃতি, তবে বলিবার কি আছে? কোন্‌টা সুমতি আর কোন্‌টা দুর্মতি, এই ধান্ধাতেই জীবন কাটিয়াছে। সাফাই করিবার কথা যখন কিছুই নাই তখন তোমার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া সে কেবল বলিবে—আসামী হাজির।"

আসামী অনেক কাল হইল তাঁহার পদপ্রান্তে হাজির হইয়াছেন আর আমরা নিশ্চয় জানি তিনি যে কেবল বেকসুর খালাস পাইয়াছেন তাহা নয়, মহাবিচাবকের পাদপীঠতলে উপবেশনের মহার্ঘ্য আসনটি লাভ করিয়াছেন। 'তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা,'— পার্থিব সকল অতৃপ্তিব পবিণাম যে মহাতৃপ্তি তাহা লাভ করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, জগদীশচন্দ্র মাতৃভাষার মন্দিরপ্রাঙ্গণে অনেকগুলি সম্ভাবনাব দীপ জ্বালিয়াছিলেন। বিধিনির্দিষ্ট প্রেরণা তাঁহাকে অন্যপথে চালিত না করিলে—এই সম্ভাবনার দীপগুলি উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল হইয়া বাংলা সাহিত্যাকাশে একটি অক্ষয় সপ্তর্ষিমণ্ডল রচনা করিতে পারিত—সেই শক্তি, সেই কবিমন, সেই সরস প্রসাদগুণ তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

আধুনিক কাব্য

কিছুকাল আগে এক প্রসিদ্ধ বাঙালী সাহিত্যিক আধুনিক কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-সমসাময়িক অথচ "রবীন্দ্রোত্তর" নয় এমন কয়জন কবির কাব্যের নিন্দা করিয়াছিলেন। তিনি কবিদের নাম করেন নাই, কিন্তু কাহারো বুঝিতে অসুবিধা হয় নাই; আমিও নাম করিব না, আশা করি কাহারো বুঝিতে অসুবিধা হইবে না। ঢালাও নিন্দা করিবার যা বিপদ, এই প্রবন্ধে তাহা ঘটিয়াছিল। মন্তব্যের ঘটোৎকচের চাপে শত্রুমিত্র নিরপেক্ষভাবে চাপা পড়িয়াছিল। লেখক নিন্দনীয়ের নিন্দা উপলক্ষ্যে প্রশংসনীয়কেও নিন্দা করিয়াছিলেন। কিংবা এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে এই সব কবিদের কাব্যে প্রশংসার যোগ্য কিছুই তাঁহার চোখে পড়ে নাই। লেখক "রবীন্দ্রোত্তরগণকে" প্রশংসা করিতে চাহিয়াছেন, এবং তাহার সুগম পথটি বাছিয়া লইয়াছেন পূর্বোক্ত কবিগণের নিন্দা করিয়া। যেখানে একজনকে খাটো না করিলে অপরকে বড় করা যায় না—সেখানকার প্রকৃতি বড় বিচিত্র। নিন্দা কি প্রশংসার যথার্থ পটভূমি?

লেখক বলিয়াছেন যে, কালের বিচারে এই সব কবির একটি কবিতাও টিকিবে না। তাহাতে কি বিপরীতটা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়? কালের বিচারে তথাকথিত "রবীন্দ্রোত্তরগণের" কবিতা টিকিবে? যদি সত্য তাহাই হয়, তবে কালের উপরেই সে ভার ছাড়িয়া দেওয়া হোক না কেন। কালের মাপকাঠি চলনার দায়িত্ব গ্রহণ করা কি বুদ্ধির লক্ষণ? ভবিষ্যতে কি হইবে ঠিক কেহ জানে না, কিন্তু অতীতে

কি হইয়াছে সেই সূত্রে তাহা কতকটা অনুমান করা একেবারে অসম্ভব নয়। সাহিত্যে কি টিকিয়া আছে দেখিয়া অনুমান করিতে পারি সাহিত্যে কি টিকিয়া থাকিবে।

পূর্বোক্ত কবিগণের পক্ষে ওকালতি করিতে চাহি না। তাঁহাদের ক্ষমতা ন্যূনতাসম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়াও বলা চলে যে, তাঁহারা কাব্যের বিষয়-নির্বাচনে বড় ভুল করেন নাই। তাঁহারা যদি কৃষাণীর দুঃখ দেখিয়া থাকেন তবে দরদী মানুষের চোখেই দেখিয়াছেন, সে উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক মতবাদের দূরবীণ কষেণ নাই। তাঁহারা যদি দামোদর নদের বর্ণনা করিয়া থাকেন, তবে তাহার বিচিত্র প্রকৃতির বর্ণনাই করিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্যে D.V.C. পরিকল্পনার আয়ব্যয়ের নজির উদ্ধার করেন নাই। যে-সব বস্তু মানুষের নিত্যকার সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িত, দীর্ঘকালের মানবসাহচর্যে মানুষের মনে যাহাদের বনিয়াদ পাকা, সুখদুঃখদায়ক যে-সব ঘটনা নিত্য ঘটিতেছে এবং চিরকাল ঘটিবে, তাহাই এই সব কবিদের কাব্যের ভিত্তি। তাঁহাদের শিল্পশক্তি প্রচুর না হইতে পারে, তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা না থাকিতে পারে, তাঁহাদের আবেগে তীব্রতা না থাকিতে পারে—কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান তাঁহাদের কখনো পরিত্যাগ করে নাই; তাঁহারা কাব্যের রাজ্যে শিয়ালের ঠ্যাং বলিতে বটের শিকড় ধরেন নাই; কাব্যের বিষয়-নির্বাচনে তাঁহারা ভুল করেন নাই।

সংসারে কাব্যের বিষয় অগণ্য নয়, নিতান্তই সামান্য, আর সেগুলি সমান সংখ্যায় রহিয়াছে; হোমারের সময়েও ছিল, হুমায়ুন কবীরের সময়েও আছে; বাল্মীকির সময়েও ছিল, বুদ্ধদেব বসুর সময়েও আছে। দান্তে বলিয়াছেন, কাব্যের বিষয়—War, Love, God; গ্রীকরা মনে করিত—Love, Strife, Death; উহার সঙ্গে মৃত্যু-পরবর্তী রহস্যকে ধরা যাইতে পারে। এইগুলিই কাব্যজগতের ধ্রুবপদ। গৌণ বা অস্থায়ী অনেক কিছু হইতে পারে, কিন্তু সে সমস্তই মূল তানের অনুগত হইয়া আসিবে, নতুবা নিছক পাগলামি বলিয়া মনে হইবে। একালের 'আধুনিক' কবিগণ সেকালের

রোমান্টিক কবিগণকে নিতান্তই ভ্রান্ত মনে করে। কিন্তু একটা মূল বিষয়ে দুই দলে মিল দেখিতে পাই। দুই দলেই মনে করেন যে, কাব্যে বিষয়টা নিতান্তই গৌণ, প্রেরণা ও অনুভূতিই সব। প্রেরণা ও অনুভূতি দুইই ক্ষণস্থায়ী, তার উপরে অনিশ্চিত, এ হেন পদার্থের উপরে নির্ভর করিলে পরবশ হইয়া পড়িতে হয়; জোয়ারের উপরে নির্ভর করিয়াও নৌচালনা সম্ভব, কারণ জোয়ারও একটা নিয়মের বশ, কিন্তু প্রেরণা কখন্ যে আসিবে, অনুভূতি কখন্ যে মাথা চাড়া দিবে, পিতামহ ব্রহ্মাও বলিতে পারেন না। কাব্যজগতে যাহার মন্ত্রসিদ্ধি ঘটিয়াছে সেই Prospero ইচ্ছামাত্র Ariel-কে তলব করিতে পারে, কিন্তু সেরূপ মন্ত্রসিদ্ধের সংখ্যা স্বভাবতই অল্প। বিষয়-নির্বাচনে ভুলের ফলেই, ব্যক্তিগত প্রতিভাব মহনীয়তা সত্ত্বেও উনবিংশ শতকের ইংরাজী বোমান্টিক কবিতা এমন অসম্পূর্ণ, এমন অতৃপ্তিকর। আবার বিষয়-নির্বাচনের ভুলের ফলেই--কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিভারও অভাব নাই—আধুনিক কাব্য, এ দেশে ও বিদেশে, বিদেশে বলিয়াই এদেশে, স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি কবিতে পারিতেছে না। যে শক্তি কঠিন শ্বেতপাথরে আরোপিত হওয়া উচিত, তাহা মেঘের গায়ে, জলের উপরে, বালুর পিঠে আরোপিত হইয়াছে; এখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুস্তিকার পৃষ্ঠায় এবং সভার হ্যাণ্ডবিলে ও প্রচারপত্রে অঙ্কিত হইতেছে। সম্ভাবনার অপঘাতমৃত্যু মোটরচাপার ভয়াবহ সংখ্যাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

কালের বিচারে কি টিকিবে জানি না, কিন্তু এটুকু জানি যে, কালের বিচারে গৌণবস্তু-আশ্রয়ী রচনার স্থান হয় না—আর স্থান হয় না Abnormal বা অস্বাভাবিক বস্তুর। বালুর ঘর বা পাঁচ ঠ্যাঙের গোরু ক্ষণকালের তাজ্জব, চিরকালের বাস্তব নয়। প্রাগৈতিহাসিক গুহাগুলি এখনো টিকিয়া আছে, বালুর ঘরের স্থায়িত্ব একটা ভাটার কাল।

এখন, একশ বছর পর পর কাব্যের ঝাড়াই-বাছাই হয় ধরিয়া লইলে (এই সান্ত্বনা, তখন বর্ত্তমান লেখক, পাঠক ও পূর্ব্বোক্ত

সমালোচক কেহই থাকিবে না) দেখা যাইবে যে উক্ত লেখকের উদ্দিষ্ট পাঁচ ছয় জন কবির কাব্য হইতে যে কবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী-সম্পদরূপে চিহ্নিত হইবে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত সানান্য নয়। আমার বিশ্বাস "রবীন্দ্রোত্তরগণের" মধ্য হইতে অপর যে কোন পাঁচ-ছয় জনকে বাছিয়া লইলে তাহাদের স্থায়ী কবিতার সংখ্যা তুলনায় অনেক কম হইবে।

"অবশ্য বুঝেছি আজ এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই মেকী
কারণ অন্বয় ব্যতিরেকী
সত্য মিথ্যা ভালো মন্দ, সুন্দব কুৎসিত,
এবং সে-নিত্যবিপবীত
দ্বন্দ্ব সমাসেব সঙ্গে তুলনীয় মেরুবিপর্যয়
বিকল্প স্বভাবক্ষেত্রে।"

কিংবা—

"সোনা বানাই। সাঁকোব বাঁ পাশে গয়না
কাচেব বাক্সে, জানালায় দ্রষ্টব্য; জানলাব উপর ময়না,
বেগে ওঠে তোমাদেব ভিড়ে, ছোলা, বলো—'রাধে
বাধে', 'কেষ্ট কেষ্ট'—বল্‌তে বাধে
গলিতে, তোমাদের অতীব নোংবা গলিতে"

কিংবা—

"তোমাব পোষ্টকার্ড এলো,
যেন ছডটানা স্রোতে
পিৎসিকাটোব আকস্মিক ঘূর্ণী,
রেডিওর ঐক্যতানে বিস্মিত আবেগ।
দিন কাটলো
যেন জিল হাম্বিলম্বিতে।"

এসব শিরঃপীড়া কেহ দীর্ঘকাল বহন করিবে না।

"টোপর পানায় পুকুর ভরেছে

কোনখানে নাই ডাঙা,
জলা ব'লে মনে হয় ডাঙাগুলো,
জলে মনে হয় ডাঙা;
ভুলে ভরা সব, কোথায় ফেলিতে
কোথায় চরণ পড়ে,
এ হেন তুপুরে থেকোনাকো দূরে,
ভাতুরাণী এসো ঘরে।”

কিংবা—

“দূরে দূরে গ্রাম দশ-বারোখানি
মাঝে একখানি হাট,
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ
প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।”

এইজাতীয় কবিতার টিকিবার তবু কিছু সম্ভাবনা আছে—কারণ এগুলি বাংলার জীবনবস্তু হইতে উদ্ভূত, সহজ অনুভূতিতে প্রাঞ্জল, আর অকারণে চমৎকার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভাষার উপরে চাপ দিয়া তাহাকে বিকৃত করিয়া ফেলা হয় নাই। যে দেখিতে পারে তাহার কাছে চার ঠ্যাঙের গোরুই অতুল বিস্ময়ের আকর—আর-একটা ঠ্যাঙ যোগ করা নিতান্তই বাহুল্য।

ঈশ্বর গুপ্তের অনেক হযবরল লোকে ভুলিয়া গিয়াছে কিন্তু ভারতচন্দ্রের “সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনি, ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি” ভুলিতে পারে নাই। দাশরথি রায়ের অনুপ্রাসের অট্টকরতালি কবে বাতাসে মিলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার “হৃদি বৃন্দাবনে বাস করো যদি কমলাপতি”র করুণ মিনতি এখনো মনকে উদাস করিয়া দিবার জন্য ধ্বনিত হইতেছে। এদেশে এবং ওদেশে, একালে এবং ওকালে, কাব্য একই নিয়ম অনুসরণ করিয়া মরে বাঁচে—আধুনিক-গণের জন্য নূতন নিয়ম সৃষ্টি হয় নাই।. কাব্যের বিষয়-বনিয়াদ যদি পাকা হয়, সেই বিষয়রসে, কবি যদি সত্যই আবিষ্ট হয়, আর সেই রসের প্রকাশ যদি ভাষা ও ছন্দের সহজ সরল ধারাকে

অবলম্বন করে, তবে সেই কাব্যের টিঁকিয়া থাকিবার, একটা ন্যূনতম সম্ভাবনা দেখা দেয়—ইহার উপরে আরো গুণপনা থাকিলে সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রশস্ততর হয়। কিন্তু তার বদলে কাব্যের বনিয়াদ নির্বাচন যদি ভুল হয়, বিষয়রসে কবি যদি জারিত না হয়, আর সহজ স্বাভাবিক প্রকাশপথে যদি মোৎসার্ট, হাড়াপ্পা প্রভৃতি আসিয়া পড়ে, তবে সে বস্তুকে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঙ্ করণে, শিব বা সমালোচক কাহারো সাধ্য নাই যে সে-বস্তুকে রক্ষা করে।

আজকাল কবিরা খেদ করিয়া থাকেন যে, সাধারণে কবিতা চায় না। এ খেদ কেবল এ দেশের কবিদের নয়, পৃথিবীর সকল দেশের কবিদেরই ঐ দুঃখ। দেখা যাইতেছে সে সাধারণ লোকে পাঠবিমুখ নয়, কোটি কোটি টাকা পুস্তক-ব্যবসায়ে খাটিতেছে ; এমন কি, তাহাদের কাব্যবিমুখও বলা চলে না, কেন না, প্রাচীন ও অনতিপ্রাচীন কবিদের সুলভ সংস্করণে প্রাপ্য কবিতার বইয়ের কাটতি বড় কম নয়। পেলিক্যান গ্রন্থমালায় প্রকাশিত ওডীসি কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ বিক্রয়বাহুল্যে জনপ্রিয় উপন্যাসকে হার মানাইয়াছে। আমাদের দেশে বর্তমানে মধুসূদনের কাব্যের কম বেশি চল্লিশের বেশি বিভিন্ন সংস্করণ বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত ও বিক্রীত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা, গীতবিতান, গীতাঞ্জলি প্রভৃতির জনপ্রিয়তা সুবিদিত। এক সময়ে নজরুল ইসলামেব কাব্যেব কাটতি বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিল। বুড়া কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস এখনো Best seller। কাজেই লোকে কবিতা পড়ে না, বা পড়িতে চায় না, কথাটা বাজে। আসল কথা লোকে গদ্যের চেয়ে পদ্য বেশি পছন্দ করে, কবিতা পড়িতে চায়, কিন্তু পড়িবার মতো কবিতা না পাইলে কি করিবে? সত্য কথা এই যে, পাঠকে আধুনিক কাব্য পড়ে না—এদেশে, ওদেশে এবং সর্বদেশে। এখন, আমি নিজেকে একজন আধুনিক কবি বলিয়া মনে করি, আর কোনো কারণে না হোক, আধুনিক কালে বাস করিতেছি সেই সুবাদে অন্তত। তৎসত্ত্বেও বুঝিতে পারি না পাঠকে কেন আধুনিক কবিতা পড়িবে! যে রচনায়

মনের খাদ্য মেলে সাধারণে তাহাই গ্রহণ করে। আধুনিক কবিরা পাঠকের সেই মনের খাদ্য জোগাইতে পারিতেছেন কি? অনুভূতি ও উপলব্ধির উদার রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা উদ্ভট কল্পনার, অকারণ পাণ্ডিত্যের, ব্যক্তিগত গোষ্ঠীর গলিঘুজিতে কি প্রবেশ করেন নাই? সেই সংকীর্ণ, অন্ধকার, অপঘাতবন্ধুর পথে স্বভাবতই সাধারণের প্রবেশ দুষ্কর। তাহারা যদি কবিকে অনুসরণ না করে তবে সে দায়িত্ব কাহার? আমি যতদূর বুঝি, পাঠক কবিকে ত্যাগ করে নাই, কবিই পাঠককে ত্যাগ করিয়াছে—এখন খেদ অনাবশ্যক।

কবিরা যে পরিমাণে পাঠককে ত্যাগ করিয়াছে, ঔপন্যাসিকরা সেই পরিমাণে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়াছে। আগেকার-দিনে কাব্যের যে জনপ্রিয়তা ছিল এখন উপন্যাস তাহা অধিকার করিয়া লইয়াছে। কোনরূপ ষড়যন্ত্রের ফলে নয়—কবির পাঠক-বিমুখতার ফলে, কবির পাঠককে মনের খাদ্য জোগাইবার অক্ষমতার ফলে এই পরিবর্তনটি ঘটিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে টেনিসনই বোধ করি শেষ জনপ্রিয় কবি, ডিকেন্স থ্যাকারের সমকালেও তিনি বৃহৎ পাঠকসমাজকে আপনার কবি-কুঞ্জের কাছে টানিয়া রাখিয়াছিলেন। তারপর হইতেই পাকাপাকি ভাবে কাব্যে রাহুগ্রাস আরম্ভ হইয়াছে। ইহার খানিকটা দায়িত্ব বোধ করি ব্রাউনিঙের। অসাধারণ প্রতিভা ও মনীষা সত্ত্বেও, মহাকবি অভিধা সত্ত্বেও, পাঠকের মনে কাব্যভীতি সৃষ্টি করিবার দায় তাঁহাকে বহন করিতেই হইবে। অপরিচিত বিষয়, স্বল্পজ্ঞাত ইতিহাসের কচ্‌কচানি, উন্মার্গগামী কল্পনা, ভাষায় স্বেচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত দুরূহতা ব্রাউনিঙের বহু কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। তার উপরে তাঁহার দুর্ভাগ্য এমনি যে, একদল ব্রাউনিঙ-ভক্ত ঐগুলিকেই ব্রাউনিঙের প্রতিভার ও কাব্যের পরাকাষ্ঠা বলিয়া কীর্তিত করিল। কিন্তু তাহাদের কীর্তনের তারস্বরে সাধারণ পাঠক আকৃষ্ট না হইয়া দূরে সরিয়া গেল। তাঁহার সহজ সরল স্বচ্ছ কবিতাগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেও, সামগ্রিক রূপে তিনি গোষ্ঠীর সম্পত্তি হইয়া রহিলেন। গোষ্ঠীকাব্যের ইহা সম্পূর্ণ ইতিহাস না হইলেও ইতিহাসের

সূচনা বটে। আধুনিক কবিরা এখন গোষ্ঠীকবি, গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁহাদের গৌরব ও জৌলুষ; অপর গোষ্ঠীর কাছে যত তাঁহারা দুর্বোধ্য তত নিঃসংশয়ভাবে যেন তাঁহাদের আধুনিকতা প্রতিপাদিত হয়, গোষ্ঠীবান্ধবগণ তত অধিক উল্লসিত হইয়া ওঠেন, যেন 'আধুনিকতা'-সৃষ্টিই লক্ষ্য, কাব্যসৃষ্টি লক্ষ্য নয়। এ যে স্বখাত সলিল, এখন অপরকে দুষিলে চলিবে কেন?

'আধুনিক কাব্য' একটা কানাগলিতে প্রবেশ করিয়াছে, এখানে প্রগতি মানে পাথরের নির্মম নিষেধের সঙ্গে মাথা ঠুকিয়া মরা, মরিলেও নিশ্চল বাধা সরিবে না। এখন একমাত্র উপায় প্রগতি নয়, পশ্চাদ্‌-গতি; সময়বিশেষে পশ্চাদ্‌গতিই পরাগতি। কানাগলি পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক কাব্যকে পুনরায় জীবনের উদার পথটির উপরে ফিরিয়া আসিতে হইবে, যে বস্তু ভাব ও বিষয়গুলি দীর্ঘকালের সাহচর্যে মানুষের জীবনের মধ্যে শিকড় চালাইয়া দিয়া একীভূত হইয়াছে, তাহাদের উপরে পুনরায় কাব্যের বনিয়াদ স্থাপন করিতে হইবে, কল্পনার উন্মার্গগামিতাকে প্রতিভা বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না, মনে রাখিতে হইবে যে Common sense in uncommon degree হইতেছে প্রতিভার স্বরূপ; আর 'যে পথে সহস্র লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে', সেই পথের ধুলা দিয়া সেই পথের প্রান্তে বাণীসৌধ গড়িতে হইবে—তবেই আবার সহস্র লোক কবির রচনায় আগ্রহ ও আত্মীয়তার ভাব অনুভব করিবে। Original হইবার আশায় ব্যাকরণ অভিধান ও কাণ্ডজ্ঞানকে লঙ্ঘন করিয়া ফল নাই; কারণ Originality বিষয়ে নাই, 'লোকসংস্কৃতি'তে নাই, ছন্দোজ্ঞানের অভাবে নাই—originality আছে aboriginalityর মধ্যে; মানুষের হৃদয়ের মতো aboriginal আর কি আছে? তাহার তুলনায় 'বিন্ধ্যহিমাচলযমুনাগঙ্গা' নবাগত। পুরাতনের মধ্যে নূতনকে আবিষ্কার করাতেই প্রতিভার দৃষ্টি ধরা পড়ে। সংসারে নূতন চাকরের মতো কাব্যে নূতন বিষয় আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়।

"Poetry listens to no argument and opens her

heart to no strangers. A thousand years in her sight are but as yesterday, and her home is among things that are very old, old as the battle of man against fate, old as love and death and honour, and the Kiss of Helen and the dancing of the daffodils."

বিভূতিভূষণের রচনা

বিভূতিভূষণের রচনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব ইচ্ছা ছিল। কখনো কখনো এ বিষয়ে বিভূতিবাবুর সহিত কথা বলিয়াছি। তিনি খুশি হইয়াছেন, বলিয়াছেন, 'বেশ হবে, তুমি লেখো।' কিন্তু কিছুই করা হইয়া ওঠে না, সময়াভাব ও আলস্য প্রধান কারণ। আরও একটি কারণ ছিল, ভাবিয়াছি এত ত্বরা কিসের? আলোচনার যোগ্য অনেক বই বিভূতিবাবু অবশ্য লিখিয়াছেন, কিন্তু আরও কিছু লিখুন না কেন। সুর সমের কাছে আসিলে তবে তাহার পুরা রূপটি সহজগ্রাহ্য হয়, বিভূতিবাবুর রচনার ধারা তো এখনো সমাপ্তির কাছে আসে নাই, তবে আবার এত ত্বরা কেন। কিন্তু সুর 'সমের' কাছে আসিবার আগেও যে সুরকারের জীবন সমাপ্ত হইতে পারে এই স্থূল কথাটা মনে পড়ে নাই, অন্তত বিভূতিবাবুর সম্পর্কে মনে পড়িবার কোনো কারণ ছিল না। সুস্থ সবল প্রাণবান পুরুষ ছিলেন তিনি। মৃত্যু চরম যবনিকা টানিয়া দিয়া অকালে সমাপ্তি ঘটাইয়া দিল। বিভূতিবাবুর সাহিত্যিক খ্যাতি অক্ষয় হইল, কিন্তু তাঁহার সাহিত্যধারার আর প্রবাহিত হইবার সম্ভাবনা রহিল না। আমার প্রত্যাশিত সম আসিল না, আসিল চরম শান্তি। এক সময়ে ভাবিয়াছিলাম এত ত্বরা কেন, এখন ভাবিতেছি আর বিলম্ব কিসের? এখন এ আলোচনায় তাঁহার খুশি হইবার সম্ভাবনা আর নাই; নাই থাকুক, আমি তো খুশি হইব, আর আমার মত তাঁহার অনুরাগীগণও খুশি হইবেন আশা করিতে পারি।

বিভূতিবাবুর রচনার সাহিত্যিক আলোচনার ইচ্ছার মূলে বিশেষ একটি কারণ ছিল, সে-কারণ এখনও বিদ্যমান। সেটি বুঝাইয়া বলিলে বিভূতিবাবুর রচনা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইবে, অমনি প্রসঙ্গত বর্তমান সাহিত্য সংক্রান্ত কুয়াশাও খানিকটা পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা।

বিভূতিবাবুর সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন যে তাঁহার রচনায় কালের ও সমাজের পরিচয় একেবারেই নাই। আবার বিভূতিবাবুর রচনার যাঁহারা অনুরাগী তাঁহারা এ কথা স্পষ্ট না বলিলেও অনুরূপ সন্দেহ যে তাঁহাদের মনেও আছে, কেবল বিরুদ্ধ পক্ষের শক্তিবৃদ্ধির ভয়েই প্রকাশ করেন না, এমনও মনে হয়। বিভূতিবাবুর সমালোচক-গণ বলেন যে, বর্তমান বাঙালি লেখকগণের সকলেরই রচনা স্বকাল ও স্বসমাজ দ্বারা চিহ্নিত, কিন্তু বিভূতিভূষণের অধিকাংশ রচনায় যেন দেশকালের কৈবল্য ঘটিয়াছে, সে-সব যে আজকার ঘটনা তাহা বিশেষ ভাবে বুঝিবার উপায় নাই, তাঁহার রচনায় যে কোকিল ডাকিতেছে তাহা শুনিয়া মনে পড়ে 'বাংলা দেশে ছিলাম যেন তিন শ বছর আগে'। উদাহরণ-স্বরূপ তাঁহারা বাংলা দেশের অন্য দুইজন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর উল্লেখ করেন। তাঁহারা বলেন যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও বনফুলের রচনা পড়িলেই মনে হয় যে লেখক মধ্য-বিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের লোক। আর শুধু তাই নয়, দূরদূরান্তের দেশদেশান্তের ভাবান্দোলনের আঘাত আসিয়া তাঁহাদের শিল্পকমলকে নিরন্তর দোলাইতেছে; বিভূতিবাবুর রচনায় তেমন দেখি কই? তাঁহাদের মতে বিভূতিবাবুর শিল্প তরঙ্গহীন, কালের চাঞ্চল্যহীন সরোবরের পদ্ম। এ অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে চিন্তার বিষয় বই কি। কিন্তু আদৌ কি এ অভিযোগ সত্য? কোনো কৃতী শিল্পীর পক্ষে স্বকাল ও স্বসমাজকে এড়াইয়া শিল্পসৃষ্টি করা কি আদৌ সম্ভব? সাহিত্যের বৃহৎ ইতিহাস স্মরণ করিয়া তো এমন একটি দৃষ্টান্তও চোখে পড়িতেছে না। তবে এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনফুলের রচনায় কালের ও সমাজের ঠিক যে

লক্ষণগুলি প্রকট বিভূতিবাবুর রচনায় হয়তো সেগুলি প্রকট নয়। কিন্তু অন্য লক্ষণ যে প্রকট হয় নাই তা কে বলিল ? কাল কেবল নিরবধি আর পৃথিবী কেবল বিপুলা নয়, দেশ ও কালের ধর্ম ও লক্ষণও বিচিত্র। এমন কোন্ দর্পণ আছে যাহাতে সমগ্র আকাশের প্রতিবিম্ব ধরে? এমন কোন্ লেখক আছে সমগ্র জীবনের ছাপ যে ধরিতে সক্ষম হইয়াছে? জীবন যখন অপেক্ষাকৃত সরল ছিল তখনকারও সমস্ত ছাপই কি হোমারে আছে, না, দান্তেতে আছে, না, শেক্সপীয়রে আছে? জীবন তো ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে। ডিকেন্স ও থ্যাকারে দুই জনেই সমসাময়িক এবং দুই জনেই যুগন্ধর ঔপন্যাসিক। কিন্তু ডিকেন্সেব উপন্যাসে যুগের যেসব লক্ষণ প্রকট, থ্যাকারের উপন্যাসে সেগুলি প্রকট হয় নাই, অন্যগুলি প্রকট হইয়াছে। তাই বলিয়া ডিকেন্সের তুলনায় থ্যাকারেকে কেহ নিন্দা করে না, এইটুকু মাত্র বলে যে তাঁহাদের দর্পণ ভিন্নমুখে অবস্থিত, তাই ভিন্ন দিকের ছায়াকৃতি ধরিয়াছে। কাজেই তারাশঙ্করবাবু ও বনফুলের রচনায় স্বকালের ও স্বসমাজের যে লক্ষণ প্রকট, সেগুলি যদি বিভূতিবাবুর রচনায় না থাকে, তাই বলিয়াই তিনি নিন্দাই নহেন। তাঁহাব রচনায় হয়তো সমাজেব ও কালের অন্য দিকের ছায়া পড়িয়াছে। সেগুলির স্বরূপ-আবিষ্কারই যথার্থ সমালোচনাকার্য। সমালোচক ও নিন্দুক ভিন্ন গোত্রের মানুষ।

এ যুগেব কতকগুলি লক্ষণ অত্যন্ত প্রকট, কাহারো চোখ এড়ায় না, এমন কি সংবাদপত্রেব রিপোর্টারের পক্ষেও সেগুলি সহজগ্রাহ্য। তেমন একটি লক্ষণ শ্রমিক-ধনিক-সংঘাত, আর একটি লক্ষণ সর্বজনীন অসন্তোষ। এই দুটি ধারা অনুসরণ করিলে বাকি অনেকগুলি লক্ষণকে উপধারা রূপে পাওয়া যাইবে। বর্তমান অধিকাংশ বাঙালি লেখকের রচনা এইসব ধারা ও উপধারার দ্বারা চিহ্নিত। স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিভূতিভূষণের রচনার এগুলি বৈশিষ্ট্য নয়। ইহাতে এইটুকু মাত্র প্রমাণ হয় যে, তিনি বিশিষ্ট। সেটা তো নিন্দার বিষয় নয়।

২

বিভূতিভূষণের অধিকাংশ উপন্যাস ও গল্পের অবলম্বন কি? মানুষের প্রাত্যহিক জীবন। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ছোটখাটো সুখ-দুঃখের যে লীলাচাঞ্চল্য আছে, সুখের ভিতরে যে দুঃখের আভাস আছে, দুঃখের মধ্যেও যে আনন্দের ইঙ্গিত আছে, বিভূতিভূষণ সাহিত্যরচনার জন্য সেগুলিকেই আশ্রয় করিয়াছেন, জীবনাড়ম্বর তাঁহার রচনার উপজীব্য নয়। তাঁহার গ্রন্থগুলিকে গার্হস্থ্য উপন্যাস বলা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে যে সমস্ত গার্হস্থ্য উপন্যাস বাংলাদেশে লিখিত হইয়াছে বিভূতিবাবুর রচনা ঠিক সে পর্যায়ভুক্ত নহে। কারণ এমন একটি নূতন উপাদান তাঁহার রচনায় আছে, জলে যে ভাবে ছায়া মিশ্রিত হইয়া থাকে সেই ভাবে আছে, যাহা রবীন্দ্রপূর্ব যুগের গার্হস্থ্য উপন্যাসে ছিল না। সেটি প্রকৃতি। এটি রবীন্দ্রপূর্ব যুগে অভাবিত ছিল। এটি জীবনের একটি নূতন যুগের লক্ষণ, সে নূতন যুগ এখনও পুরাতন হয় নাই। পশ্চিমের হাত হইতে রবীন্দ্রনাথ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের হাত হইতে রবীন্দ্রোত্তর গ্রহণ করিয়াছেন, রবীন্দ্রোত্তর কথাশিল্পীগণের মধ্যে বিভূতিভূষণ সবচেয়ে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন। এখানেই বিভূতিবাবুর রচনায় নূতনত্ব, দেশ ও কালের চিহ্ন। এই উপাদানটি সবচেয়ে বেশি আধুনিক, শ্রমিক-ধনিক-সংঘাত বা সর্বজনীন অসন্তোষের চেয়েও অনেক বেশি আধুনিক। প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে নূতন সাহিত্যের এখানেই প্রভেদ। এই প্রভেদের সূচনা কবে কিরূপভাবে হইল? এখানে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের নজির গ্রহণ ছাড়া উপায় নাই। মনে রাখিতে হইবে যে Lyrical Ballads ও Industrial Revolution সমসাময়িক। শুধু তাই নয়, একই মনোভাবের ও জীবনধারার এপিঠ-ওপিঠ। আরও একটি নজির স্মরণ করা যাইতে পারে। রুসো ও ভল্টেয়ারকে ফরাসি বিপ্লবের

পূর্বসূরি বলা হয়। কিন্তু দু' জনের জীবনধর্ম সম্পূর্ণ বিপরীত। ভল্টেয়ার যন্ত্রযুগের পরোক্ষ গুরু, আর রুসো প্রকৃতির প্রতি অন্ধ আকর্ষণের প্রত্যক্ষ ঋষি। একজন লিরিকাল ব্যালাড্‌সের পশ্চাতে দণ্ডায়মান, অপরজন দণ্ডায়মান ইনডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশানের পশ্চাতে। আজ পর্যন্ত সভ্যদেশের জীবনযাত্রা এই দুই ধারার দ্বারা প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত ও আন্দোলিত। একটির উপধারা শ্রমিক-ধনিক-সংঘাত, অপরটির উপধারা প্রকৃতিকে জীবনের উপাদানরূপে গ্রহণ। এই ধারা ও উপধারা কালক্রমে আমাদের জীবনে, কাজেই আমাদের সাহিত্যেও, আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মাঝখানে আছেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি প্রধানত একতরকে গ্রহণ করিয়া তাহাতে বৈচিত্র্য, গভীরতা ও আধ্যাত্মিক আলোক আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার পরবর্তীগণ কেহ একটিকে, কেহ অপরটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই যাঁহাদের রচনায় শ্রমিক-ধনিক-সংঘাতের বা সর্বজনীন অসন্তোষের বিকাশকে লক্ষ্য করিয়া স্বকাল ও স্বসমাজের লক্ষণ পাইলাম মনে করি, তাঁহাদের আধুনিক মনে করি, এ যেমন সত্য, তেমনি যাঁহাদের রচনায় প্রকৃতিকে মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য উপাদানে পরিণত হইতে দেখি, তাঁহারাও তেমনি আধুনিক হইবেন, ইহাও তেমনি সত্য। বস্তুত কোনো লেখক ইচ্ছা করিলেও অনাধুনিক হইতে পারেন না, বড়জোর আধুনিকতাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন, এই পর্যন্ত। বিভূতি-বাবু ইচ্ছা করিয়া আধুনিকতাকে প্রচ্ছন্ন করেন নাই, আবার উগ্র-ভাবে প্রকট করিয়াও তোলেন নাই, শিল্পের ইন্দ্রধনুর সাতরঙের সঙ্গে সুকৌশলে মিশাইয়া দিয়াছেন। এই কারণে তাহা অনেকের চোখ এড়াইয়া যায়। বর্ণান্ধ ব্যক্তির মত কাব্যান্ধ ব্যক্তিও সংসারে অবিরল নয়। চোখের দোষের জন্য বস্তুকে দোষী করা কি ন্যায়সঙ্গত!

বিভূতিবাবু যে আর দশজন শক্তিশালী বাঙালি লেখকের মতই আধুনিক, স্বকাল ও স্বসমাজের লক্ষণের অধীনে ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম। এবার সেই লক্ষণের বিশেষ রূপ কি, দেখাইতে চেষ্টা করিব।

সাহিত্যে প্রকৃতির দুটি রূপ দেখিতে পাই। একটি মানুষের প্রতিকূল ও প্রতিস্পর্ধী, সে মানববিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, আপন নিয়মে ও আপন প্রাণশক্তিতে পূর্ণ ও চালিত; আর-একটি মানুষের অনুকূল, ও সর্বদা মানুষের কাছে ধরা দিতে প্রস্তুত, সে ক্ষণে ক্ষণে মানবসমাজের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া মানুষকে বিচিত্রতর ও সুন্দরতর করিয়া তুলিতেছে। প্রথমটির রূপ দেখিতে পাই হার্ডির Egdon Heath-এ এবং হুগোর Toilers of the Sea-র সমুদ্রে; দ্বিতীয়টির রূপ বিভিন্ন মহাকবির কাব্যে দৃশ্যমান। ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যে, কালিদাসের শকুন্তলা ও অন্যান্য কাব্যে, রবীন্দ্রনাথ, শেলি প্রভৃতির কাব্যে প্রকৃতি মানুষের অনুকূল ও অনুষঙ্গী। অবশ্য কবির স্বভাব অনুসারে এবং কালের রুচি অনুসারে তাহাতে বৈচিত্র্যের অভাব নাই। ওয়ার্ডস্বার্থে পাই অধ্যাত্ম মহিমা, মানুষ ও প্রকৃতি যেন একই সাধন-পন্থার সাধক ও উত্তরসাধক; রবীন্দ্রনাথে 'মানবের রূপ হেরি বরষার মাঝে'। একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত। যাঁহারাই মানুষ ও প্রকৃতিকে একসূত্রে দেখিয়াছেন ও গাঁথিয়াছেন সকলেই কবি। বঙ্কিমচন্দ্রেও এই কবিপ্রাণতা লক্ষ্য করিবার মত। বিভূতিভূষণও মূলত কবি।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসেও প্রকৃতি ও মানুষ একসূত্রে গ্রথিত। তাঁহার সর্বজনপরিচিত অপু 'অর্ধেক মানব তুমি অর্ধেক প্রকৃতি'। কিন্তু এটি কেবল অপুর লক্ষণ নয়, বিভূতিবাবুর সমস্ত রচনারই সাধারণ লক্ষণ। তবু ওরই মধ্যে একটু প্রভেদ ও একটি বিবর্তনের বেগ লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার প্রথম জীবনের উপন্যাসে মানবকে নিসর্গান্বিত ও নিসর্গকে মানবান্বিত করিয়া ফেলা হইয়াছে। কিন্তু এ প্রকৃতি পল্লী-প্রকৃতি। বাংলাদেশের পল্লীতে প্রকৃতির যে রূপ দেখা যায় তাহা রুদ্র নয়, ভীম নয়, তাহা স্নিগ্ধ ও ক্ষুদ্র। তাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করে,

অভিভূত করে না। পল্লীবালক অপু ও পল্লীপ্রকৃতি যেন পরস্পরের খেলার সাথী, যেন পরস্পরের পরিপূরক।

তাঁহার পরবর্তী কালের গ্রন্থে, যেমন 'আরণ্যকে' ও 'হে অরণ্য কথা কও' গ্রন্থে, প্রকৃতির রূপ ভিন্ন। বস্তুগত ভাবে সে প্রকৃতি পাহাড়পর্বত, অরণ্যমালা ও রুক্ষ বন্ধুর ভূখণ্ড তবু কোনোটারই ভীমকান্ত সৌন্দর্যকে কবি দেখান নাই, কারণ তিনি দেখেন নাই। তাহাদের মুগ্ধ ও সুন্দর দিকটাই তিনি দেখিয়াছেন এবং আঁকিয়াছেন। মানব-প্রকৃতির দুর্দাম বৃত্তিগুলিকে তিনি অঙ্কিত করেন নাই, তাহার প্রাত্যহিক ক্ষুদ্র রূপটাকেই যেমন তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তেমনি প্রকৃতি সম্বন্ধেও তিনি এই নিয়ম অনুসরণ কবিয়াছেন। বয়স বাড়িলেও অপু বালকই থাকিয়া গিয়াছে, বাল্যজীবনের সরল সৌন্দর্যই তাহার প্রধান সম্পদ। এই সরল সৌন্দর্য অঙ্কনেই বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব! প্রকৃতির মধ্যেও সেই সরল সৌন্দর্যেরই তিনি সন্ধান করিয়াছেন। পল্লী-প্রকৃতিতে তাহা সহজলভ্য। পাহাড়পর্বতে ও দুর্গম অরণ্যে তাহা সহজলভ্য নয়, কিন্তু একেবারে দুর্লভও নয়। এই দুর্লভের আবিষ্কারেই বিভূতিবাবুর প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে। বিভূতিবাবু সমস্ত মানবসমাজকে অপুর সমাবেশরূপে দেখিয়াছেন, আবার প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকেও পল্লী-প্রকৃতির রূপান্তরভাবে দেখিয়াছেন। তিনি কৈশোরের কবি, সরল সৌন্দর্যের সন্ধানী। গৃহের আঙিনা তাঁহাকে যেমন মুগ্ধ করে, এমন আর কিছু নয়। জীবন তাঁহার কাছে সংগ্রাম নয়, খেলাঘর। সেই জন্য রণক্ষেত্র তাঁহাকে আর্কষণ করে নাই, করিয়াছে বালকের খেলাঘর। বৃহৎ বিশ্বকে খেলাঘরে পরিণত করিয়া দেখিতে না পারিলে যেন তাঁহার তৃপ্তি নাই। বিভূতিভূষণের বিশ্ব একটি সুবৃহৎ ও সুবিচিত্র খেলাঘর; তাহার অধিবাসিরা সকলেই বালক-বালিকা, সেখানকার পাহাড়পর্বত অরণ্য প্রান্তর সবই খেলাঘরের মাপের। তাঁহার বিশ্বকর্মা নিজেই যেন বালক, খেলার সঙ্গী গড়িয়া খেলার শখ মিটাইয়া লইতেছেন—বিভূতি-ভূষণ নিজেও শেষ পর্যন্ত বালক ছিলেন। তাই জীবনের জটিল ও দুর্গম দিকটা তাঁহার চোখ পড়িত না, কিংবা পড়িলেও জটিলতার মর্ম

বুঝিতে পারিতেন না, সমস্তকেই নিজের ছাঁচে সরল করিয়া প্রকাশ করিতেন।

তাঁহার 'দেবযান' গ্রন্থখানিও এমনি একটি রহস্যময় খেলাঘর। রহস্যময় এইজন্য বলিলাম যে খেলাঘরের মত রহস্যময় আর কি হইতে পারে। জীবনের সমস্ত স্বাদ যে ক্ষুদ্রায়তনে পাওয়া যায়, তাহার আয়তনের ক্ষুদ্রতাই কি দেখিব? তাহার রহস্যের অতলতা কি কিছুই নয়?

পরলোকের মত ব্যাপার, যাহার প্রমাণ নাই, যাহার অস্তিত্বে অনেকেই অবিশ্বাসী, তাহাকে শিল্পবস্তুতে পরিণত করা সহজ নয়। ইন্দ্রিয়াতীতকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে প্রকাশের মাধ্যম কোথায়? দুয়ের মাপকাঠি যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবু বিভূতিবাবু 'দেবযানে' যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা অসাধারণ। পরলোককেও তিনি একটি খেলাঘর-রূপে রচনা করিয়াছেন, বড়জোর সে যেন ও বাড়ির খেলাঘর, বড়জোর তাহার খেলুড়িরা যেন আর-এক জন্মের লোক। হয়তো ঐ একটিমাত্র রূপেই পরলোককে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিল্পবস্তুতে পরিণত করা সম্ভব, অন্য পন্থা হয়তো সত্যই নাই।

যাঁহারা 'দেবযান' গ্রন্থে পরলোকতত্ত্ব দেখিতে পান তাঁহাদের সঙ্গে আমি একমত নই। উহা পরলোকতত্ত্ব নয়, পরলোকের উপন্যাস। বস্তুত যাঁহারা বিভূতিভূষণের রচনায় ক্ষণে ক্ষণে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই সঙ্গে আমার মতের গভীর অনৈক্য। তত্ত্ব যদি কিছু থাকে থাকুক, তাহাতে বিভূতিবাবুর কৃতিত্ব নয়, বরঞ্চ যেখানেই তত্ত্বের বাড়াবাড়ি সেখানেই তাঁহার রচনার দুর্বলতা। যখনই তিনি ভাবিতে শুরু করেন, অপুর মত কথা বলেন; কিন্তু যখন তিনি অনুভব করিতে শুরু করেন, তাঁহার তুলনা নাই। বিভূতিবাবুর জগৎ চিন্ময় নয়, হৃন্ময়। ঐখানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। মানুষের ও প্রকৃতির সংসারে (বিভূতিবাবুর কাছে দুই জনে প্রতিবেশী ও একই খেলাঘরের খেলুড়ি) যে-আনন্দ ছড়ানো রহিয়াছে, Eldoradoর রাজপথে যেমন মণি-মাণিক্য ছড়ানো থাকে তেমনি ভাবে যে সহজ সুখদুঃখ ছড়ানো আছে

—বিভূতিবাবু মুগ্ধ অপুর মত তাহা কুড়াইয়া আঁচলে সংগ্রহ করিয়াছেন। তবে কি তাঁহার জগতে দুঃখ নাই? অবশ্যই আছে। কিন্তু তাহাও খেলাঘরের দুঃখের চেয়ে তীব্রতর নয়, খেলা ভাঙিলেই সে দুঃখ ভুলিতে বেশিক্ষণ লাগে না, অবশিষ্ট থাকে খেলার সুখটি। যে-Joy in widest commonalty spread, তাহাকেই গভীরভাবে শুদ্ধভাবে হৃদয়ে গ্রহণ এবং সরলভাবে প্রকাশ বিভূতিভূষণের যথার্থ কৃতিত্ব এবং তাঁহার সাহিত্যিক অমরত্বের দাবিও ঐ সূত্রে।

বিভূতিভূষণের রচনার পরিমাণ নিতান্ত সামান্য নয়। দু-একখানা বই বাদে তাঁহার সবগুলি রচনাই সুখপাঠ্য ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য। মূল্যবান রেশমি কাপড় যেমন নির্বিশেষে গায়ে লাগিয়া থাকে, একটুও বেখাপ হয় না, তেমনি তাঁহার ভাষা ও ভাব গায়ে লাগিয়া আছে, কোথাও এতটুকু ব্যবধান নাই। এমন যে হইতে পারিয়াছে তাহার কারণ বিষয় নির্বাচনে তিনি ভুল করেন নাই। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ পথের পাঁচালীকে অনেকেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করেন। প্রথম গ্রন্থেই তিনি তাঁহার প্রতিভার যোগ্য বিষয়কে লাভ করিয়াছেন, এমন সৌভাগ্য অল্প লেখকেরই হইয়া থাকে। অনেক লেখক আছেন যাঁহারা ভুল করিতেই অভ্যস্ত। হেমচন্দ্রের স্বাভাবিক শক্তি ছিল ব্যঙ্গ-রচনায়, অথচ তিনি বৃহদাকার মহাকাব্য রচনায় শক্তির অপব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আবার নবীনচন্দ্রের স্বাভাবিক শক্তি লিরিক রচনায়, তিনিও মহাকাব্য রচনায় শক্তির অপব্যবহার করিয়াছেন। বিভূতিভূষণ এদিক দিয়া সৌভাগ্যবান। বিষয় ও বিষয়ী এখানে অঙ্গাঙ্গী। এমন যে হইতে পারিয়াছে তাহার আবার মূল কারণ, বিভূতিভূষণের মধ্যেকার শিল্পী ও ব্যক্তিতে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না, শিল্পী ও ব্যক্তি পরস্পরের সমর্থক ও পরিপূরক ছিল। অনেক স্থলেই দেখা যায় ব্যক্তি ও শিল্পীতে একটা দ্বন্দ্বের ভাব বিদ্যমান, এবং সেই সূত্রে তাঁহাদের রচনা দ্বিধাগ্রস্ত, তাঁহাদের রচনা পাঠককে পূর্ণ তৃপ্তি দান করিতে পারে না। বিভূতিভূষণের তুচ্ছতম রচনা ও বৃহত্তম উপন্যাস সমস্তই পাঠককে তৃপ্ত করিয়া থাকে, কারণ সেখানে ব্যক্তি ও শিল্পী দুই জনেই সমান তৃপ্তির

সহিত রচনাকার্যে সহযোগিতা করিয়াছে, কোথাও এতটুকু অতৃপ্তির দ্বিধা নাই।

বাংলাদেশে বিভূতিভূষণের চেয়ে শক্তিমান লেখকের অভাব নাই, কিন্তু একমাত্র শরৎচন্দ্রকে বাদ দিলে এমন জনপ্রিয় ও তৃপ্তিদায়ক লেখক আর আছেন কি না সন্দেহ। ইহার কারণ তাঁহার অপু (তাঁহার সৃষ্ট সব চরিত্রই অল্পবিস্তর অপুর রূপান্তর) আমাদেরই বিস্মৃত শৈশব। তাঁহার নিশ্চিন্দিপুর আমাদেরই ছাড়িয়া-আসা গ্রাম, তাঁহার রচনা সেই গ্রামেরই মানসযাত্রার পথ ; আর স্বয়ং বিভূতিভূষণ, তাঁহার রচনা পড়িতে পড়িতে ভুলিয়া যাই তিনি যে একজন লেখক, মনে হয় তিনি যেন আমাদের শৈশবের বিস্মৃত-প্রায় খেলার সাথী, মনে হয় তিনি যেন আমাদের পূর্বজন্মের বিস্মৃত খেলার সঙ্গী। তাই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র, তাঁহার অঙ্কিত পল্লীপ্রকৃতি, তাঁহার রচনা, এবং স্বয়ং লেখক-মানুষটি আমাদের এমন মুগ্ধ করে, এমন তৃপ্তিদান করে, আমাদের বিস্মৃত শৈশবকে জাগাইয়া দিয়া পুনরায় সেদিনকার খেলাঘরে এমন অনায়াস আন্তরিকতার সহিত আহ্বান করে। আমার মনে হয়, এখানেই তাঁহার জনপ্রিয়তার রহস্যের মূল। এমন কথা কয়জন সাহিত্যিক সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়। সাহিত্যসভায় তিনি যোগ্য আসন পাইবেন কি না জানি না, কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে এই সর্দার খেলুড়ির গলায় বনফুলের মালা পরাইয়া দিতে অন্য খেলুড়িগণ দ্বিধা মাত্র করিবে না।

নাগিনীকন্যার কাহিনী

তারাশঙ্করবাবুর 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'র অন্তর্গত হিজল বিলের অনুরূপ বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও মহৎ প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু দু'জনায় কিছু তফাৎ আছে। বিভূতিবাবুর হৃদয়ের মমতায় পর্বত ও অরণ্য স্নিগ্ধ হইয়া, কোমল হইয়া, মানুষের স্পর্শে মানুষ হইয়া, শিশুসুলভ অবয়ব লাভ করিয়া মাতা যশোদার কোলে বালকৃষ্ণের মতো খেলা করিতে থাকে। আর তারাশঙ্করবাবুর বর্ণিত প্রকৃতি যেন বামনাবতার; দেখিতে দেখিতে দুই চরণে স্বর্গ ও মর্ত্য আচ্ছন্ন করিয়া তৃতীয় চরণখানি অভিভূত পাঠকের মস্তকে অর্পণ করে, বিস্ময়ের রসাতলে তলাইয়া না গিয়া পাঠকের নিস্তার নাই। দুটিই একই মূলশক্তি, কিন্তু মূর্তি ভিন্ন; একজন মানুষের খেলার সঙ্গী, অপর জন মানুষের গর্বহারী; একজন মানুষের ঘরে মানুষ, আর একজন ত্রিভুবনে একেশ্বর; একজন মানুষের মুখোশে প্রচ্ছন্ন, আর জন স্বমহিমায় ভাস্বর।

এই প্রভেদ হইতে ঔপন্যাসিকদ্বয়ের শক্তির বিশেষ রস ও পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু সে আলোচনা করিতে বসি নাই, এখানে আমার বক্তব্য 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'র রসাস্বাদ।

আগেই বলিয়াছি যে হিজল বিলের বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়; অন্য সাহিত্যেও ইহার অনুরূপ অল্প আছে। হার্ডির Egdon Heath এবং হুগোর Toilers of the Sea-র সমুদ্রের কথা আপাতত মনে পড়িতেছে

হিজল বিল প্রাকৃতিক দৃশ্য মাত্র নয়, একটি সজীব চরিত্র, সমস্ত কাহিনীটির পটভূমিরূপী নিজ প্রাণে সঞ্জীবিত একটি চরিত্র; কিংবা তাহার চেয়েও অধিক, হিজল বিল যেন নিয়তিরই symbol বা প্রতীক; দু'জনেই অন্ধ, দু'জনেই করাল, দু'জনেই আপন অমোঘ নিয়মে দুর্বার। অন্ধ হিজল বিল অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অচল অটল নির্মম পটভূমি রচনা করিয়া বসিয়া আছে, তাহার নিষ্পেষে কালে কালে কত নাগিনীকন্যার হৃদয় না চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

হিজল বিলের বর্ণনা যে এত করিয়া বলিলাম, তাহার কারণ লেখক ও সমালোচক দু'জনেরই উদ্দেশ্য এক। হিজল বিলের যাথার্থ্য না বুঝিলে নাগিনীকন্যার কাহিনী বোঝা যাইবে না, আবার সে যাথার্থ্য বুঝিলে নাগিনীকন্যার কাহিনীর মর্ম-উপলব্ধি ঘটিয়া যাইবে।

হিজল বিলের ধারে সাঁতালী গ্রামের বিষ-বেদের দল বাস করে। কতকাল যে তাহারা এখানে বাস করিতেছে কেহ জানে না। বিষ-বেদেরা বলে, এক সময়ে তাহারা চাঁদ সদাগরের অনুগত-রূপে চাঁদ সদাগরের রাজ্যে বাস করিত, কিন্তু লখিন্দরকে রক্ষা করিতে না পারায় নির্বাসিত হয়। কিন্তু শাপে বর হইল, স্বয়ং বিষহরী দেবী তাহাদের আদর করিয়া নূতন পত্তনে বসাইয়া গেলেন। .স এই হিজল তীরবর্তী সাঁতালী গ্রাম। বিষহরীর আটন হিজল বিলের পদ্মবনে। বিষহরীর আশীর্বাদে এখানে তাহাদের নিঃসপত্ন অধিকার; বিষহরীর আশীর্বাদে তাহারা গরল-বিজয়ী বিষ-বেদে। বাহিরের পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এখানে তাহারা বাস করে। তাছাড়া এখানে আসিবেই বা কে? এক দিকে গঙ্গা, মাঝখানে সাঁতালী গ্রাম, আর এক দিকে হিজল বিল। সে বিলের জলে সাপ, ডাঙায় সাপ, গাছের উপরে সাপ; শ্বাপদ, দ্বিপদ, খেচর সকলেই সাপের ভয়ে সন্ত্রস্ত, কেবল শীতকালটায় ভয় কিছু কম, তখন জলচর পাখি ও খেচর পাখির আধিপত্য, আকাশে গগন-ভেরী পাখি উৎকটরবে আপনার ক্ষণিক বিজয় ঘোষণা করিয়া থাকে। এহেন স্থানে বিষ-বেদের দলের বাস। চাঁদ বেনের কাহিনী, নিজেদের এখানে আগমনের হেতু, মনসার বর প্রভৃতি তাহাদের কাছে উপাখ্যান

নয়, জীবনের বিশ্বাস, যে বিশ্বাসের বলে তাহারা বিষধর সাপের সঙ্গে ঘর করে, সাপে কাটিলে বিচলিত হয় না, বলে যে, ওটা নিয়তি, মানুষ তো অমর নয়।

এই বিষবেদে-সমাজের সঙ্গে পাঠকের যোগের মাধ্যম ধন্বন্তরি কবিরাজ ও তাঁহার শিষ্য শিবরাম কবিরাজ। তাঁহারা মাসে মাসে সাঁতালীতে যাইতেন সুচিকাভরণের জন্য কালনাগের বিষ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

এই বিষবেদে-সমাজের সমাজপতি শিরবেদে। সমাজের সে দণ্ড-মুণ্ডের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তাহার শাসন অনুশাসন ও দণ্ড কাহারো লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। শিরবেদে মহাদেব, আব এক শির-বেদে গঙ্গাবাম। আবাব শিরবেদে-সমাজেব আধিদৈবিক নেত্রী নাগিনী কন্যা; এক নাগিনীকন্যা শবলা, আব এক একজন পিঙ্গলা। এই দুই শিরবেদে এবং এই দুই নাগিনীকন্যার কাহিনীই উপন্যাসখানি।

নাগিনীকন্যাকে আধিদৈবিক সমাজনেত্রী বলিয়াছি, কারণ, বিষহরী এবং বিষবেদে-সমাজের মধ্যে সে যোগসূত্র, তাহার বিধান শিরবেদের শাসনেব চেয়েও বলবত্তর। যে-কোন মেয়ে নাগিনীকন্যা হইতে পাবে না, বিষহবী দেবের অঙ্গুলি-নির্দেশে তাহাকে দেখাইয়া দেন। ভাবী নাগিনীকন্যা পাঁচ বৎসর বয়সে বিধবা হইবে, এটি বেহুলার শাপ, তারপর ষোল বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত তার আর বিবাহ হইতে পারিবে না, তখন যদি তার কপালে নাগচক্র দেখা যায়, তবেই সে 'নাগিনীকন্যা'। 'নাগিনীকন্যা' বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে না পারিবে সে বিবাহ করিতে, না পারিবে কোন আকারে যৌন জীবন যাপন করিতে, করিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী মনসার শাপে, সাপের দংশনে। নূতন এক নাগিনীকন্যার আবির্ভাব হইল পুরাতনীর নির্বাসন; যৌবন গত হইলে নাগিনীকন্যা পদে কেহ থাকিতে পারে না, একজনের যৌবনগত হইবার পূর্বেই অপরজন ষোড়শীমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া থাকে। নাগিনীকন্যাগণ অটল-যৌবনা, অপরূপ সুন্দরী, অথচ যৌবনধর্ম-পালন তাহাদের পক্ষে যুগপৎ ধর্ম ও জীবন বিসর্জনের নামান্তর! এ কি

নিদারুণ অভিশাপ! কাহার অভিশাপ! বেহুলার, মনসার, অন্ধ-সংস্কারের না অন্ধতর নিয়তির? যাহারই হোক, নাগিনীকন্যা মূলতঃ মানবকন্যা ছাড়া কিছুই নয়, কাজেই এত বিধিনিষেধ, বাধা-সতর্কতা সত্ত্বেও একদিন তাহার মানব-স্বভাব, তাহার যৌবন-বেদনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়া তাহাকে ক্ষিপ্ত মত্ত উন্মত্ত করিয়া দেয়; তখন সে—হয় মরে, নয় মারে, নয় উন্মাদিনী হইয়া দেশান্তরী হয়। শবলা যৌবনক্ষুধার ব্যর্থতায় খুন করিয়া দেশান্তরী হইয়াছে, আর পিঙ্গলা অপ্রকৃতিস্থতার প্রান্তে আসিয়া মহানাগরের ছোবল যাচ্ঞা করিয়া আত্মহত্যার দ্বারা সকল জ্বালার অবসান ঘটাইয়াছে।

কিন্তু আমি এ কি করিতেছি! নিজের অজ্ঞাতসারে আমি যেন কাহিনীটির পুনরাবৃত্তি করিতে বসিয়াছি। পুস্তকখানি থাকিতে তাহার প্রয়োজনাভাব, কিন্তু নাগিনীকন্যার মোহ তো সামান্য নয়, অনভীষ্ট পথ ছাড়িয়া দূরে যাওয়া সহজ নয়, একথা শিবরাম কবিরাজ হাড়ে হাড়ে জানে।

এই কাহিনীটি রচনা করিয়া তারাশঙ্করবাবু বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ একখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার চেয়েও কিছু বেশি তিনি করিয়াছেন। আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক জীবনপ্রদেশকে তিনি রসমাধ্যমে আমাদের করায়ত্ত করিয়া দিয়াছেন। সার্থক রসসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব আবিষ্কারের দাবিও লেখক করিতে পারেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মানচিত্রে চাঁদ বেনের রাজধানী চম্পাই নগর যেমন সুচিহ্নিত, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মানচিত্রে হিজল বিল ও সাঁতালী গ্রাম তেমনি বেদনা ও বিস্ময়ের রক্তাক্ষরে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া রহিল। এই গ্রন্থ আমাদের জীবনের রসপরিধি এবং বাস্তব পরিধি যুগপৎ বাড়াইয়া দিল। বাঙালী রসিক ও সমাজতাত্ত্বিক কাহারো এ বইখানাকে এড়াইয়া চলা সম্ভব হইবে না, উচিতও হইবে না। এজন্য তারাশঙ্করবাবু আমাদের কাছে দ্বিগুণ কৃতজ্ঞতা অবশ্যই দাবি করিতে পারেন।

এতখানি বলিলাম, তবু কিছুই বলা হইল না, কাগজে চাঁদ আঁকিয়া চাঁদের সুধা বিতরণ করা যায় না। সমালোচনার দ্বারা সৃষ্টির স্বাদ

দেওয়া কিরূপে সম্ভব? উপন্যাসখানির প্রধান কৃতিত্ব এই যে সমস্ত নরনারী, প্রকৃতি ও জগৎ ভিতরের দিক হইতে অঙ্কিত হইয়াছে। একটা বিষয়ের কাহিনী লেখা শক্ত নয়, কিন্তু সে কাহিনী হইবে বহিরাগতের চোখে দৃষ্ট, বহিরাগতের কলমে অঙ্কিত; সে কাহিনী অপরের কল্পনায় পরিকল্পিত, কিন্তু এই কাহিনীটি আদৌ তেমন নয়। সমস্ত জগৎ ও জীবন এখানে বিষবেদে-সমাজের চোখে দৃষ্ট; দেবতা, মানুষ,—সংক্ষেপে জীবনের যত কিছু ধ্যান-ধারণা বা Concept—সমস্তই বিষবেদেগণের মনের আয়ত্ত; লেখক কোথাও তাহাদের মনের পরিধির বাহিরে যান নাই, তাহাদের কল্পনাকে অতিক্রম করেন নাই; বিষবেদেরা যে-সমস্ত উপমা, অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছে সে-সব কেবল তাহাদের দ্বারাই সম্ভব, গ্রন্থখানার মধ্যে কথোপকথনের যে উপভাষা বা dialect ব্যবহৃত হইয়াছে বাস্তব জীবনে নিত্য নিয়ত তাহারা প্রয়োগ করিয়া থাকে; লেখক সভ্য সমাজের লোক, অথচ কাহিনীটি লিখিবার সময়ে সভ্য সমাজের দৃষ্টি ও ধ্যানধারণাকে পরিহার করিয়া বিষবেদে সমাজের একজন বনিয়া গিয়া তিনি কাহিনীটি রচনা করিয়াছেন। ইহার জন্য আবশ্যক সমবেদনা ও জ্ঞান। দুটির একটিকে ছাড়িলে দৃষ্টি এমন নিখুঁত হইত না; সাপ ও বিষবেদে সম্বন্ধে এমন জ্ঞান লেখক কোথায় পাইলেন! আবার এমন সমবেদনার উৎসই বা সভ্যমানসে কোথায় লুক্কায়িত ছিল! ভাবিলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না!

আজকাল সাহিত্যিক মহলে একটা রব উঠিয়াছে যে, অবহেলিত, অবজ্ঞাত, অত্যাচারিত জনগণের কাহিনী লিখিতে হইবে। কেহ যদি লিখিতে চান লিখুন, আপত্তি নাই। কিন্তু সেরূপ লেখা অনেকটা খৃষ্টান পাদ্রীগণের 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' জনগণের মধ্যে 'আলোক-বিতরণে'র মতো; ওটা প্রচ্ছন্ন অহমিকাজাত প্রকট অপমান ছাড়া কিছুই নয়। তারাশঙ্করবাবু এখানে সে পথ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বাহির হইতে জ্ঞানের আলোক হস্তে প্রবেশ করেন নাই, ভিতর হইতে মাটির প্রদীপ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেই স্তিমিত আলোকে দেখিয়াছেন যে, উক্ত 'অবহেলিত, অবজ্ঞাত, অত্যাচারিত' বিষবেদে-সমাজে মনুষ্যত্বের ওজনে

কোন সভ্য সমাজের চেয়ে হীন নয়, উন্নাসিক সমাজের চেয়ে অনেক অংশেই শ্রেষ্ঠ। বিষবেদে-সমাজে কুসংস্কার আছে, অনাচার আছে, হিংসা অবিশ্বাস কৃতঘ্নতা প্রভৃতি মানবীয় সমস্ত গুণই আছে, কিন্তু সেখানেও এক প্রকার নৈতিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ আছে। তদ্দ্বারা তাহাদের বিচার করা উচিত, লেখক তাহাই করিয়াছেন এবং দেখিয়াছেন যে সে বিচারে তাহারা কোন অংশেই হীন নহে; দোষে গুণে ভালোয় মন্দয় তাহারা পরিপূর্ণ মানুষ। অবহেলিতকে অযাচিত করুণা বিতরণ করা সাহিত্যিক পাদ্রীদের ব্রত হইতে পারে; কিন্তু পরিপূর্ণ মানুষ আবিষ্কার এবং পরিপূর্ণ মানুষ অঙ্কনই সাহিত্যেব চিরকালীন লক্ষ্য। সাহিত্যে মানুষ পরিপূর্ণ মানুষের কথা শুনিতে চায়; শ্রেণী-বিশেষেব কথায়, Economic মানুষেব কথায় তাহাব কোনরূপ স্থায়ী আগ্রহ নাই। দোষে গুণে উক্ত বিষবেদে-সমাজ একটি পরিপূর্ণ মানব-সমাজ, আবার দোষে গুণে শবলা ও পিঙ্গলা পবিপূর্ণ মানব-চবিত্র; এবং সেই জন্যই এই কাহিনীটি চাঁদবেনেব কাহিনীর মতো চিরকালীন রসবস্তু হইয়া বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিবাজ করিতে থাকিবে।

তুচ্ছ

প্রবোধকুমার সন্যোলের 'তুচ্ছ' উপন্যাসের অনুচ্ছেদগুলি যখন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে তখনি পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তারপরে সমগ্রগুলি যখন গ্রন্থাকারে বাহির হয় তখন, প্রবোধকুমার সান্যালের রচনা যেমন সমাদৃত হইয়া থাকে তেমনি সমাদৃত হইয়াছে। অনেক পাঠক বইখানাকে প্রবোধবাবুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া মনে করেন। 'তুচ্ছ' উপন্যাস বটে, অর্থাৎ একটি ধারাবাহিক কাহিনী। কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার যে কোন একটি অনুচ্ছেদকে স্বতন্ত্রভাবে উপভোগ করা চলে—সেইজন্য অনুচ্ছেদগুলি খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল—এবং রসবোধে বাধা ঘটায় নাই। কিন্তু সমগ্রভাবে পড়িলে তবেই গ্রন্থখানার যথার্থ রসমূর্তি ধরা পড়ে, কারণ সমগ্র অনুচ্ছেদগুলির নায়ক একটি বালক। কিন্তু বালকটিই একমাত্র নায়ক নয়, আরও একটি নায়ক-স্থানীয় আছে, তাহা কোন নরনারী নয়—তাহা একটি পুরাতন জীর্ণ বাড়ি। একটি বালক আর একটি জীর্ণ বাড়ি এই বিচিত্র যুগলকে 'তুচ্ছ' উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক বলা উচিত। বালকটি তাহার নবীন দৃষ্টিতে সংসারকে একভাবে দেখিতেছে, তাহার সম্মুখে সংসার তাহার বিচিত্র সুখদুঃখ লইয়া কোষ্ঠিপত্রের মতো প্রসারিত হইয়া যাইতেছে—আর ঐ জীর্ণ বাড়িটি সংসারের অনেক সুখদুঃখ দেখিয়াছে, অনেক উত্থান পতনের সে সাক্ষী, সে তাহার জীবনের উপান্তে সমুপস্থিতপ্রায়। উপন্যাস যেখানে সমাপ্ত সেখানে দেখি যে বালকটি কৈশোরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—আর বহু

সুখ-দুঃখের লীলাভূমি, একটি পবিবারের বহু প্রজন্মের ঐ বাড়িটি অবশেষে দেনার দায়ে বিক্রীত হইয়া গেল, যে-ধনী তাহাকে কিনিল, সে বড়িটার আমূল সংস্কার করিল, হয়তো বা ভাঙিয়াই ফেলিল। কিংবা পুরাতন বাড়িঘর ভাঙিয়া ফেলিয়া পাড়ায় যে নূতন নূতন প্রশস্ত রাস্তা তৈয়ারি করা হইতেছে তাহারই বা অঙ্গীভূত হইয়া গেল—অজস্র পথিকের পদধ্বনিতে বাড়িটির সমতলীকৃত ভিত্তি দিনে রাত্রে নিরন্তর ধ্বনিত হইতে লাগিল। সংসারের রঙ্গমঞ্চে এক যবনিকা পড়িয়া গিয়া—আর এক নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইয়া গেল। ঐ কিশোরটি কি করিল?

"ওদিকে ভাঙন ধরেছে, কলকাতায়। সেই ভাঙনের আঘাতে প্রাচীনের কাঁদন মিলিয়ে গেছে, বাঁধন শিথিল হ'য়ে খসে পড়েছে, কোথাও কিছু দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। যা কিছু আমাদের আশে পাশের চেনা-শোনা, চারিদিকের যে পরিচয়ের মাঝখানে দাঁড়াবার জায়গা পেয়েছিলাম, সেটা ভাঙনের টানে ভেঙে যাচ্ছিল। এবার থেকে নিজের পায়ে দাঁড়ানো। খিড়কির আনাচে কানাচে ঘোরা হয়েছে, অলিতে গলিতে পাক খাওয়া হয়েছে, এবার থেকে সদর দরজায়, এবার থেকে বড় রাস্তায়। পৃথিবীর মুখোমুখি।"

ভগ্ন-আবাস সেই কিশোরটি এবার 'পৃথিবীর মুখোমুখি' আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া থাকা তাহার দ্বারা সম্ভব হইল না। "কত লোক মরেছে, কত জন কেঁদেছে, কত চেনা মানুষ কোথায় তলিয়ে গেছে, কত জীবনের ধারা কোথায় গিয়ে শুকিয়ে গেছে, সেই যাদের নাম জানতুম না, খোঁজ পেতুম না, তারা তাদের পথের চিহ্ন রেখে গেছে সেই অর্বাচীন বালকের বুকে।"

তখন সেই কিশোরটি বিচিত্র পদচিহ্নের নামাবলী গায়ে, আশৈশবের আবাস যাহার চলার পথে পরিণত হইয়াছে, সেই পথের হাতছানিতে চিরন্তন পথিকে পরিণত হইয়াছে। এই পথিককেই আমরা কখনো স্বনামে, কখনো বেনামে দেখিতে পাইয়াছি, 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'যতদূর যাই' গ্রন্থে, এবং 'দেশ দেশান্তর' কাহিনীতে। লেখক

হিসাবে প্রবোধবাবুর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি পায়ের অভিজ্ঞতাকে হাতে করিয়া সঞ্চয় করিয়া গ্রন্থের পরে গ্রন্থ সাজাইয়াছেন। বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভ্রমণ কাহিনী লিখিয়াছেন কিন্তু প্রবোধবাবুর সঙ্গে তাঁহার প্রভেদ এই যে তিনি সারান্দা অরণ্যেই যান, আর পূর্ণিয়া জেলাতেই ভ্রমণ করেন, তাঁহার মন বলিতেছে 'তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে সেই দুই বিঘা জমি।' সেই 'দুই বিঘা জমির' বাস্তব নাম বারাকপুর, শিল্পগত নাম নিশ্চিন্দিপুর। বিভূতিবাবু যতদূরেই যান না কেন গানের সুরের মতো বারে বারে 'সমে' ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি স্বভাবতঃ গৃহস্থ। প্রবোধবাবুর কথা নিশ্চয় জানি না, হয়তো তিনি কলিকাতার মতো শহরে প্রকাণ্ড অট্টালিকা তৈয়ারি করিয়াছেন কিন্তু তৎ-সত্ত্বেও বলিব তিনি গৃহস্থ নন, ভবঘুরে। এই বাড়িটা হয়তো সেই বাড়িটার মধুব স্মৃতিকে পুনরায় আস্বাদ করিবার, উপভোগ কবিবার একটা চেষ্টা মাত্র। তাই অনুমান করি যদি বা তিনি বাসা বাঁধিয়াই থাকেন তাহা আর কিছুই নয়, বহুদিন গত শৈশবের মধুর স্বপ্নকে আর একবার ইঁট কাঠ চুন সুরকিতে রূপদান করিয়া প্রত্যক্ষ করিবার আকাঙ্ক্ষা মাত্র।

এই সব কথা মনে রাখিয়া প্রবোধবাবুর ভ্রমণকাহিনীগুলির সূত্রে 'তুচ্ছ' গ্রন্থখানাকে পাঠ কবিলে অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে 'তুচ্ছ' গ্রন্থে গ্রথিত অভিজ্ঞতাগুলি মোটের উপরে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, শিল্পজগতে বাস্তবের যতটুকু রূপান্তর হইয়া থাকে ততটুকু মাত্র প্রভেদ! আর কী সে অভিজ্ঞতা! যেমন তাহার বৈচিত্র্য, তেমনি তাহার প্রাচুর্য। কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে ও প্রাচুর্যে শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়—তজ্জন্য একটা বেগ বা গতির প্রয়োজন। বর্তমান ক্ষেত্রে সেই গতি আসিয়াছে দুটি ভিন্নমুখী সত্তার সংঘর্ষে—একটি নবারব্ধ বালকের জীবন, অপরটি স্মৃতিভারাক্রান্ত জীর্ণ বাড়ির জীবন। ইহাদের যে কোন একটি আসাতে বেগের সৃষ্টি হইতে পারিত কিন্তু ভিন্নমুখী ও ভিন্নার্থ দুটি সত্তার মুখোমুখি সংঘাতে অতিশয় বেগবান একটি আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে। নদীর আবর্ত যেমন আপন ঘূর্ণন

বেগে চারিদিকের ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত খড়কুটা ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ সামগ্রী-গুলাকে সংহত করিয়া, বিচিত্র ছাঁচ বা pattern-এর সৃষ্টি করিয়া নাচাইতে থাকে, কাঁপাইতে থাকে, ভাসাইতে থাকে, ডুবাইতে থাকে, যে-সব তুচ্ছ বস্তু অন্যথা রূপহীন, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণে শক্তিহীন—তাহাকে চক্রাকারে ঘুবাইতে থাকে; তাহার উপরে আলো পড়িয়া ঝলমল করে, সাদা ফেনায় চকচক করে, জলবিম্বে টলমল করে; আবার সমস্ত আবর্তটাই ঘুরিতে ঘুরিতে স্রোতোবেগে চলিতে থাকে, চলিতে চলিতে নূতন পরিপ্রবাহের আঘাতে নূতন নূতন আবর্তের সৃষ্টি করিয়া নূতনতর pattern-এব সৃষ্টি করিতে থাকে, দর্শকের চক্ষুকে তিলমাত্র ছুটি দিতে চাহে না—এখানেও 'তুচ্ছ' গ্রন্থে সেই রকম একটি মনোরম লীলা সংঘটিত হইয়াছে।

'তুচ্ছ' গ্রন্থখানা সত্যই একটি ভাবাবর্ত! কত রকম জীব কত রকম খড়কুটাই না ইহাতে আকৃষ্ট ও রূপমস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আছেন দিদিমা, আছেন গাঁজাখোর মামা, আছেন মাসিরা, আছে তাহাদের বাউণ্ডুলে জামাইগণ; মাঝখানে একবার নেড়ুদা ও তাহার নববধূকে দেখা গেল, দিনে তাহাদের এক মূর্তি, রাত্রে আর এক মূর্তি! আবার ঘটনাই বা কত রকম—বসত বাড়ি ভাড়া দিয়া কাঁকুড়গাছির ভাঙা বাড়িতে আশ্রয়ের চেষ্টা; সেখান হইতে বলদেও পাড়ার বাড়িতে আশ্রয় —আবার শেষে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই পুরাতন ভদ্রাসনে আগমন। একদিন সে বাড়ি, চিরদিনের আশ্রয় ছাড়িতে হইল—সমস্ত পরিবার ভিন্ন ভিন্ন হইয়া ছড়াইয়া গেল। দিদিমা গেল কাশীবাসে, বালকটিও সেখানে গেল, নিদারুণ অর্থাভাবে মামাকে আপাতত হাইকোর্টের মামলা স্থগিত রাখিয়া মাতার (দিদিমার) এবং পরে কিশোরটির (ভাগ্নের) শরণাপন্ন হইতে হইল। ভাগ্নের কাছেই তাহার মৃত্যু, ভাগ্নেই তাহার শ্রাদ্ধ করিল, ততদিনে ভাগ্নে কিশোর এবং আমরাও গ্রন্থের শেষে সমুপস্থিত।

প্রত্যেকটি নরনারী স্বতন্ত্রভাবে তুচ্ছ কিন্তু ভাবাবর্তের আন্দোলনে সকলে মিলিয়া একটি করুণ-মধুর বিচিত্র রূপের সৃষ্টি করিয়া মৌলিক

তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, সেই জন্যই বুঝি লেখক গ্রন্থসূচনায় উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন—

"তুমি জানো ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয়,
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়।"

বিচ্ছিন্ন ঘটনায় বা স্বতন্ত্র তথ্যে সত্য নাই। কিন্তু যখন এক ঘটনা বা তথ্য অন্য ঘটনা ও তথ্যের প্রসঙ্গে মিলিত হয়, তখনি একটি জীবন pattern-এর সৃষ্টি করিয়া সত্যে উপনীত হয়। এখানেই শিল্পীর কাজ। শিল্পী আপন সাধনবেগের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে একটি গতি সঞ্চারিত করিয়া দিয়া তাহাদিগকে রূপের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, অমনি সত্যের সূত্রপাত, অমনি বিশ্বেরও সূত্রপাত। একটি তৃণখণ্ড সত্য বলিয়াই তাহা বিশ্বের তুল্যমূল্য, বিশ্বের রহস্য ঐ তৃণখণ্ডেও বর্তমান; আবার একটি কাহিনী সত্য বলিয়াই তাহা জীবনের তুল্যমূল্য, কারণ জীবনের রহস্য ঐ কাহিনী খণ্ডেও বর্তমান। ঘটনাপুঞ্জের নগ্ন বা বিচ্ছিন্ন সত্তাকে যাঁহারা শিল্প মনে করেন— তাঁহারা ভ্রান্ত। ঘটনাপুঞ্জ শিল্প নহে, শিল্পের উপাদান। উপাদান আর সার্থক সৃষ্টি সমতুল্য হইতেই পারে না। উপাদানকে সত্যের দিকে আকর্ষণ করিয়া শিল্পসৃষ্টি করাতে লেখকের ক্ষমতা প্রকাশ পায়। 'তুচ্ছ' গ্রন্থে লেখকের সেই ক্ষমতা সমুজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত।

হারানো অতীত

গত কয়েক বছরকার বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ আত্মস্মৃতি রচনার উৎসাহ। প্রবীণ, অপ্রবীণ অনেক লেখক লেখিকা আত্মস্মৃতি রচনা করিয়াছেন, এখনো অনেকে লিখিতেছেন। হঠাৎ এই উৎসাহের কারণ কি? মানুষ সর্বদাই আত্মপ্রকাশের নব নব পন্থা সন্ধান করিতেছে, কাব্য, উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রবন্ধাদি লিখিতেছে। আত্মস্মৃতি রচনার মূলেও এই উৎসাহ বিদ্যমান বলিয়া মনে হয়। উপন্যাস, গল্প, কবিতা প্রভৃতির নূতন নূতন রূপ সন্ধান করিতে করিতে বাঙালী সাহিত্যিকগণ একটা কানা গলির মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, নূতন রূপ আপাতত চোখে পড়িতেছে না। খুব সম্ভব সেইজন্যই আত্মস্মৃতি রচনার দিকে ঝোঁক পড়িয়াছে। কারণ, সাহিত্যের সব শাখার মধ্যে আত্মস্মৃতিই একমাত্র রচনা (সঙ্গে অবশ্য রূপকথাও আছে) যাহার বৈশিষ্ট্য তাহার form বা রূপের উপর নির্ভর করে না। নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প কাব্য কালক্রমে সকলেরই জলুস কিছু হ্রাস পায়, কারণ তাহাদের জলুসের অনেকটা নির্ভর করে তাহাদের রূপের অভিনবত্বের উপরে, সেই অভিনবত্বের গৌরব কমিলে তাহাদের গৌরব কমিয়া আসে। যেহেতু আত্মকথা ও রূপকথা রূপনির্ভর নয়, সেই জন্য কালক্রমে তাহাদের গৌরব কমে না। একটা উদাহরণ দিই। নবীন সেনের কাব্যের একসময়ে যে গৌরব ছিল এখন আর তাহা নাই, কিন্তু 'আমার জীবন' এখনো সুখপাঠ্য আছে। আবার 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' কখনো পুরানো হইবে না।

নূতন রূপের সন্ধানে সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের বেগ যখন মন্দ হয় ঠিক সেই সময়টাতেই স্মৃতিকথা সাহিত্যের গতি প্রবল হইয়া ওঠে। ইংরেজি সাহিত্যে তেমন একটা সময় অষ্টাদশ শতাব্দী। এই যুগে লিখিত বস্‌ওয়েল কৃত জনসন জীবনী (বস্তুত ইহা বস্‌ওয়েলের মুখে জনসনের আত্মকথা), গিবনের আত্মকথা, Pepys ও Evelyne-এর ডায়ারি ইংরেজি সাহিত্যের অবিস্মরণীয় রত্ন।

রবীন্দ্রনাথের প্রকাণ্ড সৃষ্টিকর্মের পরে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিমুখী প্রয়াস স্বভাবতই শিথিলগতি। সাহিত্যিকগণ এখন নূতন নূতন রূপের সন্ধানে ব্যস্ত, নূতন রূপ এখনো অনাবিষ্কৃত, কাজেই স্বভাবের নিয়মেই এমন একটি বিষয়ের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে যাহার বৈশিষ্ট্য রূপনির্ভর নয়। আগেই বলিয়াছি সেটি আত্মকথা। আত্মকথার সহিত রূপকথার সাম্য ঘোষণা করিয়াছি, কিন্তু এক হিসাবে আত্মকথাও একপ্রকার রূপকথা। মানুষ যখন তেপান্তরের মাঠে রাজপুত্র ও রাজকন্যার সন্ধান না করিয়া নিজের জীবনে করে, নিজেকে নায়ক সাজাইয়া কাহিনী লিখিতে বসে তখনই রূপকথার বকলমে আত্মকথা লিখিত হইতে থাকে। মানুষের বয়স যতই হোক নিজের কাছে সে সর্বদাই শিশু, সেই শিশুর তৃপ্তির জন্যই আত্মকথা লিখিত হইয়া থাকে। এই জন্য অতি সাধারণ মানুষেও আত্মকথা লিখিতে সঙ্কোচবোধ করে না, কারণ, অপরের চোখে যেমনি হোক নিজের চোখে মানুষ সর্বদাই Hero বা নায়ক। এই কারণেই অতি সাধারণ লোকের আত্মকথাও আদরণীয় হইয়া থাকে, অপরের চোখে তাহার মূল্য যেমনি হোক নিজের কাছে তাহার যে মূল্য, সেই মূল্যের মূলধনে গঠিত বলিয়াই তাহার আত্মকথা চিত্তাকর্ষক হয়। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা একপ্রকার নিশ্চয় যে আত্মকথা রচনায় এবং আত্মকথা পাঠে মানুষ কখনো শ্রান্তিবোধ করিবে না।

সম্প্রতি শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার রচিত 'হারানো অতীত' নামে আত্মকথা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার

প্রবীণ লেখিকা, কিন্তু তাঁহার সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত 'প্রায় ছেলেবেলা হইতেই'। সেই সময় হইতে অত্যাবধি গদ্যে ও পদ্যে বঙ্গবাণীকে তিনি অলঙ্কৃত করিয়া আসিয়াছেন। সাহিত্য জীবনের উপান্তে 'হারানো অতীত' লিখিয়া বাংলা সাহিত্যের আত্মকথা পর্যায়ে আর একখানি গ্রন্থ তিনি সংযোজিত করিয়া দিলেন। কিন্তু বইখানাকে তাঁহার ব্যক্তিজীবনেব কাহিনী মাত্র মনে কবিলে ভুল হইবে—ইহা 'সেকালের ও একালেব মিলন গ্রন্থি'। 'অতীতের দিন ও রাত্রি, সুখ ও দুঃখ, কতই বিচিত্র অনুভূতি। আজ জীবন সায়াহ্নে অস্তরবির আলোকে রঞ্জিত দিগন্তেব মতো তাহা মনোনেত্রের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে।' লেখিকা সুনিপুণভাবে সেকালের ফুলের সঙ্গে একালেব ফুল মিলাইয়া মাল্য রচনা কবিযাছেন, সূত্র তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন, কিন্তু মালার সূতার মতোই তাহা প্রচ্ছন্ন বহিযাছে, এখানেই লেখিকার শিল্পনৈপুণ্য। আত্মকথাব সবচেয়ে বড় বালাই অনেক ক্ষেত্রেই 'অহং'-টা প্রবল হইয়া ওঠে; কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সেই 'অহং-টা অনেক কাল আগে শ্রীগৌরাঙ্গ পদে সমর্পিত হইয়াছে, কাজেই দুর্গতি ঘটাইতে পাবে নাই। কিন্তু কথায় কথায় শেষের প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছি, আগে প্রথমদিকের কথা সাবিয়া লই।

'সাহিত্যচর্চায় হাতে খড়ি' প্রসঙ্গে লেখিকা নিজেব বাল্যজীবনের ও সাহিত্যচর্চার কাহিনী বলিয়াছেন। লেখিকার বচনাব সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন, যে তিনটি মূল উপাদানে তাঁহার সাহিত্য ও জীবন গঠিত। একটি মনস্বিতা, এটি তিনি পিতৃকুল হইতে পাইয়াছেন। সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিতে তিনি অভ্যস্ত, এইজন্যই তাঁহাব পক্ষে পরিণত বয়সে হিন্দু কোড বিল সমর্থন সম্ভব হইয়াছিল। এই মনস্বিতা তাঁহার পিতৃকুলেব সম্পত্তি, তাঁহার অগ্রজ সরসীলাল সরকার পেশাতে ডাক্তাব ছিলেন বটে কিন্তু মনীষার চর্চাতে ছিল তাঁহার নেশা। Psycho Analysis-এর দৃষ্টিতে তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের চর্চা করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, আমার নিজের ধারণা বইখানার যথোচিত সমাদর হয় নাই। লেখিকার

জীবনে দ্বিতীয় উপাদান ভক্তি, এটি মাতৃকুল হইতে প্রাপ্ত, তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের ভাগ্নী। ঘোষ ভ্রাতৃগণ দেশে রাজনীতিকরূপে সমধিক পরিচিত হইলেও আসলে তাঁহারা ভক্ত। তাঁহাদের গৌরাঙ্গভক্তি ভাগ্নীতে বর্তিয়াছে। তৃতীয় উপাদান দেশপ্রেম, খুব সম্ভব এটিও মাতৃকুল হইতে প্রাপ্ত। তাঁহার মুখে 'বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে' আবৃত্তি শুনিয়া কবিবর হেমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "হবে না কেন? অমৃতবাজারের ভাগ্নীতো।" মোটের উপর এই তিনটি উপাদানের সার্থক সমন্বয় তাঁহার জীবন ও সাহিত্য, যাহার বিবরণে হারানো অতীত চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্বোক্ত তিনটি উপাদান যাঁহার প্রভাবে ঘনীভূত হইয়া লেখিকার জীবনরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তিনি লেখিকার ঠাকুরমা রাসসুন্দরী দাসী। এই মহীয়সী নারীর জীবনকথা শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণীয়। লেখিকা বলিয়াছেন—"আমার ঠাকুরমার জীবনকাহিনী এত অপূর্ব যে উপন্যাস ও উপকথার ভিতরেও হয়তো তেমন আশ্চর্য ও অপূর্ব ব্যাপারের সন্ধান পাওয়া যায় না।" লেখিকার উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। আশ্চর্য এই মহিলা। গৃহদেবতা মদনগোপাল ইঁহার জীবনের মূলাধার। মদনগোপাল তাঁহার কাছে মন্দিরাধিষ্ঠিত বিগ্রহমাত্র ছিলেন না, সংসারের আর দশজন মানুষের মতোই বাস্তব এবং ততোধিক সত্য ছিলেন। তাঁহার প্রতি কি শ্রদ্ধা ভক্তি, আর প্রকৃত ভক্তিজাত কি সরলতা। অথচ সাংসারিক কর্তব্যপালনে রাসসুন্দরীর ত্রুটি নাই, কেন থাকিবে, ঐ সংসারটার মালিকই যে মদনগোপাল। সেইসঙ্গে আবার কি সাহস—আর আশ্রিত বাৎসল্য। দুর্দান্ত মুসলমান জমিদারের সঙ্গে কি সাহসের সঙ্গে তিনি কর্মচারী মারফৎ আলাপ আলোচনা চালাইয়া দুরূহ সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিয়াছিলেন— আশ্রিত প্রজাগণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে। মদনগোপাল সম্বন্ধে লেখিকা যে-সব কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন অনেকের কাছে সে-সব অলীক বা কুসংস্কার বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু কুসংস্কার কি

মানুষকে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর করিয়া দিতে সক্ষম? আসল কথা এই শ্রেণীর ব্যক্তি (বিশেষভাবে নারী) ধীরে ধীরে আমাদের সমাজ হইতে লোপ পাইতেছে; সমাজের পক্ষে ইহা সুলক্ষণ নহে। রাসসুন্দরী দাসীর চৈতন্যভাগবত পাঠের কাহিনী "উপন্যাস ও উপকথার" চেয়েও বিস্ময়কর—কারণ সে বিবরণ সব ঔপন্যাসিকের মাথাতে আসিবে না—তাহা এমনি বিস্ময়কর। এই সেকেলে বধূটি বাংলা সাহিত্যের একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন—'আমার জীবন'। গ্রন্থখানি এখন সম্পূর্ণ দুষ্প্রাপ্য। লেখিকা তাঁহার পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করিলে বাঙালী পাঠক সমাজ এই আদর্শ রমণীর জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবে।

সেকালের কথা, কাঁঠালপোতার বাড়ি, জব্বলপুরের স্মৃতি, পুরানো দিনের দানাপুর, ঢেঙ্কানল রাজা ও কপিনাস পাহাড় প্রভৃতি অধ্যায়ে লেখিকা হারানো অতীতকে সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ, সহজ রেখায় এমন অনায়াসে বন্দী করিয়াছেন যে, হঠাৎ পড়িলে ভ্রম হয়, মনে হয় কোন কলাকৌশল বুঝি নাই। দেশী বিদেশী, বাঙালী অবাঙালী, রাজা ভিখারী প্রভৃতি নরনারী চরিত্র অঙ্কনে, নর্মদা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে সর্বত্র একটি পুরা আঁচড়েরও প্রয়োজন হয় নাই, আধখানাতেই পুরা ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে—আর সকলের উপরে বিস্তারিত একটি বিদায়ের, একটি অনুরাগের, যাহা আর কখনো ফিরিবে না সেই হারানো অতীতের জন্য সকরুণ বেদনার একটি রক্তরাগ।

"জীবন যখন আস্তে চলে
রঙটি থাকে লেগে
প্রিয়জনের মনের কোণে
শরৎ সন্ধ্যা মেঘে।"

সবশেষে আলোচনা করিবার ইচ্ছায় চারিটি অধ্যায় রাখিয়া দিয়াছি, ব্যাস সরোবর, পুরীর সমুদ্রতীর, মালপাড়ায় কীর্তন, আর ধূলটে কীর্তন। এই অধ্যায়গুলিতে লেখিকা সংক্ষেপে ও প্রচ্ছন্নভাবে নিজ আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বলিয়াছেন। এসব কথা আভাসে

ইঙ্গিতে ছাড়া বলা চলে না, লেখিকাও অন্যরূপ চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু তৎসত্বেও বুঝিতে পারা যায় যে, আধ্যাত্মিক জীবন ও শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তিই তাঁহার জীবনের কেন্দ্র। তাঁহার সাহিত্য সেবা, দেশ সেবা, সমাজ সেবা সকলেরই মূলে সর্বরসের আধার ঐ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা। এ বিষয়ে অধিক বলিতে আমি অনধিকারী। আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাস বলিয়া অধ্যায়গুলি নীরস মনে করিবার কারণ নাই, ব্যাস সরোবর দর্শন ও মালপাড়ায় কীর্তন শ্রবণের কাহিনী তো রীতিমতো adventure। তাঁহার জীবনের মতো তাঁহার বইখানিও 'ধূলট কীর্তনে' আসিয়া স্পৃহণীয় উপসংহার লাভ করিয়াছে।

"শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী
মত্ত মধুকর ভোরণী"

ভক্তিপ্রীতির সেই অবিনশ্বর পুষ্পবনে লেখিকার চিত্ত আসিয়া শেষপর্যন্ত অনন্ত আশ্রয় লাভ করিয়াছে। এই বইখানি মাত্র নয়, তাঁহার অনেক রচনা পড়িতে পড়িতে, তাহাদের অন্তঃনিস্থত সরল ভক্তির ধারা দেখিতে দেখিতে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ লেখিকাকে দয়া করিয়াছেন। কিন্তু এসব কথা বুঝাইবার নয়, আর এই অবিশ্বাসের যুগে বুঝাইতে গেলেও কেহ বড় বুঝিবে না—তাই সে চেষ্টা করিব না। শুধু এই বলিয়া আজ ক্ষান্ত হইব যে, বাংলা সাহিত্যের যে প্রবাহিনীটি শ্রীগৌরাঙ্গপদনিঃসৃত সেই কল্লোলিনীতে লেখিকা আর একটি শান্ত স্নিগ্ধ ভক্তিপ্রবাহ যোগ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেই ভক্তি-প্রবাহের সঙ্গে তাঁহার নামটিও বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়ভাবে থাকিয়া যাইবে।

বাংলা সাহিত্যে ক্লসিকাল রস

ইংরেজিতে একটা প্রবচন আছে, Man does not live by classics alone। কথাটি খুব সত্য। প্রাচীন সাহিত্য অশেষ গুণের আধার হওয়া সত্ত্বেও তাহাতে এমন কিছু অভাব আছে যাহাতে আধুনিক মন সম্পূর্ণ তৃপ্তি পায় না। আধুনিক মন সাহিত্যে আধুনিক রস সন্ধান করে। এই সন্ধানের সূত্রেই প্রত্যেক যুগ নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করে। এ সবই সত্য। কিন্তু classics বা প্রাচীন সাহিত্য বা সাহিত্যের ধ্রুবপদ অংশে এমন কিছু সর্বজনীনতা আছে যাহাতে প্রত্যেক যুগ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সার্থকতাও লাভ করে। দুইভাবে ইহা ঘটে। পুরাতনের নূতন ভাষ্য রচনা করিয়া মানুষের মন তৃপ্তি পাইতে পারে। হোমারের অডিসি কাব্যের নায়ক সমুদ্রবক্ষে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। টেনিসন তাঁহার ইউলিসিস কবিতাটিতে ইউলিসিসের অভিজ্ঞতাকে নূতন ভাষ্যে সঞ্জীবিত করিয়া আধুনিক মনের পক্ষে হৃদ্য করিয়া তুলিয়াছেন। হোমারের 'তন্ময় জগৎ' টেনিসনের হাতে 'মন্ময় জগৎ' হইয়া উঠিয়াছে। হোমারের অডিসিতে মহত্ত্ব, টেনিসনের ইউলিসিসে নৈকট্য ; হোমারের পাত্রে সর্বজনীন সুধা, টেনিসনের পাত্রে আধুনিক মনের সুধা ; হোমারের কাব্য ভাবীকালকে আনন্দদান করিবে, টেনিসনের কবিতাটি পরবর্তী কালের হৃদ্য মনে না হইতেও পারে।

আর এক রকমে প্রাচীন সাহিত্য আধুনিক তৃষ্ণার পানীয় জোগাইতে পারে, নূতন ভাষ্য রচনা করিয়া নয়, নূতন যুগের উপযোগী

পরিবর্তন সাধন করিয়া। পৃথিবীর সাহিত্যে সর্বকালেই এমন ঘটিয়াছে, এখনো ঘটিতেছে, ইহাকে বলা যাইতে পারে, প্রাচীনের নবীকরণ। টেনিসন কাহিনীকে অবিকৃত রাখিয়া নূতন ভাষ্যের দ্বারা আধুনিক মনের আসন রচনা করিয়াছেন। কিন্তু অনেক লেখক প্রাচীন সাহিত্যের উপরে হস্তক্ষেপ করেন, কাহিনী অংশের অদল বদল করেন, নূতন তথ্য সংযোজিত করেন এবং নূতন ভাষ্য ও নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত করিয়া তাহাকে নূতন যুগের নাগরিক অধিকার প্রদান করিয়া দূরবর্তী মহত্ত্বকে আধুনিক মনের নিকটে আনিয়া দেন।

বাংলা সাহিত্যের এমন উদাহরণ অবিরল।

মধুস্দনেব মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনী সর্বাংশে আর্য রামায়ণকে অনুসরণ করে নাই। তাঁহার রাম, রাবন, ইন্দ্রজিৎ নামে মাত্র বাল্মীকির রাম, রাবন, ইন্দ্রজিৎ। বাল্মীকির নায়কদের চেয়ে ইহাদের বেশী মিল, আন্তরিক মিল মধুসূদনের সমকালীন ইয়ংবেঙ্গলের সহিত। রসিককৃষ্ণ মল্লিকের 'I don't believe in the sacredness of the Ganges' মেঘনাদবধ কাব্যের আগ্নেয়গিরির মুখে উত্থিত হইতে থাকে, অগ্নিতে, গলন্ত ধাতুপিণ্ডে, বাষ্পে ও বজ্রনির্ঘোষে। মেঘনাদবধ কাব্যের লঙ্কা-কাণ্ডের স্থান কোন দূরবর্তী লঙ্কা দ্বীপ নয়, সেকালের গোলদীঘি ও হিন্দু কলেজ। মধুসূদন পুরাতন পাত্রে নূতন নূতন রস সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্র ঠিক এই কাজটি পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার বৃত্রসংহার কাব্য 'পাঠ্য-পুস্তকের'. জগতেব বাহিরে জীবনলাভ করিতে পারিল না।

এবারে রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে দুটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতার মূল মহাভারতে। মূলে 'প্রথম রমণী দরশমুগ্ধ' ঋষ্যশৃঙ্গই প্রধান পাত্র। তাহার বিস্ময়, তাহার উল্লাস, তাহার অননুভূতপূর্ব অভিজ্ঞতাই কবিতাটির প্রাণ, যে নারী তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল সে সামান্য বারযোষিৎ মাত্র। রবীন্দ্রনাথে ইহার সাকুল্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মহাভারতের বারযোষিৎ আধুনিক কবি কর্তৃক দেবীপদে অভিষিক্ত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের দ্বারা

কবিতাটিকে কবি আধুনিক মনের পক্ষে সুপেয় করিয়া তুলিয়াছেন। আধুনিক sophisticated মন ঋষ্যশৃঙ্গের অভিজ্ঞতাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে, নতুবা প্রহসনে পরিণত করিবে, কিন্তু নারীহৃদয়ের বেদনাকে অনায়াসে মর্যাদা দান করিয়া স্বীকার করিয়া লইবে। এখানে কাহিনীর পরিবর্তন তেমন হয় নাই যেমন হইয়াছে ভাষ্যের সংযোজনা।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নাটকের মূলও মহাভারতে। রবীন্দ্রনাথ মূলের কাহিনী ও ভাষ্য, দুইয়ের পরিবর্তন করিয়াছেন। মূলের খনি হইতে তিনি ধাতু সংগ্রহ করিয়া নূতন যুগের ছাঁচে পাত্র গড়িয়া লইয়াছেন আর তাহাতে আধুনিক মনের আধেয় রক্ষা করিয়াছেন। প্রাচীন ছাঁচে ঢালা চিত্রাঙ্গদা কাহিনী যতই মনোরম হোক না কেন, আধুনিক মনকে সম্পূর্ণ তৃপ্তিদান করিতে সক্ষম হইবে না।

প্রাচীনের নবীকরণ প্রচেষ্টার ফলেই যুগে যুগে নূতন পুরাতনের সৃষ্টি, সংস্কৃত ভাষায় রচিত যাবতীয় পুরাণই এইরূপ প্রতিক্রিয়ার ফল। মহাভারতের "শকুন্তলা" পুরাণের "শকুন্তলা" নয়, আবার কালিদাসের "শকুন্তলা" এ দুই হইতেই ভিন্ন। আবার গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ "শকুন্তলা"র যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, খুব সম্ভব "মহাকবির কল্পনাতে ছিল না তার ছবি।"

যাবতীয় classics সাহিত্য আরব রূপকথার ফিনিক্স পাখির মতো আপনি দেহ হইতে যুগে যুগে নবতর সৃষ্টি করিয়া মানুষের মনকে তৃষ্ণার বারি জোগাইয়া আসিতেছে। Classics সাহিত্যে এমন কিছু সর্বজনীনতা, স্থিতিস্থাপকতা আছে যাহা নূতন ভাষ্য, নূতন সংযোজনা ও নূতন পরিবর্তন বহনক্ষম। এখানেই তাহার বৈশিষ্ট্য ও অর্বাচীন সাহিত্য হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য। কাজেই 'man does not live by classics alone'—সর্বাংশে সত্য নয়, অনেক সত্যের মতই অর্ধসত্য মাত্র।

২

মনীষী সাহিত্যিক শ্রীসুবোধ ঘোষ কিছুকাল আগে মহাভারত হইতে প্রেম কাহিনী অবলম্বনে গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। এগুলি

যখন দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে তখনি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আমারও করিয়াছিল। তারপরে এখন গল্পগুলি 'ভারত প্রেমকথা' নামে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

অনেক শক্তিমান বাংলা-সাহিত্যিক দিগ্‌দর্শনহীন তরীর মতো অকূল সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। কেহ কেহ বিদেশের ঘাটে নোঙর ফেলিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সে বন্ধন যতই দৃঢ় হোক তাহা ঘাটের বন্ধন, ঘরের বন্ধন নয়, আর ঘাটের বন্ধনে লোক বদ্ধ হয়, আপন হয় না। ইঁহাদের যে ঘরের বন্ধন নাই, তাহার কারণ ইঁহারা অনেকেই ঘরের পরিচয় জানেন না। কাল্‌চার বা সংস্কৃতির গালবাদ্য সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে এযুগের বাঙালী সাহিত্যিকদের যেমন দীনতা এমন বোধ করি আর কোন সাহিত্যিক পর্বে দেখা যায় নাই। রামায়ণ মহাভারত না জানিলে যে ভারতবর্ষকে জানা যায় না এ সত্যটাও বহু লেখকের অজ্ঞাত। এহেন অবস্থায় সুবোধবাবুর ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান ও শ্রদ্ধা বাংলা সাহিত্যের একটি আশার বিষয়। আর সেই জ্ঞান ও শ্রদ্ধার দ্বারা চালিত হইয়া তিনি মহাভারতের কাহিনীকে নিজের শিল্পসৃষ্টির বিষয় করিয়া তুলিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, দিব্য শিল্পদৃষ্টির বলে সুবোধবাবু বুঝিয়াছেন যে, প্রাচীনের অনুকরণ করিলে চলিবে না, প্রাচীনকে নবীন করিয়া তুলিতে হইবে। প্রাচীনের বিন্দু-বিসর্গ দেখিবামাত্র যাঁহারা 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলিয়া চিৎকার করিয়া ওঠেন তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, ঐতিহ্যবিবর্জিত হইলেই সার্থক সৃষ্টি হয় না। সার্থক শিল্পসৃষ্টির মূলে দুইটি স্বতোবিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া আবশ্যক, Tradition ও Freedom, সংস্কার ও স্বাধীনতা। 'ভারত প্রেমকথা'র গল্পগুলিতে স্বাধীনতা ও সংস্কারের অতি অপূর্ব মিলন হইয়াছে, আর সেইজন্যই এই প্রেমকথাগুলি অতি উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে।

এগুলির মধ্যে ট্রাডিশন বা সংস্কারের উপাদান খুব স্পষ্ট ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। স্বাধীনতার বা নূতনত্বের দিকটা অভাবিত, তাই তাহার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

সংবরণ ও তপতীর কাহিনীটি গ্রহণ করা যাক।

মূল কাহিনীতে সমদর্শিতার ভাবটি নিতান্ত বীজাকারে বর্তমান। ভগবান আদিত্য সমদর্শী। তাঁহার কন্যা তপতীও সমদর্শী—আর তাঁহার শিষ্যও সমদর্শী। এই পর্যন্ত। কিন্তু তপতী ও সংবরণের সমদর্শিতা সংসারের ও প্রণয়াবেগের দ্বন্দ্বে নিক্ষিপ্ত হইলে কি রূপ ধারণ করে মূলে তাহা নাই। সুবোধবাবু তাহাই আমাদের দেখাইয়াছেন। বস্তুত তপতী ও সংবরণের সমদর্শিতার মূলে সত্য অভিজ্ঞতার, সাংসারিক পরীক্ষার বাস্তব ভিত্তি ছিল না, তাই তাহাদের দাম্পত্য জীবনের প্রথম সংঘাতেই সমদর্শিতার ভাব বিলোপ পাইল। প্রথম প্রেমের মোহে আত্মদর্শী তপতী ও সংবরণ আত্মদর্শী অর্থাৎ আত্মসুখদর্শী হইয়া সমস্ত রাজকর্তব্য বিস্মৃত হইয়া রাজ্যে অরাজকতা ডাকিয়া আনিবার হেতু হইল। তারপর ধীরে ধীরে অনেক আঘাতে, অনেক তপস্যায়, অনেক দুঃখবরণের দ্বারা তাহাদের মোহ ভাঙিয়াছে, আর তখনই তাহারা সমদর্শিতার যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারিয়াছে। তপতী ক্ষণকালের মোহে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, সে কেবল সংবরণের মহিষী নয়, তাহার রাজ্যের রানী ; ভুলিয়াছিল যে, সে কেবল পত্নী নয়, লোকমাতা। অবশ্য সংবরণও সমকালেই ইহা স্বীকার করিয়াছে। তাই প্রেমকথাটির সুখাবসান। অন্যথা ইহা রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রানী বা তপতীর মত ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পারিত। সংবরণ ও তপতী কাহিনীটি খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল, তাঁহার কাব্যে একবার অন্তত তপতী সংবরণের প্রেম-তপস্যার উল্লেখ আছে। আর রাজা ও রানীর আমূল পরিবর্তিত রূপের তপতী নামকরণ নিশ্চয়ই বিশেষ অর্থ বহন করে।

এখন নারীর পত্নী ও লোকমাতারূপ দ্বৈতমূর্তির ভাবটি সেকালেও ছিল, কিন্তু বীজাকারেই ছিল, কারণ সেকালে নারীর বিচরণ-ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বল্পপরিসর ছিল। কিন্তু একালে পুরুষ ও নারীর সঞ্চরণ-

ক্ষেত্র সমব্যাপক, অন্তত তাহাই হইতে চলিয়াছে। একালে নারীকে, প্রত্যেক নারীকে, কেবল মহীয়সীদের মাত্র নয়, যুগপৎ পত্নী ও লোকমাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হয়, পদে পদে তাহার পরীক্ষা। কাজেই সেকালে যাহা বীজমাত্র ছিল একালে তাহা বনস্পতি হইতে চলিয়াছে। ইহা মডার্ন আইডিয়া ও মডার্ন সমস্যা। সুবোধবাবুর মনীষার প্রমাণ এই যে, মূল কাহিনীতে আরও পাঁচটা সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যুগোপযোগী সম্ভাবনাটিকে গ্রহণ করিয়াছেন, আর তাঁহার শিল্প-দক্ষতার প্রমাণ এই যে (এখনও যদি প্রমাণের আবশ্যক করে), সেই সম্ভাবনাটিকে হৃদয়স্পর্শী কাহিনীতে পরিণত করিয়াছেন। কথাটি যুগপৎ যুগস্পর্শী ও হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে।

এইভাবে প্রত্যেকটি কাহিনী বিশ্লেষণ করিয়া সুবোধবাবুর মনীষার ও শিল্পকৌশলের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে, অধিকাংশ পাঠকে তাহা হইলে আর বইখানা স্পর্শ করিবেন না, এই ভূমিকা পড়িয়া বিশেষজ্ঞতা লাভ করিবেন। আরও একটা কারণ আছে। কাহিনীগুলি কেবল ভাবের বাহনমাত্র নয়, নিজ মূর্তিতে সমুজ্জ্বল ও নিজ প্রাণে সঞ্জীবিত। প্রাচীন কাহিনীর আধারে সুবোধবাবু চিরকালীন সুখ-দুঃখের, হাসি-অশ্রুর অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন। এগুলি জ্ঞানের বস্তু নয়, জীবনের সামগ্রী।

পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা কাহিনীর সুশোভনার চেয়ে অধিকতর মডার্ন উওম্যান তো বাংলা সাহিত্যে দেখি নাই। শেষের কবিতার কেটি সিসি লিসির দল ও শেষ প্রশ্নের কমল তার কাছে নিষ্প্রভ। মডার্ণ উওম্যানের চরিত্রে Passion বস্তুটির অভাব, তাহাদের হৃদয়ে Passion নাই, হাবভাবে তাহার ছলটুকু মাত্র আছে। সেইজন্য তাহারা অসহ্য। আর Passion-এর তড়িৎপুঞ্জচালিত সুশোভনা দুঃসহ উল্কাপিণ্ডের ন্যায় মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায়, জ্বলন্ত বর্তিকার ন্যায় দুঃসহ। স্বাধীন, দুর্বার, সহজ জীবনের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বেগের প্রবল উত্থান-পতনও বোধ করি লোপ পাইয়াছে। সেকালে বিরহবিকারে যক্ষের হাতের

কনক-বলয় খসিয়া পড়িয়াছিল, একালের যক্ষরা বিরহে শুইয়া বসিয়া বিছানায় গড়াইয়া মোটা হইয়া যায়।

অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রার তপস্বিনীমূর্তিতেই আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু তাহার চরিত্রের যে আর-একটা দিক আছে সুবোধবাবু তাহা দেখাইয়াছেন। সে চিরন্তনী নারী। অলঙ্কার পরিত্যাগে সে কী দুঃখ। আবার অলঙ্কার-লাভেই বা সে কী আগ্রহ। কিন্তু স্বামী যখন বহু-বাঞ্ছিত অলঙ্কাররাশি তাহার পায়ের কাছে আনিয়া স্তূপীকৃত করিলেন, তখন সেগুলির দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। চিরন্তনী ছলনাময়ীর এ কেমন চিরন্তন ছলনা। ঐ লীলাটুকু নারীচরিত্রে আছে বলিয়াই বোধ করি তাহার ঈর্ষা, ক্ষুদ্রতা, পরশ্রীকাতরতা, সন্দেহবাতিকতা সত্ত্বেও নারী সুসহ।

আর অগ্নির বহুনারী ও পরনারী-স্বাদ-পূরণের জন্য প্রেমিকা স্বাহার সে কী ছদ্মবেশে কপটাভিনয়! এ কাহিনীটি যেমন করুণ, তেমনি মনোরম, তেমনি নাট্যরসে গম্ভীর।

আর সেই যে সুলভা একবার আসিয়া জনকের আত্মজ্ঞানের পরীক্ষা করিয়া গেল। শান্ত সমুদ্রকে উদ্বেল করিয়া চন্দ্র যেমন নির্বিকারভাবে অস্তমিত হয়, তেমনি করিয়া সুলভা প্রস্থান করিল। জনক তাহাকে ভুলিতে পারে নাই, পাঠকেও তাহাকে ভুলিবে এমন সম্ভাবনা দেখি না।

এমন করিয়া দৃষ্টান্ত দিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে, কাজেই প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও, অন্য দু'একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

৩

ভাষাপ্রবাহ নদীপ্রবাহের মত, একথা অনেকেই বলিয়াছেন। কিন্তু দুয়ে প্রভেদ এই যে, নদীপ্রবাহের বিস্তার কেবল দেশে আর ভাষা-প্রবাহ বিস্তৃত দেশে ও কালে।

সুবোধবাবু বিষয়ভেদে ভিন্ন ভাষারীতি ব্যবহার করেন। তাঁহার আধুনিক জীবনের গল্পগুলিতে, ভারতীয় ফৌজের ইতিহাসে এবং অন্যান্য

প্রবন্ধে যে ভাষারীতি তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, এখানে সে ভাষারীতি নয়। এখানে তাঁহার ভাষাপ্রবাহ মহাভারতের দেশে কালে বিস্তারিত, তাই তাহার জল গভীর, ধ্বনি গভীর এবং কললাবণ্যে উচ্ছিত শীকর-কণায় ইন্দ্রধনুর লীলা। এখানে তাঁহার ভাষাপ্রবাহের নির্মল দর্পণে কোথাও বা হিমালয়ের ধবলিমার শুভ্র প্রতিবিম্ব, কোথাও বা প্রাচীন অরণ্যানীর শাখাজটিল অন্ধকারের গাঢ় প্রতিচ্ছায়া, আর কোথাও বা অতিকায় নরনারী, রাজরাজন্যগণের বাসযোগ্য বিচিত্রবর্ণ সৌধচূড়ার প্রতিচ্ছবি। যে-কোন স্থান হইতে উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে।

"সেই নিদাঘের মধ্যদিনের আকাশ সেদিন তপ্ত তাম্রের মত রক্তাভ হ'য়ে উঠেছিল, বলাকামালার চিহ্ন কোথাও ছিল না। জ্বালাবিগলিত স্ফটিকের মত স্বচ্ছ সেই সরোবর সলিলে মীনপংক্তির চাঞ্চল্যও ছিল না। খর সৌরকরে তাপিত এক শৈবালবর্ণ শিলানিকেতন বহ্নিস্পৃষ্ট মরকত-স্তূপের মত সরোবর-প্রান্তে যেন শীতল স্পর্শসুখের তৃষ্ণা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মণ্ডুকরাজ আয়ুর প্রাসাদ।"

কিংবা—

"আলোকে আপ্লুত হয়ে উঠেছে পূর্ব গগনের ললাট। সূক্ষ্ম অংশুক নীশারের মত ধীরে ধীরে অপসৃত হয় খিন্ন কুহেলিকা, আর বিগলিত দুকূলা কামিনীর মতই শরীরশোভা প্রকট ক'রে ফুটে ওঠে কূলমালিনী এক তটিনীর রূপ।"

কিংবা—

"পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে কুটীরের বাইরে এসে দাঁড়ায় সুকন্যা। দেখতে পায়, যৌবনাঢ্য দুই পুরুষের দুই মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে প্রাঙ্গণের বক্ষের উপরে। উভয়েই সমান সুন্দর, একই তরুর দুই পুষ্পের মধ্যে যতটুকু রূপের ভিন্নতা থাকে, তা-ও নেই। কান্তিমান, দ্যুতিমান ও বিশাল বক্ষঃপট, নবীন শাল্মলী-সদৃশ যৌবনান্বিত দুই দেহী।"

ভাষায় মৃদঙ্গ বাজিতেছে। এমন বর্ণাঢ্য, রূপাঢ্য, ধ্বনিসুন্দর ভাষা বাংলা সাহিত্য হইতে লোপ পাইতে চলিয়াছে, ইহার চেয়ে দুঃখের আর

কি হইতে পারে। মহাভারতীয় পরিবেশ রচনা এ ভাষারীতি ছাড়া অসম্ভব। বাংলা সাহিত্যে যখনই যিনি ক্ল্যাসিকাল রস সৃষ্টি করিয়াছেন, এই ভাষা-রীতিকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইদানীং অধিকাংশ লেখক সে প্রয়োজন অনুভব করেন না, তাই অব্যবহারে, অপরিচয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞানে এহেন ভাষারীতি নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

একালের অধিকাংশ লেখক একটি বিষয় ভুলিয়া গিয়াছেন। ভাষার নিজস্ব একটি মহিমা আছে, ভাষা কেবল ভাবের বাহন নয়। পেশীবহুল কান্তিসমুজ্জ্বল অশ্বের মূল্যবান সাজসজ্জাও যে অশ্বের অঙ্গীভূত। কিন্তু না, তা হইবার উপায় নাই, ফক্‌রে ঘোড়ার পিঠে একখানা ছেঁড়া চট পাতিয়া আমরা যে গণসাহিত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছি, কিন্তু ভুলিয়া যাই যে, গণসাহিত্যের কাছাকাছি পৌঁছিবার অনেক আগেই উক্ত ফক্‌রে ঘোড়া ও তাহার আরোহী সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিবে। যদি কেহ শুধান যে এমন কেন হইল, তবে বাধ্য হইয়া Dr. Johnson এর ভাষায় উত্তর দিতে হয়—"Ignorance, madam, pure ignorance!" বস্তুত গণসাহিত্যের উপাদান বস্তিতে বা গোলদীঘিতে নাই, সঞ্চিত আছে ওই রামায়ণ মহাভারতে।

'ভারত-প্রেমকথা'র প্রাপ্য প্রশংসা সুবোধবাবু হাতে হাতে পাইবেন মনে হয় না, কারণ কালধর্ম প্রতিকূল, "Time is out of joint!" তবে সাহিত্যের ইতিহাস পড়িয়া এই শিক্ষা পাইয়াছি যে, শতাব্দীতে অন্তত তিন-চার বার সাহিত্যের হাওয়া বদল হয়। বাংলাভাষায় গণসাহিত্যের উত্তরে হাওয়া উজান বহিতে আরও দশ পনর বছর সময় লাগিবে, ততদিন সুবোধবাবু অনায়াসে অপেক্ষা করিতে পারিবেন—আর 'ভারত প্রেমকথা' তো বঙ্গ সরস্বতীর চিরকালীন অঙ্গভূষণ।

বিভূতিভূষণের সরস গল্প

বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গে কয়েকটি ভুল ধারণার প্রচলন আছে। একটি উল্লেখ কবা যাইতে পারে যেমন মেঘনাদ বধ কাব্য বীররস-প্রধান। যুদ্ধ-বর্ণনা প্রধান হওয়া সত্ত্বেও মেঘনাদ বধ কাব্য করুণ রসের নির্ঝর। আর একটি ভুল ধারণা অনেকের মনে সক্রিয়—বিভূতি মুখোপাধ্যায় হাসির গল্পের লেখক। অবশ্য নিছক হাসির গল্প তিনি অনেক লিখিয়াছেন আর সে ক্ষেত্রে তিনি নিঃসংশয়ে অগ্রণী কিন্তু হাসির গল্পের লেখক বলিয়া সংক্ষেপ তাঁহাকে লঘু করিয়া দিবার চেষ্টা নিতান্ত অবিচার। বিভূতিবাবুর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি করুণ রসের, কিন্তু করুণ রস বলিতে চোখের জল বোঝায় না, যেমন হাস্যরস বলিতে ওষ্ঠাধরের ভঙ্গীবিশেষ বোঝায় না। সব রসেব মূল উৎসটা হৃদয়ের মধ্যে, কাজেই এক রসের মধ্যে অন্য রসের আমেজ না থাকিয়া যায় না, তবে বুঝি করুণ রসে হাসির আমেজ কিছু বোশ। তাই করুণ রসের স্রষ্টা বিভূতিভূষণকে অনেকে হাসির গল্পের লেখক মনে করিয়া থাকেন। একথা সত্য, তাঁহার করুণ রসের ভাঁজে ভাঁজে হাসি উছলিয়া ওঠে। যুধিষ্ঠির যে-রাতে দুর্যোধনের কিরীটে আত্মগোপন করিয়া ভীষ্মের শিবিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই আবছায়া অন্ধকারে কিরীটের রত্নরাজি কি ঝলমল করিয়া ওঠে নাই? সাহিত্যে এমন নজির আছে। ডন কুইকসটের গ্রন্থকার করুণা প্রণোদিত হইয়া হাসির তীক্ষ্ণোজ্জ্বল ছুরি হাতে মধ্যযুগের ব্যাধিগ্রস্ত দেহে শল্য চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে ডন কুইকসটের

কাহিনা হাস্যময় মনে হইলেও তাহা জগতের একটি করুণতম কাহিনী। অনেক লেখক হাসির আঘাতে মানুষের অন্তরতম স্থানে প্রবেশ করেন—গভীর ও রহস্যময় বস্তু উদ্ঘাটিত করিয়া দেন—বলা যাইতে পারে ইহা একপ্রকার টেকনিক। বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে ইহা সর্বথা প্রযোজ্য। তাঁহার হাস্যরস মানব-রহস্যকে দ্বিধাবিভক্ত করে—করিয়া তাহার রহস্য পাঠককে দেখাইয়া দেয়। তাঁহার রসসৃষ্টির উপায়ের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ না করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি দিলে বুঝিতে পারিব তাঁহাকে কেন করুণ রসের লেখক বলিয়াছি। রংলাল একটি কুকুর। তাহার অস্ফুট ব্যঙ্গদৃষ্টি নায়ককে বিদেশী পোষাকের মোহপাশ হইতে মুক্ত করিল। ঘটনাটি অন্যথা অবিশ্বাস্য। কিন্তু হাসির সূক্ষ্ম ছুরিকায় বুঝি কিছুই অসাধ্য নয়। করুণার মন্ত্রবারি নিক্ষেপে কুকুর মানুষ হইয়া উঠিয়া এই অসাধ্য সাধন করিয়াছে। আর দুর্বল ভীরু দীনু রক্ষিতের পক্ষে অন্য কি উপায়ে নবাগত দুর্ধর্ষ কাবুলিওয়ালাকে কাবু করা সম্ভব ছিল ? 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' ভগবানও যেখানে দুর্বলকে পরিত্যাগ করেন, বিভূতিবাবু সেখানে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, দেখাইয়া দিয়াছেন হাসির খড়কে দিয়া বক রাক্ষস শাসন করা সত্যই সম্ভব। আর বেচারা রূপলাল! সে যখন সম্পূর্ণ নিরুপায় হইয়া হতাশবোধ করিতেছিল তখন মর্মদর্শী লেখক পরিত্রাণায় দুর্বলানাং—একটি রাসভ জুটাইয়া দিলেন। এই করুণ রহস্যটুকু যদি চোখে না পড়িল তবে বৃথাই গল্পটি পড়িলাম। বিভূতিবাবুর রচনায় সর্বত্র বা প্রায়-সর্বত্র হাসির মহীরুহকে জড়াইয়া উঠিয়াছে করুণ রসের বল্লরী—আর উচ্চতম শাখাপ্রান্ত হইতে হাসির দমকায় ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে করুণার অশ্রুমঞ্জরী। মধুলিড় গৌরীকান্ত বস্তু পুষ্প-রসিক। কিন্তু তিনি অবস্থা বিপর্যয়ে সে রসটাকে ঠেলিয়া আর একটু নীচে চালান করিয়া দিয়াছেন একেবারে জঠরে। কিন্তু নিশ্চয় বলিতে পারি যে এমন বরাবর ছিল না। প্রথম পক্ষের পত্নীর আমলে তিনি ফুলে ফুলে পত্নীকে সাজাইতেন। তাঁহার পুষ্প-প্রীতির সেই প্রাগৈতিহাসিক আমলের। তারপর তাঁহার জীবনে আসিল

ঐতিহাসিক যুগ—যার পরিচয় পাইতেছি গল্পটিতে। দ্বিতীয় পক্ষ ফুল ছুঁচক্ষে দেখিতে পারে না—অথচ পুষ্পপ্রীতি সহজে যাইবার নয়, তাই এখন গৌরীকান্তবাবু ফুলের নানাবিধ ব্যঞ্জন রাঁধেন—ইহা ত এক প্রকার materialist interpretation! সেদিনের মালার ফুলকে আজ ফুলের মালাইকারিতে পরিণত করার মধ্যে উপবাসী হৃদয়ের যে অসীম দুঃখ রহিয়াছে—তাহা কে বুঝিবে? কবি কুণ্ডনলালের মেঘদূত বিভূতিবাবুর তথা বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। ঝানু ব্যবসায়ী কুণ্ডনলালের বহুদিনের অভ্যাসের ফলে Romance ও Reality, কাব্য ও ব্যবসা, মেঘদূত ও জমাখরচের খাতা একার্থক হইয়া গিয়াছে, যেমন গৌরীকান্তবাবুর কাছে এক হইয়া গিয়াছে ফুলেব চচ্চড়ি ও প্রথম পক্ষের অস্তিত্ব। গৌরীকান্তবাবু ফুলের ব্যঞ্জন গলাধঃকরণ করিবার সময়ে মনে মনে প্রথম পক্ষের সেবাযত্নের ব্যঞ্জনা নিশ্চয় অনুভব করেন। কুণ্ডনলালেব মেঘদূত কালিদাসের মেঘদূতের চেয়ে কোন অংশে কম সত্য নয়। সে বেচারার কাছে প্রেম ও প্রয়োজন সমার্থক। কে বলিল কুরুবক ভাজি চূড়ার কুরুবকের চেয়ে কম হৃদ্য? কবি কালিদাস এ যুগে বসিয়া মেঘদূত লিখিলে সেদিনের মতো করিয়া লিখিতেন না, হয়তো কুণ্ডনলালের মতোই কিছু লিখিতেন। পাকা ব্যবসায়ীও যে ষোল আনা ব্যবসায়ী নয়, তাঁহাব মধ্যেও কবিত্বের মিশেল থাকে, নীরস হিসাবের খাতা নিঙড়াইলে যে ছটাক পরিমাণ কবিত্ব রস পাওয়া যায়—ইহা একটা মস্ত আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের দ্বারা বিভূতিবাবু এ যুগের লোকের মনে আত্মসম্মান জাগাইয়া দিয়াছেন। তাহা হইলে আমরাও কম নই! খুঁজিলে দেখা যাইবে যে আমাদের মধ্যেও কালিদাস বাল্মীকি বা সেকান্দার শা প্রতাপ সিংহের একটা মিশেল থাকা অসম্ভব নয়। সামান্যের মনে এমন সম্ভ্রম জাগাইয়া তোলাই তো social uplift! লেখক কলমের এক আঁচড়ে মনুষ্যত্বের Magna Carta লিখিয়া দিয়াছেন—তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ দিতে হয়।

৯

বিভূতিভূষণের সরস গল্পে সবসুদ্ধ উনিশটি গল্প আছে। কয়েকটির কথা বলা হইল, বাকিগুলির কথা এবারে বলিব। কিন্তু তার আগে স্বয়ং লেখকের কথা।

বিভূতিবাবুকে দেখিলে নিতান্ত ভালো মানুষ মনে হয়—আর সকলে যখন আসর জমাইতেছে তিনি চুপটি করিয়া বসিয়া থাকেন, না শুধাইলে কথা বলেন না, শুধাইলেও মৃদুস্বরে স্বল্পস্বরে উত্তর দেন। হঠাৎ মনে হইতে পারে যে লোকটি উদাসীন, উদাস চোখের লক্ষ্য বলিয়া যেন কিছু নাই। কিন্তু এতবড় ভুল আর নাই। তিনি এতক্ষণ মনের খাতায় সব টুকিয়া লইতেছিলেন—এবং কোন এক উপলক্ষ্যে হয়তো বা পূজাসংখ্যার রচনাতেই অরসিকগণ নিজ নিজ চরিত্র প্রতিবিম্বিত দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিবে—কি সর্বনাশ আমরা তো লোকটিকে নিতান্ত ভালো মানুষ মনে করিয়া ছিলাম।

'হেন সংশয় ছিল না কাহারো,
সে যে কোন কথা বোঝে।'

শেষে কিনা তাহারই এই কীর্তি!

বিভূতিবাবুর অর্ধস্তিমিত চোখ দুটি সব দেখিতেছে। তাঁহার চাপা ওষ্ঠাধরের মধ্যেকার ঈষৎ সূক্ষ্ম রজতরেখা স্বগত হাসি হাসিতেছে। সবাই যখন সুখদুঃখ হাসি-অশ্রুময় জীবনলীলায় ব্যস্ত তখন লোকটি—

"মেঘের মতন আপনার মাঝে,
ঘনায়ে আপন ছায়া
একা বসি কোণে জানিত রচিতে
ঘন গম্ভীর মায়া।"

হারজিত গল্পের শেখর ও অরুণা, মেঘদূত গল্পের অভয়পদ ও অনিমা, গোলাপী রেশমের শৈলেন ও চারু বলিতে পারে—

"যে ছিল বোবার মতো
পরের কুৎসা রটাবার বেলা
তারো মুখ ফুটে কত।"

তাই সাবধান করিয়া দিই লেখকশত্রু মন্দ নয়, দূরে দূরে থাকে সব দুর্বলতা জানিতে পায় না, কিন্তু লেখকবন্ধু নৈব নৈব চ। বন্ধুকে মারিয়াই তাহারা হাত পাকায়।

অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি বিভূতিবাবুর। লোকের চেহারা, কথাবার্তা, আচরণ ব্যবহার সব তিনি মনে মনে টুকিয়া রাখেন। অনেকগুলি গল্পের প্রাণ খুঁটিনাটি তথ্য সমাবেশের সার্থকতার উপরে। বি-এন-ডবলু-র ব্রাঞ্চ লাইনে, তীর্থফেরৎ, সবজান্তা, ফুটবল, জাগ্রত প্রভৃতি এই পর্যায়ের। সাহিত্যে যথাযথ তথ্য সমাবেশ একটি দুর্লভ গুণ, বিশেষ ছোটগল্প রচনার পক্ষে ইহা তো একেবারেই অপরিহার্য। অনেক ধনী দামী দামী আসবাব কেনে কিন্তু যথাযথ সাজাইতে জানে না বলিয়া গৃহকে দোকান করিয়া তোলে, গৃহ বলিয়া আর মনে হয় না। আবার অনেকের আসবাবপত্র সামান্য ও সাধারণ, কিন্তু সজ্জা-নৈপুণ্যের বলে ঘরটিকে কেমন সাজায়, মনে হয় ঐশ্বর্যের অন্ত নাই। লেখকের বেলাতেও একথা খাটে। নিপুণ গৃহিনীপনার মন্ত্রে বিভূতিবাবুর হাতে সামান্য অসামান্য হইয়া ওঠে। তাঁহার সব গল্প সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য হইলেও পূর্বোক্ত গল্পগুলি সম্বন্ধে এ কথা বিশেষভাবে সত্য।

সাহিত্যে দেখা যায় যে অনেক রচনা আইডিয়ার উর্ধ্বলোক হইতে নামিয়া আসিয়া মাটির উপরে পা রাখিয়া শক্ত হইয়া দাঁড়ায়—আবার অনেক রচনা মাটি ফুঁড়িয়া আকাশের দিকে ওঠে। এ দুটা ভিন্নরীতি মাত্র। বিভূতিবাবুর অধিকাংশ গল্পই মাটি ফুঁড়িয়া ওঠা—তাই প্রত্যহের চিহ্ন তাহার সর্বাঙ্গে। অবশ্য আইডিয়ার উর্ধ্বলোক হইতে নামিয়া আসা গল্পেরও অভাব নাই, যেমন ভারত-উদ্ধার ও পাঁঠা এবং কবি কুণ্ডনলালের মেঘদূত। ইহাদের অঙ্গে প্রত্যহের চিহ্ন থাকিলেও ইহারা আসলে আইডিয়া-লোকের বস্তু। নিশ্চয় বলিতে পারি

আইডিয়া রূপেই প্রথমে এ দুটি লেখকের মনে ঝলক মারিয়া উঠিয়াছিল—অন্যান্য গল্পের মতো মাটিতে কুড়াইয়া পান নাই।

বর্তমান গ্রন্থের উনিশটি গল্পের পাল্লা নেহাৎ অল্প নয়, বয়োভেদ ও শ্রেণীভেদের বৈচিত্র্যে বিচিত্র পর্যায়ের নরনারী ইহাতে সমবেত। বাদলের বয়স খুব বেশি হয়তো দুই বছর, হাতেখড়ির নায়ক মিন্টুর বয়স নিশ্চয়ই পাঁচ বছরের বেশি নয়, গোলাপা রেশমের চারু আটের মধ্যেই; বালকের সংখ্যা অনেক, গোলাপী রেশমের শৈলেন বালক, আবার পাঁঠা সহায়ে ভারতউদ্ধারকারীগণ সকলেই বালক; কিশোরের সংখ্যাও কম নয়, উপবাসী রূপলাল ও তাহার ষড়যন্ত্রের বন্ধুগণ সকলেই কিশোর; তারপরে আছে যুবক-যুবতী, অভয়পদ ও অনিমা, বিপন্ন গল্পের নবপরিণীত ছাত্রটি, ফুটবল খেলার প্রত্যক্ষদর্শীগণও নশ্চয় যুবক; বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও যথেষ্ট, তীর্থফেরৎ পিসিমা, সবজান্তা মধুকাকা, স্বরূপ মণ্ডল। আবার শ্রেণীভেদের বৈচিত্র্যও কম বিস্ময়কর নয়। বি-এন-ডব্লুর রেল-কর্মচারীগণ, মধুলিড় গৌরীকান্তবাবু সম্পত্তি গল্পের জমিদারদ্বয়, জাগ্রত গড়ের মার্কিন সৈনিক, গুরুচরণ ও তাহার মাসি, আর আছে নবযুগের কালিদাস কবি কুণ্ডনলাল। আর আছে দুটি কুকুর, জিমি ও রংলাল। বিভূতিবাবু প্রায় Noah's Ark গড়িয়াছেন, কাহাকেও প্রায় বাদ দেন নাই—সবার উপরে আছেন লেখক স্বয়ং, পাকা কর্ণধার। তিনি অবশ্য স্বনামে নাই, কিন্তু নানা নামে নানা বেশে ছড়াইয়া আছেন, একটু প্রণিধান করিলেই গুটাইয়া স্বরূপে আনা সম্ভব। তাঁহার সেই স্বরূপটি কি? জীবজগতের প্রতি ক্ষমাপূর্ণ স্নেহময় সকরুণ দৃষ্টি—আর প্রায় সর্বত্র সে করুণা সে স্নিগ্ধ ক্ষমা নামিয়া আসিয়াছে স্মিত কৌতুকহাস্যে। সে হাসি সূর্যের তাপ নয় চাঁদের জ্যোৎস্না, দাহ নাই আলো আছে, মূলে হয়তো তাহাতে জ্বালা ছিল, কিন্তু ক্ষমার চন্দ্রলোক ঘুরিয়া আসাতে বড় স্নিগ্ধ করুণ বর্ষণে নামিয়াছে জীবজগতের ক্ষতক্লান্ত মাথার উপরে। সাহিত্যে বিভূতিবাবু moralist নন, তিনি জগতের সংস্কার করিতে উদ্যত নন, সংসারের ক্ষয়ক্ষতির উপরে একটুখানি

স্নেহপ্রলেপ বুলাইয়া দিতে পারিলেই নিজেকে ধন্য মনে করেন। তাঁহার ভাবটা অনেকটা এইরকম—সংসারে মন্দ আছে, ঘৃণ্য আছে, কিন্তু তাহাতে কি, ভালোও আছে, সুন্দরও আছে—আর ভালোয়-মন্দয় মিলিয়া আছে একটি পূর্ণরূপ। সে রূপটা যদি তোমার ধারণার সঙ্গে না মেলে সে দোষ সংসারের নয়। তিনি হয়তো বলিবেন যা অসম্ভব তাহার আশায় বৃথা নিজেকে ক্ষতবিক্ষত না করিয়া পূর্ণরূপটা দেখিবার চেষ্টা করো, দেখিতে পারিলে তাহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইবে, নয়ন ধন্য হইবে আর তখন হৃদয়ে যে পূর্ণ চন্দ্রোদয় ঘটিবে তাহার অমৃত সঞ্চারে সমগ্র নিখিল মধুময় হইয়া হাসিতে থাকিবে, সেই নিখিল হাসির নীরব সঙ্গীতে যোগদানই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

দেশ জুড়িয়া রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়া গেল। পঁচিশে বৈশাখের অধিকার এখন বৈশাখ অতিক্রম করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসকে স্পর্শ করিয়াছে। সভার সংখ্যা বাড়িয়াছে, লোকের উৎসাহ-আড়ম্বর বাড়িয়াছে আর এই উৎসবটি সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অনেকে ব্যাপারটাকে একটা হুজুগমাত্র মনে করেন। আমার সেরূপ মনে হয় না। সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারেই হুজুগের মিশাল থাকে, এ বিষয়েও আছে, কিন্তু আসল থাকিলে তবে মিশালের প্রশ্ন ওঠে। আসলের কথাই বলিতেছি, সেটাই বিচার্য। যিনি চান, সাত্ত্বিকভাবে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন করুন, কিন্তু সাধাবণের রাজসিকতায় বাধা দিতে যাইব কেন? রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি ব্যাপক শ্রদ্ধা একটা যুগ-লক্ষণ, সেটা শুভ, সেই শুভটুকু বাঙালীর দুঃসময়ে আশার চিহ্ন। কিন্তু আজকার আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্র-সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা নয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ। যদি বুঝিতে পারি যে, ভবিষ্যতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি সমাজের শ্রদ্ধা এমনই অটুট থাকিবে, কালক্রমে আরো বৃদ্ধি পাইবে, তবে আশার সঙ্গে আনন্দ যুক্ত হইবে এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের সুত্রে সমাজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া ঐতিহ্যের অখণ্ডতা সৃষ্টি করিবে, সমাজের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক ও কাম্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ সমাজ-চিত্তে তাহার স্থান ও মর্যাদা আজকার প্রবন্ধের বিষয়।

দূরভবিষ্যতের তর্ক তুলিব না। একশ' বৎসর পরে কি হইবে সে প্রশ্ন এখন থাক। আরো কাছাকাছি একটা সময় লওয়া যাক।

২০০১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্যাদা কিরূপ হইবে আলোচনা করা যাক। এখন ১৯৫৫ সাল, আর ৬ বছর পরে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইবে। তার পরে আর চল্লিশ বছর অতিক্রম করিলেই ২০০১ খৃষ্টাব্দ, নূতন শতাব্দীর প্রথম বছর, এখন হইতে মাত্র ৪৬ বছর পরেকার কথা। এ একটা হিসাবাতীত সময় নয়, আজ যে শিশু ভূমিষ্ঠ হইল, তখন তাহার বয়স ৪৬ বছর হইবে, আজ যে বালক বিদ্যালয়ে, তখন তাহার বয়স ষাটের নীচেই থাকিবে। কাজেই এমন দূরবর্তী সময় নয়। আর এই ৪৬ বছরকে দুই প্রজন্মকাল (generation) ধরা যাইতে পারে। এখন যে-সব ভাবসূত্র ক্ষীণাকারে বিদ্যমান দুই প্রজন্মকালে তাহা স্পষ্ট, প্রকট ও ফলবান হইয়া উঠিবে, বাঞ্ছনীয়ের বীজও বনস্পতি হইয়া উঠিবে, অবাঞ্ছনীয় সম্বন্ধেও সেই কথা। তখন তাহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের কি মূল্য দাঁড়াইবে? আমাদের মূল্যবোধ তাহারা স্বীকার করিবে কি? অবশ্য তখনও তাহারা এমনি ব্যাপকভাবেই রবীন্দ্রজন্মোৎসব উদ্‌যাপন করিবে, খুব সম্ভব রাষ্ট্রের ইঙ্গিত পাইবে বলিয়া আড়ম্বর আরো বাড়িবে। দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির ফলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিক্রয় ও প্রসার নিশ্চয় বাড়িবে। কিন্তু আসল কথার কি? রবীন্দ্র-সাহিত্য বলিতে যে-সব রস ও ভাবের সমষ্টি বোঝায় তাহার মূল্য ২০০১ খৃষ্টাব্দের বাঙালীর কাছে কি দাঁড়াইবে?

২

গত একশ' বছরের নব্য বাংলা সাহিত্য উদার শিক্ষা বা Liberal education-এর ফলপ্রসূত। রবীন্দ্র-সাহিত্য এই সাহিত্যধারার চরম। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের সময় হইতে যে সাহিত্য-প্রবাহের রীতিমাত্র সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথে আসিয়া তাহা যেন প্রশস্ততর, গভীরতর, বিচিত্রতর হইয়া সমুদ্রসঙ্গমে পৌঁছিয়াছে। এ যেন একটা সমাপ্তি। সাহিত্যপ্রবাহ সম্বন্ধে 'সমাপ্তি' শব্দটি উচ্চারণ করা উচিত নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও সে ধারা বহমান, আর মানুষ

যতকাল থাকিবে সে ধারার অবসান কখনো ঘটিবে না। তবু সমাপ্তি শব্দটির এখানে বিশেষ অর্থ আছে। যে শিক্ষা ও অবস্থা-আবহাওয়ার ফলে এই সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে, সেই শিক্ষা ও অবস্থা-আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটিলে তাহার পরিবর্তন ঘটিবে নাকি? এ পরিবর্তন বস্তুর স্বাভাবিক বিবর্তন নয়, তার চেয়ে বেশি। বিবর্তনে মূলের বদল হয় না, এখানে মূল বদলেরই আশঙ্কা, কাজেই ইহাকে সমাপ্তি বলিতেছি। উদার শিক্ষা ও উদার শিক্ষার ফলে সমাজে ও মনে যে বিশেষ অবস্থা-আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারই শ্রেষ্ঠ রূপ নব্য বাংলা সাহিত্য। এখন, উদার শিক্ষার নীতি যদি পরিত্যক্ত হয়, তবে কালক্রমে এই পর্যায়ের সাহিত্য আর কি সৃষ্ট হইবে? কালক্রমে অন্য শিক্ষানীতিতে বর্ধিত পাঠকের কাছে এই পর্যায়ের সাহিত্যের কি মূল্য দাঁড়াইবে? আমাদের মূল্য কি তাহারা দান করিবে? তা যদি না হয়, তবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আজকার মূল্য তাহারা স্বীকার করিবে কেন? আগামী ছেচল্লিশ বৎসর অর্থাৎ এই প্রজন্ম পরে এইরূপ একটি সময় আসিবে আশঙ্কা করি।

উদার শিক্ষা বা Liberal education মনে একটি উদার, অসাম্প্রদায়িক, সংসারমুক্ত, স্পর্শকাতর ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতাধারণক্ষম ভাবের সৃষ্টি করে। এরূপ ভাবে যে ভাবিত তাহার দৃষ্টিতেও ঐসব ভাব অনুস্যূত না হইয়া পারে না। এই শিক্ষার ফলে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরিবারের সন্তান হইয়াও বিদ্যাসাগর বলিতে পারিয়াছিলেন যে, শঙ্করব্যাখ্যাত বেদান্তদর্শন ভ্রান্ত ও আমাদের দেশের পক্ষে হানিকর; বলিতে পারিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দিয়া দেশের উন্নতির আশা নাই, নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে (উদার শিক্ষা যাহারা পাইয়াছে) উৎসাহী যুবক সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহারাই দেশের আশা ভরসা। এই শিক্ষার ফলেই খৃষ্টান মাইকেলের হিন্দু পুরাণ অবলম্বনে কাব্য লিখিতে বাধে নাই; হিন্দুবঙ্গের পালপার্বণকে উপলক্ষ্য করিয়া চতুর্দশপদীতে ব্যক্তিগত সুখদুঃখ বলিতে বাধে নাই। এই শিক্ষার ফলেই বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ প্রমাণ করিতে সচেষ্ট

হইয়াছিলেন এবং গীতার নিষ্কাম ধর্মকে পাশ্চাত্ত্য patriotism-এর সঙ্গে মিলাইয়া মিশাইয়া লইতে কুণ্ঠিত হন নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্যে আসিয়া এই শিক্ষাধারা শ্রেষ্ঠ ফল (আমার মতে শেষ ফল) ফলাইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি হিন্দুধর্মের বিশেষ একটি রূপ স্বীকার করিলেও অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায় বা সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ধর্ম ও সম্প্রদায়নির্বিশেষে উদ্‌যাপিত হয়, তার কারণ রবীন্দ্র-সাহিত্য ধর্ম ও সম্প্রদায় বা অন্যপ্রকার ভেদকে স্বীকার করে নাই। কালধর্মে যে-সমাজের ও যে-লেখকের উদার শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে কেবল সেই সমাজে ও সেই লেখকের রচনাতেই এমন ঘটিতে পারে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অনেক মহৎ কীর্তি আছে। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির এমন অনেক পদ আছে, যাহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লিরিক পর্যায়ভুক্ত হইবার যোগ্য। কিন্তু বিশেষ একটি ভাবে ভাবিত না হইলে, বিশেষ একটি তত্ত্ব স্বীকার না করিয়া লইলে এগুলির পুরা রস আদায় করা যায় কিনা সন্দেহ! চৈতন্য-জীবনীগুলি ও অধিকাংশ মঙ্গল কাব্য সম্বন্ধেও এই কথা অপ্রযোজ্য নহে। উদার শিক্ষা মানুষের মনে যে সংস্কারমুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করে—এগুলি সেই আবহাওয়ায় সৃষ্ট নয়। কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়িয়া দিলে (খুব সম্ভব কবিকঙ্কণ চণ্ডীর অংশ বিশেষ, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের অনেক অংশ ও ময়মনসিংহ গাথাগুলি প্রধাম ব্যতিক্রম) প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এটি একটি মহৎ ও মৌলিক ত্রুটি। মাইকেল মধুসূদন প্রথম মহৎ বাঙালী কবি যাঁহার রচনার পুরা রস গ্রহণের জন্য কোন বিশেষ তত্ত্ব বা ভাবকে স্বীকার করিবার আবশ্যক হয় না। উদার শিক্ষানীতির প্রথম সুফল তাঁহার কাব্য। তাঁহার পর হইতে মুখ্য গৌণ সমস্ত বাঙালী লেখকই উদার শিক্ষায় কিছু না কিছু ফল পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সব পদ যে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির চেয়ে সার্থকতর, গভীরতর এমন নয়; কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান সুবিধা এই যে তাহা আপন স্বভাবধর্মেই

সর্বজনগ্রাহ্য, সে সব বুঝিবার জন্য বিশেষ কোন তত্ত্বকে স্বীকার করিবার আবশ্যক হয় না। মনের এই সংস্কারমুক্ত ভাবটিই নব্য বাংলা সাহিত্যের প্রধান বল ও সম্বল—আর ইহার মূলে আছে উদার শিক্ষানীতি। কিন্তু এ ধারা বুঝি আর থাকে না। আজকার দিনে আমার আশঙ্কা অনেকের কাছেই ভীতিবায়ুগ্রস্তের উক্তি মনে হইতে পারে। কিন্তু সে অপবাদ স্বীকার করিয়া লইয়াও বলিব যে আমার আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়।

৩

সেদিন প্রেসিডেন্সী কলেজের শতবার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও আচার্য যদুনাথ সরকার উদার শিক্ষানীতির অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি বলিয়াছেন যে, শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষার মানোন্নয়ন দুই-ই একসঙ্গে করিতে হইবে। আর আচার্য যদুনাথ বলিয়াছেন যে, উদার শিক্ষানীতির ফলেই দেশের উন্নতি ঘটিয়াছে, কাজেই সে নীতি পরিত্যাগ কর্তব্য নয়। বক্তাদের একজন ভারতরাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি, অন্যজন অভিজ্ঞ শিক্ষক ও পণ্ডিত। কাজেই সকলেই তাঁহাদের মত প্রণিধান করিয়া দেখিবেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার আশঙ্কা উদার শিক্ষানীতি যথেষ্ট মর্যাদা পাইবে কিনা সন্দেহ! আমার বিশ্বাস যুগের হাওয়ার কাছে ভারত সরকার নতি-স্বীকাব করিতে চলিয়াছেন। যুগের হাওয়া উদার শিক্ষানীতির প্রতিকূলে বহিতেছে। কেন জানি না, লোকের একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, উদার শিক্ষা অকেজো, এ যুগে অচল ; তাহা মানুষ গড়ে না ; তাহা কেবল অকর্মণ্য, ভাবালু, কল্পনা-লোকবিহারী ভাবের বেলুন গড়ে ; অনেকেরই ধারণা এ শিক্ষার ফলে আমাদের যথেষ্ট উন্নতি হয় নাই ; (যদি না হইয়া থাকে, তাহার অন্য কারণ থাকা সম্ভব),এমনকি অবনতিই ঘটিয়াছে (তাহারও অন্য কারণ অসম্ভব নহে); কাজেই আমাদের বর্তমান দায়দুর্গতির যাবতীয় ভার উদার শিক্ষানীতির ঘাড়ে চাপাইয়া অনেকে নিজেদের দায়িত্বমুক্ত বোধ করেন ; ছেলে পরীক্ষায়

ফেল করিলে শিক্ষকের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপানো যেমন অনেকের স্বভাব —এ অনেকটা তেমনি। আজকার অধিকাংশ শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ বলিয়া থাকেন, মানুষ গড়িবে এমন শিক্ষানীতি চাই। মানুষ বলিতে বোধ করি, তাঁহারা মজুর, মিস্ত্রি, কারিগর বোঝেন, নতুবা তাঁহাদের প্রোগ্রাম ও প্ল্যানের ঝুলি হইতে হাতুড়ি, বাটালি ও গজকাঠি এমন করিয়া উঁকি মারে কেন? তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, জাতিকে যুগবিদ্যায় শিক্ষিত হইতে হইবে, শক্তিশালী হইতে হইবে, তবে তো জগৎ সভায় একটি প্রশস্ত আসন লাভ করা সম্ভব হইবে। খুব সম্ভব তাঁহাদের কাছে যুগবিদ্যা মানে যন্ত্রবিদ্যা, আর শক্তি মানে প্রচুর উপকরণের অধিকার। তাঁহারা বলেন, পৃথিবীর দিকে একবার চাহিয়া দেখো, কোন্ পথে সবাই চলিতেছে। এতক্ষণে অনেকটা বুঝিতে পারা গেল—অর্থাৎ পৃথিবীতে অন্য সব জাতি যাহা করিতেছে আমরাও তাহাই করিব, অর্থাৎ নকল-নবিশির অধিক কিছু নয়। এক সময়ে নাকি ইংরেজের অনুকরণে এদেশে উদার শিক্ষার প্রবর্তন হইয়াছিল। এখনও তো সেই উদ্যোগই চলিতেছে, অন্য দেশের অনুকরণে যান্ত্রিক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যম। সংক্ষেপে এই বুঝি যে পালা বদল হইয়াছে মাত্র, লীলা বদল হয় নাই।

ভারত সরকারের ভাবী শিক্ষানীতি ঠিক কি জানি না, কারণ এখনো তাহা পরীক্ষামূলক আর সেইজন্যই অস্পষ্ট। কিন্তু ভারত সরকারের শিক্ষানায়কগণ মাঝে মাঝে যে-সব মন্তব্য ও দিগ্‌নির্ণয় দান করেন, শিক্ষাখাতে যে-ভাবে টাকা বণ্টন করেন, তাহাতে মনে হয় যে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, যন্ত্র শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতিই তাঁহাদের সত্যকার আগ্রহ· ঐ শ্রেণীর শিক্ষার প্রসারই তাঁহাদের নীতি; উদার শিক্ষার উন্নতি বা প্রসারের দিকে তাঁহাদের তেমন নজর নাই, তাই সেখানে তাঁহাদের হস্ত কুণ্ঠিত। যে-শিক্ষায় নিছক বিদ্যাবিবর্ধন ঘটে, বিদ্যা যেখানে বেগুন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না, জ্ঞান যেখানে আপনাতে কৈবল্য সন্ধান করে, যে পদ্ধতিতে হাতে হাতে ফল পাওয়া যায় না, সে-শিক্ষার জন্য ভারত সরকার কোনপ্রকার দায়িত্ব স্বীকার করিতে রাজী নন এরূপ ধারণা হওয়া অসম্ভব নয়, অন্তত আমার তো তাই

হইয়াছে। অবশ্য উদার শিক্ষার বর্তমান ধারাটাকে তাঁহারা একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিবেন এমন বলি না; দীন অবস্থায় তাহা থাকিয়া গেলে তাঁহারা আপত্তি করিবেন মনে হয় না; নিতান্ত তাড়াই না, তবে উঠান-চষি অবস্থায় হয়তো তাহা থাকিয়াই যাইবে; দুয়োরানীর ছেলেটা যেমন থাকে আঁস্তাকুড়ের একপাশে তেমনিভাবে উদার শিক্ষাপদ্ধতি মলিনভাবে বিরাজ করিয়া স্নেহহীন পিতৃপরিচয় বহন করিতে থাকিবে। ইহার পরিণাম আনন্দজনক নয়। অনুরূপ কারণেই আমাদের দেশে সংস্কৃত শিক্ষার অবনতি ঘটিয়াছে। হাতে হাতে কেরানীগিরির ফল ফলাইতে সক্ষম ইংরাজি স্কুল স্থাপিত হইতে শুরু করিলে স্নেহময় পিতা বুদ্ধিমান ছেলেটাকে ইংরাজি স্কুলে পাঠাইতেন, আর মূঢ় ছেলেটাকে বলিতেন, তুই আর কি করবি, যা গাঁয়ের টোলে ঢুকে পড়। সেই ছেলে টোল পাস করিয়া নিজে আবার টোল খুলিল—আর গাঁয়ের মূঢ় ছেলের দল আবার তাহার টোলে ঢুকিল! গুরুও মূঢ় ছাত্রও মূঢ়, এইভাবে দমে পাক হইতে হইতে টোলের শিক্ষা কোথায় নামিয়া পড়িয়াছিল! এমন দীর্ঘকাল চলিবার পরে আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করিলাম যে, সংস্কৃত শিখিয়া মানুষ হয় না। এবার কলেজী উদার শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুরূপ কাণ্ড ঘটিতে চলিয়াছে। বাড়ির ভালো ছেলেটি এখন আই এসসি ক্লাসে ভর্তি হয়, তার পরে হয় ডাক্তারি নয় এঞ্জি-নিয়ারিং বা ঐরূপ কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে যায়। এখনকার স্নেহময় পিতা বোকা ছেলেটিকে আই এ ক্লাসে ভর্তি করিয়াছেন, ক্রমে সে বি এ, এম এ শ্রেণীর দিকে চলিয়া যায়। যে প্রক্রিয়া হইতে চলিয়াছে আমি তাহার উপরে হয়তো একটু রঙ ফলাইলাম, কিন্তু মূল-বস্তু অবশ্যই আছে, নহিলে রঙ ফলাইতাম কোথায়? অচিরকাল পরে আমরাও আবার আবিষ্কার করিব যে, উদার শিক্ষায় 'মানুষ' হয় না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিচারপ্রবণ তাঁহারা 'মনুষ্যত্ব' অস্বীকার না করিলেও বলিয়া থাকেন যে, উদার শিক্ষা কেরানী বানাইবার কল। উদার শিক্ষা প্রবর্তনের সময়ে লর্ড মেকলে উক্ত বিষয়ে যে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ছাত্রগণ 'মানুষ' হইবে এই আশাই তিনি

পোষণ কবিয়াছিলেন। উদার শিক্ষা আমাদের কেরানী বানায় নাই, সত্য কথা এই যে, উদার শিক্ষা সত্ত্বেও আমরা কেরানী বনিয়া গিয়াছি, একেবারে মাছি-মারা কেরানী। আমরা যদি কেরানীর জাতিতে পরিণত হইয়া থাকি (আমি মোটেই বিশ্বাস কবি না), তবে তাহার প্রকৃত কারণ উদার শিক্ষা নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্য কারণ। লর্ড মেকলে ও লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক যদি যথেষ্ট ধড়িবাজ হইতেন, তবে ইংবাজি শিক্ষাব প্রবর্তন না করিয়া মাদ্রাসা, মক্তব ও চতুষ্পাঠিব শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতেন, আব সেইসঙ্গে ইংরাজের ভারতীয় সাম্রাজ্যকেও চিবকালেব জন্য স্থাযী করিয়া যাইতেন। কারণ ঐ শ্রেণীর শিক্ষা রাজভক্তিব বড অনুকূল। ইংবাজি-শিক্ষিতবাই এদেশ হইতে ইংরাজকে তাড়াইযাছে, কাজেই ইংবাজি উদাব শিক্ষাকে আমবা যেমন ভাবি আদৌ তেমন অকেজো নয়। কিন্তু, যদি স্বীকাব কবিয়াই লই যে, উদাব শিক্ষাব ফলে জাতটা বেবাক কেরানী বনিয়া গিযাছে, তবে এখন যে জাতটাকে বাজমিস্ত্রি, কারিগর ও হাতুড়ে (হাতুড়ি চালায় অর্থে) বানাইবার চেষ্টা চলিতেছে ইহার পরিণাম কি ?

৪

ভারতের ছত্রিশ কোটি লোকের সমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাব পবীক্ষা চলিতেছে। গণতন্ত্রের পক্ষে উদার শিক্ষা অপবিহার্য। যেদেশে উদার শিক্ষা নাই, সেদেশে গণতন্ত্র সম্ভব নয়, যেদেশে উদার শিক্ষা আছে, সেদেশে গণতন্ত্রের মৌলিক বনিয়াদ বর্তমান। আধুনিক ইংলণ্ড গণতন্ত্র পরীক্ষার সফলতম ক্ষেত্র, আধুনিক ইংলণ্ড উদার শিক্ষারও সফলতম ক্ষেত্র।

একনায়কতন্ত্রের দেশে উদাব শিক্ষা অনাবশ্যক। উদার শিক্ষায় ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত কবে, ব্যক্তিত্ব স্বভাবতই ভিন্ন পথসঞ্চারী ; উদার শিক্ষায় মানুষকে আপন চরিতার্থতার বিশিষ্ট পথ সন্ধান করিতে শিক্ষা দেয় ; উদার শিক্ষা শেখায় যে 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্'। এ সমস্তই একনায়কতন্ত্রের পক্ষে বালাই। কাজেই উদাব শিক্ষা সেদেশে

কেবল অনাবশ্যক নয়, অনভিপ্রেতও বটে ; একনায়কতন্ত্রের প্রধান শত্রু উদার শিক্ষা। অথচ গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত। উদার শিক্ষা যে মানসিক ব্যাপ্তি ও আলো দেয়, উদার শিক্ষা যে স্বপথ সন্ধানে প্রেরণা যোগায়, উদার শিক্ষা যে চিৎ শক্তিকে সতেজ ও সবল করে, এ সমস্ত গুণ ছাড়া গণতন্ত্র দীর্ঘকাল সচল থাকিতে পারে না। শিক্ষাব্যবস্থার তারতম্যের ফলেই এথেন্সে গণতন্ত্র ছিল, স্পার্টায় ছিল এক-নায়কতন্ত্র। স্পার্টা সেকালে সবল ছিল, এথেন্স চিরকাল অমর।

যান্ত্রিক শিক্ষা মানুষের মাংসপেশীতে একপ্রকার নৈপুণ্য দান করে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা তাহার বুদ্ধিকে (Intellect) জাগ্রত করে, কিন্তু একমাত্র উদার শিক্ষার ফলে 'complete man' বা আস্তমানুষ গড়া সম্ভব। ইউরোপের অন্যান্য জাতির সঙ্গে তুলনা করিয়া ইংরেজকে গ্যেটে 'complete man' বলিয়াছেন, সে বোধ হয় এই কারণেই। রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, যে, দর্শন ও বিজ্ঞানে একপেশে মানুষ সৃষ্টি হয়, আস্তমানুষ সৃষ্টি সম্ভব সাহিত্যমূলক শিক্ষায়। এখন এই 'আস্তমানুষই' গণতন্ত্রের সত্যকার ভিত্তি। সেইজন্যই গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে উদার শিক্ষানীতি নিতান্ত অপরিহার্য। অথচ আমাদের কথায় ও কাজে বড় মিল দেখিতেছি না। এদিকে মুখে বলিতেছি যে, গণতন্ত্র আমাদের কাম্য, আর কাজে এমন একটা ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিতেছি, যাহার অনিবার্য পরিণাম গণ-তন্ত্রের লোপ। কোনরূপ 'political ideology' বা বহিরাগত হস্তক্ষেপের সাহায্য না লইয়াও যদি একটি দেশকে একনায়কতন্ত্রে পরিণত করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহার প্রকৃষ্টতম উপায় উদার শিক্ষার লোপ ও যান্ত্রিক শিক্ষার প্রসার। ভাবে-গতিকে মনে হইতেছে আমরা 'জাত সন্ন্যাসী পেশা জমিদারী' শ্রেণীর লোক, মুখে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলিলেও এমন কাজ করিতে উদ্যত হইতেছি, যাহার পরিণাম একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কোথায় আরম্ভ করিয়াছিলাম আর কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ হইতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। কিন্তু এই আপাত ব্যবধান বোধ করি দুস্তর নয়। গণতন্ত্রের ভিত্তি উদার শিক্ষা; রবীন্দ্র-সাহিত্যেরও ভিত্তি উদার শিক্ষা; গণতন্ত্রের ভিত্তি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্র-সাহিত্যেরও ভিত্তি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য; গণতন্ত্র ও রবীন্দ্র-সাহিত্য দুই-ই একটি সর্বাঙ্গীণ ও পূর্ণ জীবনোপলব্ধির সাধনায় নিযুক্ত; জীবন সম্বন্ধে দুয়েরই ধারণা ও মূল্যবোধ সমান। কোন একনায়কতন্ত্রের দেশে রবীন্দ্র-সাহিত্য যেমন সম্ভব নয়, তেমনি গণতন্ত্র লোপ পাইলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্য ও মর্যাদার হানিও অনিবার্য। রবীন্দ্র-সাহিত্য বলিতে যে ভাব-সমষ্টি আমরা বুঝি তাহার মূলে আছে গণতন্ত্র ও উদার শিক্ষা। এখন জিজ্ঞাস্য, সেই মূল উচ্ছিন্ন হইতে চলিয়াছে কি? আমার আশঙ্কা তাই। আজও এ আশঙ্কা নীহারিকারূপী, তাই অনেকের কাছে অস্পষ্ট ও অমূলক, কিন্তু উদার শিক্ষা উপেক্ষিত হইতে থাকিলে যন্ত্রশিক্ষার প্রসার ঘটিতে থাকিলে দুই প্রজন্মকাল পরে অর্থাৎ ২০০১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি এমন এক সময় আসিবে যখন আমার আজকার আশঙ্কা সম্পূর্ণ প্রকট হইয়া উঠিবে। তখন তৎকালীন আমাদের কাছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্য ও মর্যাদার যে কেবল সবিশেষ হানি হইবে তাহাই নয়; তিনি ও অন্যান্য ভারতীয় সাধকগণ যে জীবনোপলব্ধির সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও নিরর্থক বোধ হইতে থাকিবে। সেদিন নিঃসন্দেহ আমাদের বৈষয়িক উন্নতি হইবে, কিন্তু সেই বৈষয়িক উন্নতির পিরামিড-শিখর হইতে কোন্ জীবন-দৃশ্য আমাদের চোখে পড়িবে? পিরামিডের শিখরে উঠিলে তো চোখে পড়ে চতুর্দিক্‌ব্যাপী মরুভূমি নীরস, দুস্তর, বন্ধুর ও অনিঃশেষ।

রবীন্দ্র-চর্চা

এই সংখ্যায় * অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তকসমূহের একটি তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ তালিকা পূর্ণাঙ্গ না হইলেও প্রায় পূর্ণাঙ্গ, অন্তত উল্লেখযোগ্য সমস্ত পুস্তকের নাম ও বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে ধরা যাইতে পারে। পুস্তক সংখ্যা ১৮০ বা তাহারি ধারে কাছে। গত চল্লিশ বছরের মধ্যে এগুলির প্রকাশ। মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশিত অথচ এখনো গ্রন্থকারে সংগৃহীত হয় নাই এমন প্রবন্ধাদির সংখ্যা সুপ্রচুর। এখন এই দুই জাতীয় রচনা যোগ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালী সমাজের কি অপরিসীম কৌতূহল ও আগ্রহ। তারপরে প্রতি বছরেই এ বিষয়ে নূতন নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, বর্ধিততর বেগে এই ধারা এখনো 'দীর্ঘকাল প্রবাহিত হইতে থাকিবে নিঃসন্দেহ। এই সমস্ত গ্রন্থ তিন শ্রেণীর (১) রবীন্দ্রনাথের জীবনী, (২) রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা এবং (৩) রবীন্দ্র জীবনের স্মৃতিকথা বা বিচ্ছিন্ন তথ্যপুঞ্জ।

বলা বাহুল্য সবগুলি গ্রন্থের মূল্য সমান নহে। তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থের অনেকগুলিই সুখপাঠ্য এবং কবিজীবনের অনেক অমূল্য উপাদানে সমৃদ্ধ। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে সেগুলি এবং যে-সব সাহিত্যের ইতিহাস জাতীয় গ্রন্থে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রসঙ্গত আলোচনা আছে, সেগুলি বর্তমান প্রবন্ধের পরিধির মধ্যে আনিব না। প্রথম দুই শ্রেণীর গ্রন্থ উপলক্ষ্য করিয়াই আমাদের বক্তব্য বিষয় বলিতে চেষ্টা করিব। সে বিষয়টি হইতেছে রবীন্দ্র-চর্চার ভবিষ্যৎ প্রকৃতি ও ধারা।

* দেশ পত্রিকার ২০শে বৈশাখ, ১৩৬২

রবীন্দ্র-জীবনী সম্পর্কিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক ও অধ্যাপক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী অবিসম্বাদী-রূপে শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, চতুর্থ বা শেষ খণ্ডও অচিরে প্রকাশ হইবে। চার খণ্ডে সম্পূর্ণ এই সুবৃহৎ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বৃহত্তম জীবনী, শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবির জীবনকথার যোগ্য বাহন। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়নে প্রভাতবাবু যে অসীম অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও তথ্য-সংগ্রহ নিপুণতা দেখাইতেছেন তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত হইতেছে বিশ্ব-ভারতীর অন্যতম অধ্যাপক শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত বঙ্গীয় শব্দকোষ। বিশ্বভারতীয় গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের এ দুটি বৃহত্তম নিদর্শন। কাল নিরবধি কাজেই কালক্রমে প্রভাতবাবুর রচিত জীবনীর চেয়েও অধিকতর মূল্যবান রবীন্দ্র-জীবনী হয়তো লিখিত হইবে, কিন্তু সেই ভাবীকালের অনির্দিষ্ট লেখককেও প্রভাতবাবুব গ্রন্থের শরণাপন্ন হইতে হইবে। এই আকর গ্রন্থকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে যিনিই ববীন্দ্র-জীবনী লিখুন না কেন তাঁহাকে প্রধানত এই 'বরাকর' হইতেই উপাদান সংগ্রহ কবিতে হইবে। সাধারণ পাঠক গ্রন্থখানিকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিবে, কিন্তু এখন যাহারা রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনায় নিরত সেই বিশেষজ্ঞগণ গ্রন্থখানিকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিতে বাধ্য। এই বইয়ের সাহায্য না লইয়া রবীন্দ্র-চর্চাকারীর পক্ষে এক পা অগ্রসর হওয়াও অসম্ভব। রবীন্দ্রসান্নিধ্য, শান্তিনিকেতনবাস ও তথায় সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় যাবতীয় উপাদানের পূর্ণতম সদ্ব্যবহার প্রভাতবাবু যে করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই অতিকায় গ্রন্থ।

রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কিত গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রধানত্বের দাবি সম্বন্ধে তর্ক উঠিবে। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তী রচিত 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'কাব্য-পরিক্রমা' প্রধান না হইলেও প্রথম বটে। (তৎপূর্বে কিছু প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও নগণ্য)। প্রভাতবাবুর গ্রন্থ যেমন অতিকায়, অজিতবাবুর গ্রন্থ দু'খানি তেমনি ক্ষীণকায়। কাব্য পরিক্রমা তো কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টিমাত্র। কিন্তু পরবর্তী রবীন্দ্র-আলোচনার উপরে ইহাদের প্রভাব বিচার করিলে বিস্ময় বোধ হয়,

গ্রন্থের কায়িক ক্ষীণতা সেই বিস্ময়কে আরো বর্ধিত করে। অজিতবাবুর গ্রন্থের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে (অনেকে দোষ মনে করিতে পারেন) রবীন্দ্রকাব্যের রসবিচারের চেয়ে তত্ত্ববিচারের দিকেই লেখকের বেশি ঝোঁক। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, 'জীবন দেবতার' আলোচনায় যে পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহার অনেকটাই নিরর্থক, কেননা, বস্তুসম্পর্কহীন। আর তাহার প্রদর্শিত সূত্র অনুসরণ করিয়া পরবর্তী অনেক সমালোচক রবীন্দ্রকাব্যে যত্রতত্র জীবন-দেবতার আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছেন। বর্তমান লেখকের মতে এই সূত্র ও সূত্রানুসরণ দুই-ই ভ্রান্ত, কিন্তু ইহা যে অজিতবাবুর প্রভাবের, শক্তির পরিচায়ক তাহাতে ভুল নাই। যাই হোক, অজিত-বাবুর পরিকল্পিত তত্ত্বসূত্র যতদিন পাঠক ও বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করিবেন ততদিন তাঁহার গ্রন্থ দু'খানির প্রাধান্য স্বীকার করিতেই হইবে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কিত গ্রন্থ তালিকার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, কবির কাব্য, নাটক ও উপন্যাস সম্বন্ধেই বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। তাঁহার গদ্য সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা কম, আর তাঁহার গদ্যরীতি সম্বন্ধে আলোচনা কিছুই হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ পরিমাণ বিচারে তাঁহার গদ্য সাহিত্যের পরিমাণ পদ্য ও নাটকের চেয়ে বেশি বই কম নয়। গদ্য সাহিত্যের মধ্যে অবশ্য উপন্যাস, ছোট গল্প ও অনেক নাটক পড়ে। সেই পরিমাণে গদ্য সাহিত্যের আলোচনা হইয়াছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে আলোচনা গদ্যের বা গদ্যরীতির আলোচনা নয়, উপন্যাস, ছোটগল্প বা প্রাসঙ্গিক নাটকগুলির আলোচনা। গদ্য সাহিত্যের বিশুদ্ধ মূর্তি পাওয়া যাইবে তাঁহার প্রবন্ধ গ্রন্থগুলিতে। নাটকে বা উপন্যাসে গদ্যরীতি কাহিনীর উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান, কাজেই সেখানে তাহার বিশুদ্ধ মূর্তি সব সময়ে দৃষ্টিগোচর হয় না। অন্যপক্ষে প্রবন্ধে গদ্যই গদ্যের নির্ভর, অবশ্য Idea আছে, কিন্তু Idea নিজেই অশরীরী, সে অপরের ভরসহ নয়, বরঞ্চ সে নিজেই ভর করিবার জন্য আশ্রয় খোঁজে, গদ্যরীতি সেই আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যরীতির আলোচনায় এখন বিশেষজ্ঞগণের মনোনিবেশ আবশ্যক।

প্রথম কারণ সে আলোচনা বেশি হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ, রবীন্দ্র-মনীষার অনেক রত্ন ঐ প্রবন্ধগুলিতে নিহিত, তাহার উদ্ধার করিলে রবীন্দ্রনাথের আর একটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। তার পরে আমাদের জাতি এখন নূতন পথের সন্ধানে নিযুক্ত; সেই পথের সন্ধান, ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ও জাতীয় যাত্রাপথের অনেক চোরাবালি ও কানাগলির সতর্ক বাণী প্রবন্ধগুলিতে বিন্যস্ত। নিপুণ বিশ্লেষণায় সেগুলি সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হইলে জাতীয় চরিতার্থতার পথ সুগম হইবে। আর গদ্যরীতির বিশেষ আলোচনার কারণ এই যে, আমাদের বর্তমান সাহিত্য ও ভবিষ্যৎ সাহিত্য প্রধানত গদ্যাশ্রয়ী হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। গদ্যাশ্রয় গদ্যরীতির অপেক্ষা রাখে; গদ্যরীতির বিশ্লেষণ ও আলোচনায় গদ্যরীতি সম্বন্ধে লেখকগণের ধারণা স্পষ্ট হইলে তাঁহাদের লেখনীর পথ সুগম হইবার সম্ভাবনা। রবীন্দ্রপ্রবন্ধ ও রবীন্দ্রগদ্যরীতি বিশেষ আলোচনার ফলে জাতি ও সাহিত্য দুয়েরই মঙ্গল হইবে মনে হয়। কাজেই এদিকে রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি পড়া আবশ্যক।

২

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে-সব গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল। কিন্তু আজ আমাদের জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে-স্থান তাহাতে ব্যক্তিগত প্রয়াসের চেয়েও কিছু বেশি আবশ্যক। কোন ব্যক্তি কি লিখিবেন তাহার নির্দেশ দেওয়া চলে না। লেখক তাঁহার শক্তি ও অভিরুচি অনুসারে কাজ করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেভাবে কাজ চলিলে রবীন্দ্র-চর্চার উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু অভীষ্ট পথে উন্নতি না হইতেও পারে। প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এ মন্তব্য খাটে না। প্রতিষ্ঠানের শক্তি ব্যক্তিগত শক্তির চেয়ে ব্যাপক এবং তাহার অভিরুচিকে নির্দিষ্ট পথে চালনাও সম্ভব। এখন যদি প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্র-চর্চার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে, তবে রবীন্দ্র-চর্চাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রয়োজন অনুসারে চালনা করা যাইতে পারে। দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যাবিতরণী

প্রতিষ্ঠানের অভাব নাই। ইহাদের অধিকাংশই রবীন্দ্র-চর্চা সম্বন্ধে উদাসীন প্রায়। সত্য বটে, বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উক্ত অধ্যাপক পদে প্রবীণ ও গুণী ব্যক্তি সমাসীন। কিন্তু তিনি যাহাতে সর্বতোভাবে রবীন্দ্রচর্চায় ও রবীন্দ্রচর্চা পরিচালনায় মনোনিবেশ করিতে পারেন, সে ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসঙ্গীত, নাটক ও রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যকলার চর্চায় বিশেষ মনোযোগী। ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু সেরূপ প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতী ছাড়া আরও আছে, যদিচ তাহাদের শক্তি ও কৌলিন্য বিশ্বভারতীর সহিত তুলনীয় নয়। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের চর্চা আরও ব্যাপক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। বিশ্বভারতীতে যে রবীন্দ্র-সদন আছে সেখানে রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত প্রভূত উপাদান সঞ্চিত আছে বলিয়া শুনিতে পাই। কিন্তু কি আছে না আছে বাহিরের লোকের পক্ষে জানা সম্ভব নহে। রবীন্দ্র-সদনে সংগৃহীত উপাদানসমূহের একটি বিবরণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে দেশে রবীন্দ্র-চর্চার পথ প্রশস্ত হইবে। রবীন্দ্র-সদনের একটি ক্যাটালগ প্রকাশ অবিলম্বে বাঞ্ছনীয়। এতদিনে কাজটি হওয়া উচিত ছিল। অন্য কিভাবে বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-চর্চার পথ সুগম করিতে পারেন, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই তাঁহারা উদাসীন নহেন। তবু কথাটা মনে করাইয়া দিলাম। রবীন্দ্র-চর্চার ভার বিশেষভাবে বিশ্বভারতীর উপর ন্যস্ত সে কথা খুলিয়া বলাই বাহুল্য।

বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ রবীন্দ্ররচনাবলী ও অপ্রকাশিত রচনা উদ্ধার ও প্রকাশকল্পে যে প্রভূত পরিশ্রম করেন, তজ্জন্য তাঁহারা গবেষণা বা Research গৌরবের দাবি করেন না বটে, কিন্তু যে কাজ তাঁহার নিত্য করিতেছেন, তাহা সত্যই গবেষণা এবং যে-কোন গবেষকের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। এ পর্যন্ত এই একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানই নামে না হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-চর্চায় নিযুক্ত আছেন—আর তাহার ফলস্বরূপ পাঠকসমাজ রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিস্তৃত অংশের পরিচয় পাইতেছেন। রচনাবলীর সঙ্গে যুক্ত 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশ রবীন্দ্র-চর্চাকারিগণের কাজ যে কত সহজ করিয়া দিয়াছে, তাহা বিশেষজ্ঞগণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

সম্প্রতি কলিকাতায় রবীন্দ্রভারতীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। রবীন্দ্র-চর্চা উক্ত প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। কিন্তু উহার কর্মপদ্ধতি এখনো অপ্রকাশ। তবে আশা করা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীন চর্চাই উহার কর্মপদ্ধতির অন্তর্গত হইবে। রবীন্দ্র-ভারতী কর্তৃপক্ষের প্রথম কর্তব্য হইবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থগুলি সংগ্রহ। দ্বিতীয় কর্তব্য হইবে বিশেষজ্ঞগণের নায়কতায় নির্দিষ্ট সূচীতে রবীন্দ্র-চর্চার উদ্দেশ্যে ছাত্র-গবেষক নিয়োগ। এরূপ গবেষণায় আড়ম্বর বা জলসার জৌলুস নাই বলিয়া আশা করি ইহাকে অর্থের অপব্যয় তাঁহারা মনে করিবেন না! রবীন্দ্র-চর্চা প্রভূত অধ্যবসায় সাধ্য—দীর্ঘকালের নিরলস চেষ্টা ব্যতীত সাফল্য লাভ সম্ভব নহে। রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান সে ভার গ্রহণ করিবেন ইহা অন্যায় আশা নয়।

তারপরে আছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। জ্ঞানানুশীলনের এই উদার প্রতিষ্ঠানটিতে বিশেষভাবে রবীন্দ্র-চর্চার স্থান হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে কোন্ কর্মপদ্ধতি অবলম্বনীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাহা স্থির করিবেন। আপাতত দুটি বিষয় মনে হইতেছে, রবীন্দ্র-অধ্যাপক পদ সৃষ্টি ও ছাত্রগবেষক নিয়োগ। রবীন্দ্র-সাহিত্য জাতীয় সম্পদ। সমগ্র জাতির দায়িত্ব ও কর্তব্য ববীন্দ্র-চর্চার সহিত জড়িত। সে দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে কেবল সাহিত্য নয় সমস্ত জাতীয় জীবনের মান উন্নীত হইবে। ইহাই তো জাতির বর্তমান আকাঙ্ক্ষার বস্তু। তাহা যদি হয়, তবে অর্থাভাব, কিংবা সময় বা সুযোগের অভাব এসব অজুহাত একেবারেই অচল। লোকসভা ও বিধানসভাসমূহ যে দায়িত্ব একভাবে সম্পন্ন করিতেছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের যথোচিত চর্চা তাহাই অন্যভাবে, লেখকের মতে অধিকতর স্থায়ীভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবে। দেশের নূতন যাত্রার সূচনায় এবং পৃথিবীর এই সঙ্কটময় মুহূর্তে রবীন্দ্র-সাহিত্য যুগপৎ আমাদের আশার ও ভরসার প্রধান কারণ। একবার এই সত্যটি স্বীকার করিয়া লইলে বর্তমান প্রবন্ধের বক্তব্য বুঝিতে বা কর্মপদ্ধতির ইঙ্গিত স্বীকার করিয়া লইতে কাহারও কষ্ট হইবে না।

সাহিত্যবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যা

ইতিহাসের বড় বড় ফাঁড়াগুলি কাটিয়া না যাওয়া অবধি তাহাদের মারাত্মকতা বুঝিতে পারা যায় না। পাহাড়ের সরুপথ পার হইবার সময়ে তেমন ভয় করে না, কিন্তু পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া শিহরিয়া না ওঠে এমন পাষাণ হৃদয় বিরল। ইতিহাসের ফাঁড়া সম্বন্ধেও ঐ কথা। এমন ফাঁড়ার বিবরণে মানুষের ইতিহাস পূর্ণ। ঘরের কাছের একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। মেকলের বিখ্যাত ডেসপ্যাচের ফলে এদেশে ইংরেজী শিক্ষাদানের নীতি গৃহীত হইয়াছিল। তার সুফল ও কুফল দুই-ই বর্তিয়াছে আমাদের সমাজে। সুলভ কেরানী ও দুর্লভ মাইকেল মধুসূদন জুটিয়াছে আমাদের ভাগ্যে; বিধবা-বিবাহ আইন, স্ত্রী-শিক্ষা প্রসার ও নব্য বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবের সঙ্গে পাশাপাশি আছে আত্মকেন্দ্রিক বাঙালীর সমাজ-বিমুখতা, ব্যক্তিসর্বস্বতা ও পল্লী অঞ্চল পরিত্যাগের প্রবণতা; ঐ শিক্ষার ফলে গোরা বিনয়কে যেমন পাইয়াছি, তেমনি পাইয়াছি মহিম-অবিনাশকে; পরেশবাবু ও কৃষ্ণদয়ালবাবু একই ইংরেজী শিক্ষার বিচিত্র ফল! ইংরেজী শাসন তথা ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে 'আনন্দমঠে'র লেখক বলিতেছেন, "প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে সূক্ষ্ম কি তা জানা যায় না।......এখন এ দেশে

বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই, শিখায় এমন লোক নাই, আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু।...ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে।"

অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিকে ইংরেজের হাকিমের উক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা যে, ওয়ারেন হেস্টিংসের সৈন্যদলের পরাজয় বর্ণনার পরিবর্তে ইংরেজ-মহিমা স্বীকৃতির এই উৎকোচটুকু দিয়াছেন হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র সবকারেব উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাহা সত্য নয়। ইহা ইংরেজ শাসনের তেমন প্রশংসা নয়, যেমন ইংরেজী শিক্ষার। আর ইহাই ছিল সেকালের শিক্ষিত বাঙালীর মনের কথা। (এখনও পরিবর্তন হয় নাই দেখিতেছি)। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির অর্থ এই যে, ইংরেজী শিক্ষার ফলে বৈজ্ঞানিক ও বৈষয়িক বিদ্যা আয়ত্ত হইলে পরে আমরা আত্মবিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যা লাভ করিতে সক্ষম হইব। বঙ্কিমচন্দ্রের এ ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই। ইংরেজী শিক্ষার সুফলস্বরূপ রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতি নূতন করিয়া তত্ত্ববোধ উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন আমাদের জীবনে। কিন্তু সেই সঙ্গে শশধর তর্কচূড়ামণির দলেরও উদ্ভব ঘটিয়াছে, ইংরেজের বিজ্ঞানকে যাঁহারা দেশজ কুসংস্কারের তল্পী বহন কার্যে নিয়োগ করিয়াছেন। এই জন্যই গোড়ায় বলিয়া লইয়াছি যে, ইংরেজী শিক্ষার সুফল ও কুফল দুই-ই বর্তিয়াছে আমাদের জীবনে।

কিন্তু এই ব্যবস্থাকে ফাঁড়া বলি না, যেহেতু কাটিয়া গিয়াছে, তাছাড়া এ সু ও কু-য়ে মিশান, সু-এর ভাগটাই বেশী বলিয়া মনে করি।

আসল ফাঁড়া যে সঙ্কট হইলে হইতে প্যারিত অথবা হয় নাই। ইংরেজী শিক্ষার নীতি গৃহীত না হইয়া যদি সংস্কৃত ও আরবী ফরাসী শিক্ষাদানের নীতি গৃহীত হইত, তবে আজ দেশের অবস্থা কিরূপ হইত? এক্ষেত্রেও আশাবাদী লোকের অভাব নাই, কিন্তু আমার ত শরীর ভয়ে কণ্টকিত হইয়া ওঠে। কিন্তু এর চেয়েও অধিকতর

মারাত্মক একটা ধাঁড়া হইলে হইতে পারিত। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যদি সুলভ কেরানী তৈয়ারি করিবার নীতি গ্রহণের বদলে সুলভ কারিগর তৈয়ারি করিবার নীতি গ্রহণ করিত। বাঙালী "কেরানী" না হইয়া যদি "কারিগর" হইত, তবে আজ বাংলা দেশের অবস্থা কিরূপ হইত?

মনে করা যাক—ইংরেজ ব্যবসায়ীরা স্থির করিল যে, বিলাত হইতে পণ্য আনিয়া এদেশে বিক্রয় করিবার চেয়ে এদেশে তৈয়ারি করিয়া এদেশে বিক্রয় করিবে। তাহাতে লাভ বেশী, এদেশে মজুর সুলভ, কারখানা তৈয়ারি করিবার জমি সুলভ, বিলাতের তুলনায় সবই সুলভ। তবে আবার কাঁচা মাল বিলাতে টানিয়া লইয়া যাইবার প্রয়োজন কি? ল্যাঙ্কাশায়ারের বদলে এদেশেই বসিল কাপড়ের কল। এমনিতর সব কারখানাই এদেশে বসিল। এই ব্যবস্থার কী পরিণাম হইত? নগদ কড়ি আনিতে পারিবে বলিয়া যাহারা ইংরেজী স্কুলে ঢুকিত তাহাদের সকলে না হইলেও অধিকাংশই কি কারখানায় ঢুকিত না? একেবারে দিন মজুর না হইয়া ঢুকুক, "মেট" বা ঐ রকম কিছু হইয়া ঢুকিত। নগদ কড়ির চেয়ে প্রবল যুক্তি সংসারে বিরল। এমন কিছুকাল চলিলে ইংরেজী শিক্ষার ফলে গত দেড়শ বছরের মধ্যে কেরানী, নানা শ্রেণীর ছোট বড় সরকারী চাকুরে, শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, উকিল মোক্তারে মিলিয়া যে মধ্যবিত্ত সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে—নব্য বাঙালী সংস্কৃতির সেই আধার গড়িয়া উঠিত কি? ইংরেজী শিক্ষার ফলে, অর্থাৎ সাহিত্যশিক্ষার ফলে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির ধারক বাহক যে মধ্যবিত্ত সমাজ পাইয়াছি, তার স্থানে পাইতাম মজুর-কারিগরের সমাজ। কেরানী-গড়া শিক্ষার ব্যতিক্রম স্বরূপ আমরা বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, ভূদেব, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতিকে পাইয়াছি। কারিগর-গড়া পেশার ব্যতিক্রম স্বরূপ কি এক-আধটা হেনরি ফোর্ড বা এডিসনকে পাইতাম? বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, দীনবন্ধু প্রভৃতি কারিগররূপে কারখানায় ঢুকিলে বিচক্ষণ "মেট" হয়ত পাইতাম, আর হয়ত নয়, সুনিশ্চিত ইংরেজ রাজত্ব

আরও বেশী কায়েম হইয়া বসিত এদেশে। কে না জানে সে ইংরেজের শিক্ষাই নব্য শিক্ষিতদের ইংরেজদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল।

কেরানী-গড়া শিক্ষায় সমর্থন আনার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সেকালের বিখ্যাত শিক্ষা বিষয়ক মন্তব্য কেরানী-গড়ার নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে নাই, চাহিয়াছিল পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যবিদ্যাকে প্রতিষ্ঠা করিতে। তৎসত্ত্বেও প্রধানত যদি কেরানী গড়িয়া উঠিয়া থাকে তজ্জন্য সাহিত্যবিদ্যাকে দায়ী করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে "বড় ইংরেজ" বলিয়াছেন, সে চাহিয়াছিল সাহিত্যবিদ্যার প্রভাবে মনের দরজা জানলা খুলিয়া দিতে, আর তিনি যাহাকে "ছোট ইংরাজ" বলিয়াছেন. সে চাহিয়াছিল শিক্ষিতদের সম্মুখে অফিস ঘরের দরজাগুলা খুলিয়া দিতে। কেহই কল-কারখানার পথটার দিকে ইঙ্গিত করে নাই, করিলে কী হইত ভাবিতে ভয় করে—একটা আস্ত গোটা সমাজ কারিগর হইয়া উঠিলে কল্যাণ হইত ভাবিতে পারি না।

সেকালের ইংরেজ আমাদের ব্যবহারিক ও বৈষয়িক জীবনের বড় বড় দরজাগুলা বেশ আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল সত্য, কিন্তু জানলাগুলা বন্ধ করে নাই বা করিতে চাহে নাই। আমাদের ব্যবসাবাণিজ্য ইংরেজ সদাগরের হাতে গিয়া পড়িল, দেশ-শাসনকার্য ইংরেজ সিভিলিয়ানের হাতে গিয়া পড়িল, আমাদের উপনিবেশ নাই, বহির্বাণিজ্য নাই, বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্বন্ধ আমাদের জনশ্রুতিযোগে। এই ত আমাদের অবস্থা। কিন্তু সৌভাগ্য এই যে, জানালাগুলা বন্ধ হয় নাই। সাহিত্যবিদ্যা সেই জানলা। সেই জানলা দিয়া আমাদের কল্পনা উধাও হইয়া যাইত, অজানাদেশের হাওয়া সেই জানলা দিয়া ঢুকিয়া ঘরের মধ্যে মাতামাতি করিত। আমরা বাঁচিয়া গেলাম, পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ না করিলেও যে প্রাণে মরিলাম না তাহা ঐ সাহিত্যবিদ্যার কল্যাণে। গত দেড়শ বছরে আমাদের সামগ্রিক জীবনে যে সুফল ফলিয়াছে তাহা ঐ সাহিত্যবিদ্যার কল্যাণে, যে কুফল ফলিয়াছে তাহা ঐ সাহিত্যবিদ্যার অকল্যাণে; আমরা প্রাণে

বাঁচিয়া গেলাম এটি কল্যাণ; আমরা পূর্ণ স্বাস্থ্য হইতে বঞ্চিত হইলাম এটি অকল্যাণ। সাহিত্যবিদ্যার বদলে কারিগরিতে দীক্ষালাভ করিলে আমাদের আত্মিক মৃত্যু ঘটিত।

অনেকে বলিবেন কথাটা মিথ্যা নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা দিক ভাবিতে হয়। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, ইংরেজ-শাসনে সাহিত্যবিদ্যায় হাতেখড়ির ফলে আমাদের যেমন উন্নতি ঘটিয়াছে, বৈষয়িক দিকে তেমন কিছু ঘটে নাই। বৈষয়িক দিকের দীনতা আমাদেব পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, সাহিত্যবিদ্যার সাধ্য নাই সে দীনতার পূবণ করে। এখন যন্ত্রবিদ্যার সাহায্যে সেই ঘাটতি পূরণ করিয়া লইতে হইবে, নতুবা সাহিত্যবিদ্যার পূর্ণ ফলটাও আমরা ভোগ করিতে পারিব না। দেহযন্ত্রে জঠরের উপর হৃদয়ের সংস্থান। শূন্য জঠর কি পূর্ণ হৃদয়ের যোগ্য বাহন? তাঁহারা বলিবেন, ইংরেজ-শাসনে দেশের সাহিত্যবিদ্যার পাখানা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, এধারে যন্ত্রবিদ্যার পাখানাকে টানিয়া সাহিত্যবিদ্যার সঙ্গে সমান করিতে পারিলে তবে ত অগ্রসব হইতে পারিব। দুই পায়ে সমান ধাপ ফেলিতে পারিলে তবেই এগনো যায়, এই ত চলার স্বাভাবিক নিয়ম। স্বভাবের নিয়মে দেশে চিত্তবল ও বিত্তবল এখন যদি যন্ত্রবিদ্যার চর্চায় নিয়োজিত হয়, তবে খারাপটা কী, এই ত হওয়া উচিত।

এই যুক্তির মধ্যে কিছু সারবত্তা আছে, একেবারে অগ্রাহ্য করিবার মত কথা এ নয়। বরঞ্চ অনেকের কাছেই কথাটা যুগোচিত বলিয়া মনে হইবে। তাঁহারা বলিবেন আজকার পৃথিবীতে যে দুটি অতিকায় রাষ্ট্র সবচেয়ে শক্তিমান, সেই মার্কিন ও সোভিয়েট রাশিয়া যন্ত্রবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ। তাহাদের প্রতাপের মূলে যন্ত্রবিদ্যাব সাফল্য। ইংলণ্ডের সে প্রতাপের দিন আর নাই। কিন্তু যখন ছিল তখনও ঐ একই কারণে ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষে ও উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে যন্ত্রবিদ্যায় ইংলণ্ডে ছিল প্রাগ্রসরতম। এ সব ত ইতিহাসের কথা আর বর্তমানের দৃষ্টান্তটা ত চোখে দেখা সত্য—অস্বীকার করিবার উপায় কী? তৎসত্ত্বেও ভাবিবার বিষয় আছে।

ইংরেজ-শাসনে ভারতবর্ষের যথেষ্ট অগ্রগতি হইয়াছে, কিন্তু সে অগ্রগতি একঠেঙে মানুষের কাজেই তা স্বাভাবিক নয়। সাহিত্যবিদ্যার এক পায়ে দীর্ঘ ধাপ ফেলিয়া আমরা অগ্রসর হইয়াছি, যন্ত্রবিদ্যার পাখানা কাজে লাগে নাই। এখন পৃথিবীর বৃহত্তর ক্ষেত্রে সেই অভিনয় হইতে চলিয়াছে। পৃথিবীর প্রবল ও প্রধান রাষ্ট্রগুলি আজ যন্ত্রবিদ্যার পায়ে প্রচণ্ড লাফ মারিতে উদ্যত, সাহিত্যবিদ্যার পাখানা নিতান্ত অনুগামী মাত্র। সাহিত্যবিদ্যার একঠেঙে চাল যদি সুখকর, স্বাস্থ্যকর ও স্বাভাবিক না হয়, তবে যন্ত্রবিদ্যার একঠেঙে চালও তা-ই, কেবল বিপরীতভাবে তা-ই। সাহিত্যবিদ্যার যদি আতিশয্য আমাদের বিষয়বিমুখ করিয়া থাকে, তবে যন্ত্রবিদ্যার আতিশয্যও প্রবল ও প্রধান রাষ্ট্রগুলিকে যথার্থ কল্যাণের বিমুখ করিয়া তুলিবে। সমস্ত স্বার্থ ও সমস্ত শক্তির সামাঞ্জস্যই যথার্থ কল্যাণ। মানুষের মন কোন একটা দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে সেই সামঞ্জস্যবোধ নষ্ট না হইয়া পারে না। পৃথিবীতে আজ যে ব্যাপক অশান্তি তাহার মূলে নষ্টপ্রায় সামঞ্জস্যবোধ। সাহিত্যবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যার হেরফের ঘটিয়া গিয়া এই কাণ্ডটি ঘটাইতেছে।

অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যন্ত্রবিদ্যার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়, তাহা দেখা যায়, দেখানো যায়, ওজন করা যায়, মাপা যায় এবং সিন্দুকে ভরিয়া রাখা যায়। যন্ত্রবিদ্যা মানুষকে বিত্তবান ও শক্তিমান করে। সাহিত্যবিদ্যার ফল এমন প্রত্যক্ষ নয়, তাহাকে অস্বীকার করিতে বেগ পাইতে হয় না, নাই বলিলে আছে প্রমাণ করা মুশকিল। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শক্তিমান হইয়া উঠিবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ যুগকে পাইয়া বসিয়াছে, কাজেই যন্ত্রবিদ্যার বড় আদর আধুনিক কালে। আমাদের মনটাও সেই হাওয়ায় যে আন্দোলিত হইবে, সেটা ত খুবই স্বাভাবিক। বাঁচিয়া যখন থাকিতে হইবে, তখন যন্ত্রবিদ্যাকে অস্বীকার করিতে যাইব কেন? কেবল দেখিতে হইবে যে, সাহিত্যবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যার স্বাভাবিক অনুপাত বা সামঞ্জস্য যেন নষ্ট না হইয়া যায়। একথা বলিয়া লাভ নাই যে, এক সময়ে যেহেতু

সাহিত্যবিদ্যার ঐকান্তিক চর্চা করিয়াছি, এখন না হয় কিছুদিন যন্ত্রবিদ্যার ঐকান্তিক চর্চা চলুক। এক সময়ের অস্বাভাবিকতাকে নজিররূপে ব্যবহার করা চলে না। তা ছাড়া আরও কারণ আছে। সাহিত্যবিদ্যার আনুরক্তি আমাদের মনকে যন্ত্রবিদ্যার প্রতিকূল করিয়া তোলে নাই। যন্ত্রবিদ্যার আনুরক্তিতে সে আশঙ্কা আছে, সাহিত্যবিদ্যার প্রতি বিরাগ অসম্ভব নয়। যন্ত্রবিদ্যার দীক্ষায় প্রবল রাষ্ট্রগুলি সাহিত্যবিদ্যার সার্থকতা সম্বন্ধে উদাসীন। 'সংস্কৃতি' ও 'সাংস্কৃতিক' শব্দ দুটি আজকাল খুব চড়া দামে বিকাইতেছে সত্য, কিন্তু ইহা 'Culture' বা 'Cultural' শব্দ দুটির প্রতিশব্দ নয়। যন্ত্রবিদ্যায় দীক্ষিত চিত্ত আপন অভিপ্রায় ও ধারণা অনুসারে 'Culture'কে 'সংস্কৃতিতে' রূপান্তরিত করিয়াছে। 'Culture' 'যত মত তত পথ' স্বীকার করে, 'সংস্কৃতি' 'এক মত এক পথ' ছাড়া কিছু জানে না। যন্ত্রবিদ্যা আপন স্বার্থে অনেক সময়ে সাহিত্যবিদ্যার ঠাট বজায় রাখে সত্য, কিন্তু সুকৌশলে বস্তু বদল করিয়া নেয়। তাই প্রথম নজরে 'সংস্কৃতিকে' 'Culture' বলিয়া ভ্রম হইলেও বস্তুত ঐ দুই স্বতন্ত্র। সাহিত্যবিদ্যা যন্ত্রবিদ্যার মূল্য বোঝে, যন্ত্রবিদ্যা সাহিত্যবিদ্যার মূল্য বোঝে কিনা সন্দেহ, স্বরূপত বোঝে না নিশ্চয়। উদাহরণ স্বরূপ Culture ও সংস্কৃতির উল্লেখ করিলাম।

সাহিত্যবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যার মধ্যে রেষারেষি সৃষ্টি করিয়া যন্ত্রবিদ্যাকে একঘরে করিবার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধ রচিত নয়। সুষ্ঠু সমাজ-জীবন যাপনের জন্য সাহিত্যবিদ্যাও চাই, যন্ত্রবিদ্যাও চাই, তবে সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার অন্তর্গত করিয়া চাই। পরিকল্পনাধীনভাবে উভয় বিদ্যার প্রসার ঘটিলে সমাজ দুই পায়ের স্বাভাবিক চাল ফিরিয়া পাইবে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে, যন্ত্রবিদ্যার প্রসার সুপরিকল্পিতভাবে ঘটিতেছে না, যেমন এককালে সাহিত্যবিদ্যার প্রসার সুপরিকল্পিতভাবে ঘটে নাই।

রাতারাতি বৈষয়িক উন্নতি ঘটাইবার আশায় কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্য সরকারসমূহ যন্ত্রবিদ্যা প্রসারের উপরে প্রবল ঝোঁক

দিয়াছেন। ছাত্রসমাজও সেই দিকে গড়াইয়াছে। অর্থবল ও লোকবল এক্ষণে দুই-ই যন্ত্রবিদ্যামুখী। যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার বিশেষ শিক্ষায়তন সংখ্যায় বাড়িতেছে; কলেজের বিজ্ঞানশ্রেণী উপছাইয়া যাইতেছে; আর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান কোণঠাসা হইবার মত আত্মজ যন্ত্রবিদ্যার চাপে। কিন্তু সংখ্যার হিসাবটাই মুখ্য নহে। দেশের অধিকাংশ মেধাবী ছাত্র ঝুঁকিয়াছে যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষালয়ে। সরকারের উৎসাহ, অভিভাবকের আগ্রহ, ছাত্রসংখ্যা ও মেধাবী ছাত্র সমস্তই আজ যন্ত্রবিদ্যার অনুকূল। ইহাকেই বলি পরিকল্পনাহীন অগ্রগতি। সাহিত্যবিদ্যা আজ কোনরকমে তৈলনিঃশেষ শিখার মত টিকিয়া আছে। আর দু-এক দণ্ড অতিক্রান্ত হইলেই সব অন্ধকার। তবু এ কেবল কলির সন্ধ্যা। বর্তমান প্রজন্ম যন্ত্রবিদ্যার ঠিক পুরা সুফল পাইবে না, কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্মে যখন পুরা ফল ফলিতে শুরু করিবে, কলকারখানার প্রথম ফসল ঘরে উঠিতে আরম্ভ করিবে তখন সাহিত্যবিদ্যার প্রতি শেষ অনুরাগ ও আস্থাটুকু লোপ পাইবে, শুরু হইয়া যাইবে বৈষয়িক বর্বরতার যুগ। ইংরেজী শিক্ষায় আদি পর্বে পরিকল্পনাধীন সাহিত্যশিক্ষার সংঘাতে নষ্ট ও বিকৃত হইয়াছে দেশের প্রাচীন সংস্কৃতজ 'কালচার'—এবারে নষ্ট হইতে চলিল সাহিত্যবিদ্যা-জাত নব্য কালচার। সেকালে বাড়ির মেধাবী ছেলেটিকে পাঠান হইত হেয়ার সাহেবের স্কুলে বা পরবর্তী কালে হিন্দু কলেজে আর স্থূলবুদ্ধি ছেলেটি যাইত গ্রামের চতুষ্পাঠীতে। এইভাবেই দীর্ঘকাল চলিয়াছে। ফল হইয়াছে, সংস্কৃতজ কালচারের বিকার বা নাশ। এখনও অনুরূপ প্রক্রিয়া চলিতেছে, তবে ভিন্ন ক্ষেত্রে বাড়ির মেধাবী ছেলেটি যাইতেছে যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে, দ্বিতীয় বিভাগে পাস ছেলেটির জন্য উন্মুক্ত কলেজের সাহিত্য শ্রেণীগুলি। ইহার পরিণামও কি অনুরূপ নয়? সাহিত্যবিদ্যা যে মানুষকে 'মানুষ' করে না, তাহার পরীক্ষা কি হইবে দ্বিতীয় বিভাগের ছাত্রের মেধার সাহায্যে?

যদি এ আশঙ্কা সত্য হয়, যদি সাহিত্যবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা অবশ্য কর্তব্য হয়, তবে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও

পরিকল্পনা অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। সুপরিকল্পিত জীবনেরই অন্য নাম সমাজতন্ত্র। পরিকল্পনার ছাঁচ গড়িয়া দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, সে সাধ্যও আমার নাই। দেশের সমস্ত মেধাবী ছাত্র যাহাতে যন্ত্রবিদ্যার দিকে না ঝুঁকিয়া পড়ে, তাহাই হইতেছে পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। ছাত্রসমাজের মেধার ও সরকারী অর্থানুকূল্যের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া অগ্রসব হইতে হইবে, তবেই সাফল্যলাভেব আশা।

আশঙ্কা করিতেছি অনেকে চমকিয়া উঠিয়া বলিবেন, সর্বনাশ! এ যে Regimentation-এর মত শোনাইতেছে, এ ত ডিক্টেটারশিপের পথ! তাঁহারা বলিবেন, আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এব্যবস্থা কখনই চলিতে পারে না। তাঁহাদের কথার উত্তরে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, ডিক্টেটারশিপের প্রশস্ততম ও সুগমতম পথ যন্ত্রবিদ্যার প্রসার। যন্ত্রবিদ্যা যেমন মানুষের মনকে অল্প সময়ে, আপনার অগোচরে ছাঁচে ঢালাই করিতে সমর্থ এমন আর কিছুই নয়। এ সত্য ডিক্টেটাবগণের চেয়ে কেহ বেশী জানে না—তাই তাঁহাদের রাজ্যে যন্ত্রবিদ্যার এত আদর। যন্ত্রবিদ্যা দেশের মনকে কর্তৃপক্ষের অভীষ্ট ছাঁচে ঢালাই করে, মানুষ ক্রমে সংখ্যায় পরিণত হইয়া নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্রে পরিণত হয়, আবার যন্ত্রবিদ্যা দেশের সামরিক শক্তিকেও পুষ্টতর করিয়া তোলে। একাধারে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র শাসনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয় যে যন্ত্রবিদ্যা তাহার আদর না হইয়া যায় না ডিক্টেটারশাসিত রাষ্ট্রে। সাহিত্যবিদ্যা ডিক্টেটারশিপের পরম প্রতিষেধক। সেই সাহিত্যবিদ্যাকে উপেক্ষা করিয়া যন্ত্রবিদ্যার কাছে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিলে শেষ পর্যন্ত এক সময়ে ডিক্টেটারশিপের কাছেও আত্মসমর্পণ করিতে হইতে পারে। সেই সর্বাঙ্গীন Regimentation-এর ভীতি হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যেই সামান্য এই পরিকল্পনাটুকু মানিয়া লওয়া উচিত। অনিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পনাহীন যন্ত্রবিদ্যা চরিতার্থতার পথ নয়—সঙ্গে সাহিত্যবিদ্যার সুষ্ঠু মিশ্রণ অত্যাবশ্যক।

সাহিত্য আকাদামীর আদর্শ ও প্রচার

ফরাসী একাডেমীর আদর্শে পরবর্তীকালে অনেক দেশে একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদেব সাহিত্য আকাদামী প্রতিষ্ঠাব মূলেও যে সে প্রেরণা আছে, যত ক্ষীণভাবেই থাকুক না কেন, কল্পনা করা অন্যায় হইবে না। কিন্তু ফরাসী একাডেমী ও সাহিত্য আকাদামীর প্রেরণার মূল্য সমান নয়। দু'য়ে প্রভেদটা খুব গোড়া-ঘেঁষা, সজীব ও জড়ের প্রভেদ। ফরাসী একাডেমী প্রতিষ্ঠার ইতিহাস প্রসঙ্গ ম্যাথু আর্নল্ড বিস্তারিত বর্ণনা কবিয়াছেন, তিনি লিখিতেছেন যে, ১৬২৯ সালের কাছাকাছি প্যারিসে কয়েকজন সাহিত্যবসিক ব্যক্তি ঘরোয়াভাবে মিলিত হইয়া সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিতেন। এই সংবাদটা শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজনৈতিক কর্ণধার কার্ডিনাল রিশলুব কানে পৌঁছাইল। তিনি উক্ত সাহিত্যরসিক সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা রাষ্ট্রানুমোদন লাভ করিয়া একটি সঙ্ঘে পরিণত হইতে চাহেন কিনা। সাহিত্যিকগণ অনেক ইতস্তত করিয়া অবশেষে রাজি হইলেন। ১৬৩৫-এ রাজানুমোদন ও ১৬৩৭-এ পার্লামেণ্টের অনুমোদন লাভ করিয়া উক্ত ঘরোয়া প্রতিষ্ঠান রীতিমত একাডেমীতে রূপান্তরিত হইল। একাডেমীর আদর্শ ও কর্তব্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"The Academy's principal function shall be to work with all the care and all the diligence possible at giving sure rules to our language and rendering it

pure, eloquent, and capable of treating the arts and sciences."

এবারে ফরাসী একাডেমী ও সাহিত্য আকাদামীর প্রভেদটা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল। সেখানে সাহিত্যবিষয়ক একটি সজীব প্রতিষ্ঠানকে স্বীকার করিয়া লইয়া রাজশক্তির সাহায্যে তাহাকে লালন ও পুষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছে, দেশের মনোভূমিতে যাহা ছিল না তাহার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হয় নাই। আর একাডেমীর উদ্দেশ্য কি? ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা, ভাষাদেহকে এমন স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠব দান করা যাহাতে তাহার পক্ষে সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞানবিজ্ঞানের বাহন হইয়া ওঠা সহজ হয়। সাহিত্য আকাদামীর প্রেরণার মূলে এ দুয়েরই অভাব। পূর্বতন কোন সজীব প্রবণতার পরিণাম আকাদামী নয়। আবার ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রসঙ্গও ওঠে না, কারণ আকাদামীর নিজস্ব কোন ভাষা নাই, সংবিধান স্বীকৃত চৌদ্দটি ভাষা লইয়া তাহার কারবার। এ যেন এমন একটা মন্ত্রিসভা যেখানে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব কোন দপ্তর নাই, চোদ্দজন মন্ত্রীর চোদ্দটি দপ্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংযোগ রক্ষা করাই যাঁহার একমাত্র কর্তব্য। এমন মন্ত্রিসভার পরিণাম শুভ নয়। সাহিত্য আকাদামী সম্বন্ধে তেমন ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে চাই না, কিন্তু মূলে সজীব প্রেরণা না থাকায়, নিজস্ব ভাষাভূমি না থাকায় এ বস্তু অবাস্তব হইয়া পড়িতে বাধ্য; ত্রিশঙ্কুর মতো ইহার স্থিতি শূন্যে; আঞ্চলিক ভাষার মর্ত্যলোক, সার্বজনীন ভাষার স্বর্গলোক দুটাই ইহার আয়ত্তাতীত। এ বস্তু নিজেই দুর্বল, কেমন করিয়া বল দান করিবে সাহিত্যে ও ভাষায়?

ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্য আকাদমীর দ্বারা কিভাবে ও কতখানি উপকৃত হইবে আমার পক্ষে বলা কঠিন, কিন্তু বাংলা সাহিত্য যে বিশেষ উপকৃত হইবে না অনায়াসে বলা যায়। আকাদামীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য "to set high literary standards"। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নিরর্থক। কেন খুলিয়া বলি। প্রধানত দুটি কারণে

বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির উপরে আকাদামীর শুভ প্রভাব কার্যকর হইবার আশা নাই। বর্তমান সাল যদি ১৯৫৮ না হইয়া ১৮৫৮ হইত, নব্য বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি যদি অনিশ্চিত ও অপরিণত হইত তবে আকাদামীর মতো প্রতিষ্ঠান শুভ প্রভাব বিস্তার করিলেও করিতে পারিত। কিন্তু গত একশ বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সুনির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। একশ বছরের মধ্যে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ বিপুল ও বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সৃষ্টিকার্যের দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পথ ও লক্ষ্য পাকাভাবে সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, কাঁচা কিছুই নাই। নূতন কারিগর সাত মহলার সঙ্গে আর এক মহল যোগ করিয়া দিতে পারেন কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নূতন নক্সা আঁকিবার সুযোগ আছে মনে হয় না। আকাদামীর অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে "to set high literary standards!" সে কাজ বিদ্যাসাগর হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রতিভাবান স্থপতিগণ করিয়া গিয়াছেন। এ কাজ কোন দেশে করে প্রতিষ্ঠান বিশেষ, কোন দেশে করে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ। ফরাসী দেশে এ কাজের ভার ফরাসী একাদেমীর উপরে, ইংলণ্ডে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের উপরে। ভারতের অন্য অঞ্চলে "to set high literary standards" আকাদামী করিলেও করিতে পারেন কিন্তু বাংলা দেশে সে-সুযোগ নাই। আজকার দিনে কোন বাঙালী লেখকের পক্ষে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিককে অস্বীকার করিয়া কলম চালানো অসম্ভব।

আরও একটি কারণে বাংলা সাহিত্যের পক্ষে আকাদামীর প্রভাব অবান্তর। সেটা সাহিত্যের জাতি-প্রকৃতি বা ধাতের কথা। ফরাসী সাহিত্যের জাতি-প্রকৃতি একাডেমীর মতো প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ মানিবার অনুকূল। অস্পষ্টভাবে যাহাকে Latin Genius বলে তাহা নিয়মপন্থী শক্তি; নিয়মের ফ্রেমে তাহা বেশ স্বস্তি ও শোভা পায়। সেইজন্য নানা দেশে একাডেমী স্থাপিত হইলেও ফরাসী

দেশে যেমন শিকড় গাড়িয়াছে, এমন বোধ করি আর কুত্রাপি নয়। জাতি হিসাবে ইংবাজ পরম নিয়মনিষ্ঠ হইলেও তাহার সাহিত্যিক প্রকৃতি অত্যন্ত বেয়াড়া। নিয়মের বেড়াকে স্বীকার করার চেয়ে তাহাকে ডিঙাইতেই তাহার উল্লাস। ইংলণ্ডে একাডেমী স্বভাবগত হয় নাই। দ্বিতীয় চার্লস দীর্ঘকাল ফরাসী দেশে বাস করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলে পব ফবাসী একাডেমীর আদর্শে রয়াল সোসাইটি স্থাপন করিয়াছিলেন। গোড়ায় সাহিত্যিকগণও তাহার সদস্য হইতেন, যতদূর মনে পড়িতেছে, বিখ্যাত লেখক এডিসন এক সময়ে উক্ত সোসাইটির সেক্রেটারী ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহিত্যিক জাতি-চরিত্র বিদ্রোহ করিয়া বসিল, একাডেমীর বন্ধন স্বীকার করিল না। রয়াল সোসাইটি এখন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। বাংলা সাহিত্যের ধাতটাও প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ মানিবাব অনুকূল নয়। একটা ঘরোয়া দৃষ্টান্ত দিই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও তাহার পূর্বরূপ Bengali Academy of Literature-এর উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন সাহিত্যে গবেষণা ও নূতন সাহিত্যে উৎসাহ দান। এখানেও দেখিতে পাই যে, বাংলা সাহিত্যের জাতি-প্রকৃতির বিদ্রোহ করিয়াছে, নূতন সাহিত্য বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের মুখাপেক্ষী হইতে অস্বীকার করিয়াছে, সাহিত্য পরিষদ এখন প্রাচীন সাহিত্যে গবেষণাব শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। মোট কথা এই যে, ভাবতের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর সাহিত্য, যাহার প্রকৃতি প্রতিষ্ঠান নির্দেশের অনুকূল সাহিত্য আকাদামীর প্রভাব তাহার পক্ষে শুভকর হইতে পারে, "high literary standards" মানিয়া লইতে পারে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের বর্তমান অবস্থায় তেমন সম্ভাবনা নাই। বাংলা সাহিত্য আকাদামীর গৌণ ফলটুকু মাত্র পাইতে পারে। এক্ষেত্রে গৌণফল আকাদামী কর্তৃক সাহিত্যিকগণকে পুরস্কার সম্মান দান।

সাব-কমিটি কর্তৃক রসসাহিত্যের মান নির্ণয়ের মতো অসংগতিপূর্ণ ব্যাপার সংসারে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। মার্জিতরুচি ও

সহৃদয় ব্যক্তি রসসাহিত্যের যোগ্য বিচারক হইতে পারেন আবার প্রাকৃত জনেরও সে গুণের অভাব না থাকিতে পারে, কিন্তু সাব-কমিটি নামধেয় অস্পষ্ট, অবাস্তব বস্তুটির যে গুণ আছে মন বিশ্বাস করিতে চায় না। লোকের বিশ্বাস, সাব-কমিটির হাতে রসবিচারের অভ্রান্ত ও সূক্ষ্ম নিক্তিটি বর্তমান, কিন্তু কাছের দৃষ্টিতে দেখিলে সে বিশ্বাস শিথিল না হইয়া পারে না। হয়তো পাঁচজন সদস্যের মধ্যে তিনজন মাত্র উপস্থিত হইলেন, তার মধ্যে একজনের হয়তো উপস্থাপিত পুস্তকগুলি দেখিবারই সুযোগ হয় নাই, তিনি অপর দুইজনের সঙ্গে সুর মিলাইয়া হাঁ হাঁ করিয়া গেলেন। সে দুইজন আবার সারা বছর নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন, বৎসরকালে প্রকাশিত পুস্তকগুলির স্থূল বিবরণটাও হয়তো জানেন না, জানিবার অবসর তাঁহাদের কোথায়? এদিকে আবার নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পুরস্কার ঘোষিত না হইলে টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, কাজেই একখানা বই পুরস্কারপ্রাপ্ত ঘোষিত হইল। ঠিক এইভাবেই যে আকাদামীর কাজ হয় তাহা নয়, কিন্তু সাব-কমিটির কাজের ধারাটা সর্বত্র এইরকম বটে। এখন এই বিচারকে বৃহত্তর পাঠকসমাজ বিক্রমাদিত্যের নিক্তির বিচার বলিয়া গ্রহণ করিল। যোগ্যতাসম্পন্ন একক ব্যক্তি যে রসসাহিত্যের যথার্থ বিচারক হইতে পারেন তাহার উদাহরণ কালিদাসের প্রভু বিক্রমাদিত্য। তিনি কালিদাসের কাব্য বিচারে ভুল করেন নাই। আবার প্রাকৃত জনও যে মোটের উপরে সুবিচারক হইতে পারে তাহার উদাহরণ শেক্সপীয়রের সমকালীন দর্শকগণ। তাহারাও শেক্সপীয়রের নাটকের সমাদর করিয়াছিল। কিন্তু সাব-কমিটিকে সে পর্যায়ভুক্ত মনে করিবার কারণ নাই। নোবেল প্রাইজ সাব-কমিটির বিচার কালের ধোপে কি ফাঁসিয়া যায় নাই? গত সাতান্ন বৎসর ধরিয়া নোবেল পুরস্কারদান হইতেছে, পুরস্কারপ্রাপ্তদের কয়জনের নাম আজ স্মরণীয়? তুলনায় নোবেল পুরস্কার কমিটির উপেক্ষিতদের নামের তালিকা কম স্মরণীয় নয়? টলস্টয়, ইবসেন, হার্ডি এমন অনেক নাম করা যাইতে পারে। কথা উঠিবে, মানুষের বিচার অভ্রান্ত

নয়। নিশ্চয় নয়। তবে জানিয়া শুনিয়া এমন দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে কেন? বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিজেদের বিচার-বিবেক অনুযায়ী যেমন খুশী পুরস্কারদান করুক, সরকারের সে কাজ নয়।

পুরস্কার সাহিত্যকে পরমুখাপেক্ষী করিয়া তোলে, সরকারী মুখাপেক্ষী করিয়া তোলে। আমি জানি যে, সাহিত্যিককে পরমুখাপেক্ষী করিয়া তুলিবার ইচ্ছা আকাদামীর নাই। কিন্তু অর্থ ও সম্মান স্বভাব ত্যাগ করিবে কেন? যে হাত খাদ্য জোগায়, মাল্যচন্দন পরাইয়া দেয় তাহার প্রতি আনুগত্য না হইয়া যায় না। সাহিত্যিকের, বাংলা সাহিত্যিকের মূল প্রেরণা বেপরোয়া ভাব, শাসন কর্তৃপক্ষের প্রতি উদাসীনতার ভাব। গত দেড়শ বছরকাল বৃটিশ শাসনে থাকিবার ফলে এই ভাবটির সৃষ্টি হইয়াছে বাঙালী সাহিত্যিকের মনে, সরকার নিরপেক্ষ মহৎ সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে বাংলা ভাষায়। আকাদামীর ও রবীন্দ্র পুরস্কারের আনুকূল্যে যদি তাহা নষ্ট হইয়া যায় তবে বাংলা সাহিত্যের দুর্দিন আরম্ভ হইল মনে করিতে হইবে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, বৃটিশ সরকার সাহিত্যে পুরস্কার দানের নীতি গ্রহণ করে নাই।

সাহিত্যিককে দান ভালো কিন্তু পুরস্কার দান ভালো নয় এবং সরকার কর্তৃক পুরস্কার দানের মতো ক্ষতিকর ব্যাপার অল্পই আছে। সরকার স্বয়ং বা সরকারের প্রতিনিধিরূপে আকাদামী দুঃস্থ, দুর্গত, প্রবীণ সাহিত্যিকগণের ভার গ্রহণ করুন। যাঁহার সাহিত্যিক জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে, অথচ জীবিকার উপায় নাই তাঁহার ভার সরকার বা তাঁহার প্রতিনিধি গ্রহণ করিলে কালোচিত কার্য হইবে। কিন্তু রসসাহিত্যের ক্ষেত্রে পুরস্কার দান অন্যায় হস্তক্ষেপ। দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি বা অভিধান, ব্যাকরণের জন্য পুরস্কার দান সমর্থনযোগ্য, কেননা, এসব বস্তু বিচারের মাপকাঠি একেবারে দুর্লভ নয়, একটা objective standard খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব। কিন্তু সাহিত্যের গুণাগুণ প্রায় অনির্বচনীয়, বড় বড় আলঙ্কারিকেরা তাহার তল পায় না—এমন আকাশকুসুম চয়ন করিবার ভার সরকার লইলে আর কিছু

না হোক হাস্যকর হইবার আশঙ্কা। সরকারের পক্ষে সে আশঙ্কা মর্যাদানাশক। কিন্তু কেবল ঐ আশঙ্কাটাই নয়—এর চেয়েও গুরুতর আশঙ্কা আছে। সরকারেব অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপে সাহিত্যের "খোলা বাজার" নষ্ট হইয়া সাহিত্যেব "চোরাবাজার" গড়িয়া উঠিতে পারে। সোভিয়েৎ মুল্লুকে এ আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। সেখানে সরকাব জানিত সাহিত্যিকেরই মানমর্যাদা, খ্যাতি-প্রতিপত্তি। আমি একথা বলিতে চাই না যে, সাহিত্য আকাদামীর সেরূপ অভিপ্রায় আছে। কিন্তু অভিপ্রায় যতই মহৎ হোক, নানা শ্রেণীব পুবস্কারদান, সরকার কর্তৃক পাইকারী হারে পুস্তক ক্রয় প্রভৃতি সদ্‌অভিপ্রায়প্রসূত হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যের স্বাধীনতা হবণ করিতেছে। স্বাধীন ভারতের সমাদৃত সাহিত্যিকের তুলনায় পবাধীন ভারতের উপেক্ষিত সাহিত্যিক অনেক বেশি স্বাধীন ছিল—ইতিহাসের ইহা এক নিষ্ঠুব বিড়ম্বনা।

আজকাব দিনে এদেশের সাহিত্যেব আশঙ্কা দু'তরফা। একদিকে সরকারের সদভিপ্রায়জনিত অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ, অন্যদিকে কম্যুনিজ্‌ম মতবাদেব দূরপ্রসাবী সুদক্ষ হস্তক্ষেপ। এ দুয়ের টানাটানি বাঁচাইয়া চলা একপ্রকাব অসম্ভব। যাহারা কৌশলী ও বিষয়দক্ষ তাহারা এ দুটিকেই তোষণ কবিয়া চলিতে পাবে কিন্তু সাধাবণ বুদ্ধির সাহিত্যিকগণ যে নিতান্ত অসহায়। হয় সবকারেব হাতে খাইতে হইবে, নয় জীবনব্যাপী সাত্ত্বিক একাদশীর বিধান। সাধারণ পাঠকের হাতে খাইতে আপত্তি কি? সাধাবণ পাঠকও যে এ দুই তরফ হইতে উৎকর্ষের ইঙ্গিত গ্রহণ করে, সবকার ভালো বলিল অতএব ভালো, অমুক দলের কাগজ বা ব্যক্তি ভালো বলিল অতএব ভালো—এই ধারায় সাধারণ পাঠক বিচার করিয়া থাকে। মাঝখান হইতে নিরীহ ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় সাহিত্যিকের অবস্থা দুঃসহ হইয়া উঠিল।

কাডিনাল রিশল্যুর সময়ে একাদামী প্রতিষ্ঠায় তেমন ক্ষতি হয় নাই, বিশেষ ফরাসী জাতিপ্রতিভা একাডেমী শাসনের অনুকূল। তখনকার দিনে রাষ্ট্রের বাঁধন আল্‌গা ছিল। সেই কেন্দ্রাতিগ শক্তির দিনে দু'চারটা বাঁধন কেন্দ্রাভিমুখে টানিয়া বাঁধিলে সমাজের সংহতি

বাড়িত। কিন্তু এখন কেন্দ্রাভিগ শক্তির দিন, রাষ্ট্রপ্রভাব এখন সর্বময় ও সর্বশক্তিমান। আগের দিনে চুক্তিরক্ষা ও শান্তিরক্ষা রাষ্ট্রের কাজ বলিয়া পরিগণিত হইত, এখন রাষ্ট্রের অঙ্গুলি ব্যক্তির মনে ও ব্যবহারের মধ্যে অনুপ্রবেশ কবিয়াছে। এহেন অবস্থায় কেন্দ্রাভিমুখী বাঁধন সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়। সাহিত্য আকাদামী সেই কেন্দ্রাভিগ বাঁধন। এখন আবশ্যক কেন্দ্রাতিগ শক্তির, রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী বন্ধন হইতে মুক্তিব, মানসিক স্বাধীনতার। সাহিত্য আকাদামী ঠিক সেই প্রয়োজনের পবিপোষক নয়। একযুগোচিত প্রতিষ্ঠান অন্য যুগের পক্ষে ভার।

মোটের উপরে কথা এই যে, সাহিত্য আকাদামীর কিছু কার্যকারিতাব ক্ষেত্র আছে, সাহিত্যের উপকার করিবার শক্তিরও অভাব নাই। কিন্তু তাহা "to set high literary standards" প্রচেষ্টা নয়। এখনকার সমাজ এমন বিপুল, তাহার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব এমন জটিল যে, কোন ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের সাধ্য নয় এই জনসমুদ্রে সাহিত্যেব উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে। দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের যুগে, যখন নিত্য নব নব জনখণ্ড পাঠক সম্প্রদায়ভুক্ত হইতেছে, বেতার, সুলভ মুদ্রণ ও সংবাদপত্রাদির বহুল ব্যাপ্তির যুগে সাহিত্যমানের অবনমন অবশ্যম্ভাবী। পাঠকসমাজের ব্যাপ্তি সাধন ও সাহিত্যেব উচ্চাদর্শ রক্ষা একসঙ্গে চলিবে এমন আকাঙ্ক্ষা সম্ভব নয়। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পুনরায় লোকসাহিত্যে পরিণত হইবার প্রবণতা দেখাইতেছে। এ প্রগতি রোধ সাহিত্য আকাদামীর পক্ষে অসম্ভব। আবার রসসাহিত্যে পুরস্কারদানকেও আকাদামীর কর্তব্য বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহার ফলে সাহিত্যিকের রাষ্ট্রমুখাপেক্ষী ও সাহিত্যের প্রচারসাহিত্য হইয়া উঠিবার আশঙ্কা। কাজেই এহেন পণ্ডশ্রম হইতে বিরত হইয়া অন্যত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে আকাদামীর শক্তির সদ্ব্যয় হইবে। আর সেরূপ ক্ষেত্রেরও যে অভাব নাই, সে বিষয়ে আকাদামীও যে সচেতন তাহা তাহার সংবিধান হইতেই জানা যাইবে।

আকাদামীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তাহার সংবিধানে যে-সব কার্যক্রমের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে নিম্নোক্তগুলি বিশেষ প্রশংসনীয়। বিধানের অন্তর্গত 'খ' উপবিধানভুক্ত প্রশংসাযোগ্য কয়েকটি ধারার উল্লেখ করিতেছি।

(1) to promote co-operation among men of letters for the development of Literature in Indian languages;

(2) to encourage or to arrange translations of literary works from one Indian language into others and also from non-Indian into Indian languages and vice-versa;

(3) to publish or to assist associations and individuals in publishing literary works, including bibliographies, dictionaries, encyclopae-dias, basic vocabularies etc., in the various Indian languages;

(4) to sponsor or to hold literary conferences, seminers and exhibitions on all India or a regional basis;

(5) to promote research in Indian language and literature;

(6) to promote the teaching and study of regional languages and literatures in areas beyond their own;

(7) to encourage propagation and study of literature among the masses;

সংবিধানের এই কয়টি উদ্দেশ্য আমার মতে বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা ও পরিচয় সাধন, ভারতীয় সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যকে ঘনিষ্ঠতর করিয়া তোলা—প্রধানত ইহাই আকাদামীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আর সেই সঙ্গে এতাবদ্‌কাল এদেশে ও বিদেশে যে উচ্চাঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে

তাহার আদর্শ এমনভাবে ধারণ করিয়া রাখা যাহাতে মানুষের মন হইতে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লোপ না পায়। এযুগের অন্ধ-বিশ্বাসী, অর্ধবিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী মন রাজনীতির ঘামে-ভেজা ন্যাকড়া দিয়া সাহিত্য ও শিল্পের উচ্চাদর্শকে মুছিয়া দিতে উদ্যত। এই বর্বরোচিত কার্যকে রোধ করিতে না পারিলে মানুষের মন তমসাচ্ছন্ন যুগে গিয়া পড়িবে। সাহিত্য আকাদামী সে ভার লইতে পারেন, তাহার সংবিধান পড়িয়া মনে হইল, একাজে উদ্যতও বটে। এটি মহৎ কার্য। মহৎ কার্যে অসাফল্যও মহৎ। কিন্তু অসাফল্যের প্রশ্ন ওঠে না, যেহেতু একাজে সাহিত্য হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেরই সমর্থন ও শুভেচ্ছা লাভ করিবেন সাহিত্য আকাদামী।

বার্ণার্ড শ

শ জীবিত নাই—এ ব্যাপাব এখনো পুরোপুরি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যিনি দীর্ঘজীবিতায় রেকর্ড ভঙ্গ কবিয়াছেন, আর শুধু তা-ই নয়, শেষ পর্যন্ত দেহে মনে প্রাণে সজীব ছিলেন, তাঁহারও মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাঁহার মতো লোকেরও মৃত্যু ঘটে—এ যেন বিশ্বাসাতীত ঘটনা। আরও অবিশ্বাস্য এই কারণে যে, শ-ব মনটা পরিপূর্ণ সজীব ও সক্রিয় ছিল, যাহা কিছু জীর্ণতা ঐ দেহের। অন্যান্য জীবের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ এই যে, মানুষেব মন বালয়া একটা পদার্থ আছে। সেই পদার্থ যাহার মধ্যে উজ্জ্বল, তাহাকে যেন অবিনশ্বর বলিয়াই বোধ হয়। কাজেই শ-র মৃত্যু তথ্যগত সত্য হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত সত্য মনে হইতেছে না।

আরও একটা হেতু আছে। এ যুগে চারিজন মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, শ আর আইনস্টাইন। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী আগেই গিয়াছেন, এখন শ গেলেন, বাকি রহিলেন আইনস্টাইন। ইঁহাবা চারজনে মানুষের ভাবজগতে যে-রূপান্তর ঘটাইয়াছেন এমন সচরাচর ঘটে না। এমন কতদিন পরে ঘটিল! ইঁহাদের অব্যবহিত পূর্বসূরি কাহারা? গ্যেটের পরে রবীন্দ্রনাথ, মাঝখানে ইঁহাদেব অনুরূপ জন্মগ্রহণ করে নাই। গান্ধীর পূর্বসূরী কে? বুদ্ধ না অশোক না একাধারে বুদ্ধাশোক! শ-র পূর্বসূরী নিঃসন্দেহে ভল্টেয়ার। আর নিউটনকে আইনস্টাইনের পূর্বসূরী বলিলে অন্যায় হইবে না।

দেখা যাইতেছে যে, শ কেবল সাহিত্য-রথীমাত্র নহেন, যুগোত্তর

মহাপুরুষ। এমন লোককে হারাইয়াছি নিশ্চয় জানিয়াও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে মানুষের মন সরে না। তা ছাড়া নিছক দীর্ঘকাল স্থায়ীতারও একটা দাবি আছে মানুষের মনের উপরে। দরজার সামনে যে মহীরুহ প্রপিতামহের আমল হইতে রহিয়াছে, তাহাকে সরাইতে কি মন চায়? না, সরাইলে মন বিশ্বাস কবিতে চায়? শ-তো আমাদের প্রপিতামহের আমলেরই লোক বটেন। ১৮৫৬ সালের ক'জন লোক আজ জীবিত আছে? ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের সময়ে আমার বয়স ১৪ বছর ছিল একথা আজ কে বলিতে পারে? শ ইচ্ছা করিলে ডিকেন্সকে দেখিতে পারিতেন। সে তুলনায় ম্যাথু আর্নল্ড, ব্রাউনিং, টেনিসন তো আরও অনেক কাছে।

শ-র বক্তৃতা যখন লণ্ডনেব অধিবাসীদের আনন্দ দিতে আরম্ভ করিয়াছে—সে আজ কতদিনেব কথা! Arms and the Man যখন নাট্যামোদিদের চকিত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে—সেও তো কোন্ যুগেব কথা! তারপরে কত যুদ্ধ, কত বিপ্লব, কত যুগান্তর ঘটিয়াছে। পৃথিবীব রাজনৈতিক মানচিত্র কতবাব ওলটপালট হইয়া গিয়াছে—এ সমস্ত পবিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তিত, আলোড়িত ঘটনা তরঙ্গের মধ্যে অটল, অপরাজেয় আত্মার আলোকস্তম্ভেব ন্যায় শ দণ্ডায়মান ছিলেন। সেই শ নাই—ইহা কি সহজে বিশ্বাস হয। এরপরে হয়তো শুনিতে হইবে যে, হিমালয পর্বতের কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গটাও লোপ পাইয়াছে!

শ-ব আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব ও নৈতিক অমিততেজের রহস্য কোথায়? কোন্ শক্তির বলে তিনি একদিকে জরাব আক্রমণ, অপরদিকে সংসারের শতরকম লোভ ও সংস্কারকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? সে শক্তি আব কিছুই নহে, মুক্ত ও স্বাধীন মনের যথেচ্ছ বিহার। এমন স্বাধীন ও সংস্কারহীন মন লইয়া ক'জন জন্মগ্রহণ করে—আর করিলেও বা ক'জন শেষ পর্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ বাখিতে, পারে?

শ দুই-ই পারিয়াছিলেন। সংস্কারহীন মন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া সংস্কারহীনভাবেই তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। শ-র এই বিজয়ে

মানুষেরই জয় ঘোষিত হইল। বুঝিতে পারা গেল যে, মানুষে এমন সম্ভব, সত্যই যাহা হাঁসের পাখার মতো, জলে থাকিয়াও জলের চিহ্ন তাহাতে পড়ে না।

এমন একটা মুক্ত মনের তিরোধান চিরকালই দুঃখের, কিন্তু আজকার জগতে তাঁহার তিরোধানের দুঃখ ও ক্ষতি সবচেয়ে দুর্বহ। মানুষের মনকে চারিদিক হইতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিবার, রাজনৈতিক পাঠশালার দাগাবুলানো পোড়ো করিয়া তুলিবার—আজ যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, মানুষের ইতিহাসে তাহার অনুরূপ নজির একান্ত বিরল, নাই বলাই সঙ্গত। সেই সময়ে একটা মুক্ত মনের নির্বাপণ মানুষের রঙ্গমঞ্চকে অনেক বেশি অন্ধকার করিয়া দিল!

'একে একে নিভিছে দেউটি' বলিয়া কবি ক্ষোভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজকার ক্ষোভ অন্যশ্রেণীর। এখনো এখানে ওখানে দু'একটি দেউটি যে প্রজ্বলিত তাহাই রাজনৈতিক বাতিনেভানোঅলাদের ক্ষোভের কারণ। সব নিভিয়া যাক—চারদিক অন্ধকার হোক, শঠ, সিঁধেল ও শয়তানের তবে তো সত্যযুগ। এহেন অবস্থায় শ-র মৃত্যু সামগ্রিক মানুষের মানসিক মৃত্যুকে অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিল! তাই শ-র মৃত্যু শোকের ঘটনার চেয়েও অধিক—ভয়ের ঘটনা।

২

শ আর যাই হোক অবিনয়ী ছিলেন না। নিজের সাহিত্যিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একদা তিনি বলিয়াছিলেন যে, প্রথম কুড়িজন প্রধান ইংরাজ লেখকের মধ্যে তাঁহার স্থান হইবে। ইহা নিঃসন্দেহ অতি-বিনয়। নাট্যকার হিসাবে শ-র স্থান শেক্সপীয়রের ঠিক নীচেই। শ ছাড়া সে স্থান আর কাহাকে দেওয়া যায়? অন্যান্য নাট্যকারের এমন অনেক গুণ আছে শ-র যাহা নাই। কিন্তু মোটের উপরে শ-র সমগ্র নাটকে যে-প্রতিভা, যে কলাকৌশল, যে বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পাইয়াছে, সমগ্র মানব জীবনের ও চিন্তাজগতের যে সুবৃহৎ অংশকে প্রকাশ করা হইয়াছে, যে বিচিত্র নরনারী চরিত্র সৃষ্টি করা হইয়াছে—এমন আর

কোথায়? শেক্সপীরীয় সাহিত্যের বাহিরে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। এ সত্যটি এখনো সকলে বুঝিয়া উঠিতে যে সক্ষম হন নাই তাহার প্রধান কারণ শ-র প্রতিভার মধ্যেই নিহিত। যা গৌণ, যা সাময়িক, যা অবান্তর, যা সময় বিশেষের মাত্র লক্ষণ সেই সব উপাদান শ-র নাট্যগুলিতে প্রচুর—একদিকে এইসব বস্তু তাঁহাকে যেমন বর্তমান যুগের প্রিয় ও উপাস্য করিয়া তুলিয়াছে, অন্যদিকে এই-গুলিই তাঁহার চিরকালীন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। প্রত্যেক নাট্যকারের রচনাতেই সাময়িক উপাদান থাকে, শেক্সপীয়রের নাটকেও আছে, সেই সব উপাদানই শেক্সপীয়রকে সে যুগের জনপ্রিয়তম নাট্যকার করিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগের চোখে সে-সমস্তর কি মূল্য? সেইসব সাময়িক উপাদানের গুরুত্ব বিস্মৃত হইবার পরেই শেক্সপীয়র চিরসময়ের পরিপ্রেক্ষিতে লোকোত্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। শ-র প্রতিষ্ঠালাভের জন্যও সেইরকম একটি বিস্মৃত অন্তরালের আবশ্যক। প্রত্যেক প্রধান লেখকের পক্ষেই উহা অত্যাবশ্যক—শ-র পক্ষে তো একেবারেই অপরিহার্য। তার কারণ, শ অনেক নাটকে সাময়িক উপাদানের উপরে অতিমাত্রায় নির্ভর করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস যে-সব নাটক তাঁহাকে বিশেষভাবে এ-যুগের উপাস্য দেবতায় পরিণত করিয়াছে—সেইগুলিই সবচেয়ে স্বল্পায়ু। যে-সব নাটকে তিনি দূরবর্তী যুগের ঘটনাকে, নরনারীকে চিত্রিত করিয়াছেন, সমসাময়িক সমস্যার ঘোড়দৌড় করিবার ও অসিক্রীড়ার সুযোগ পান নাই—শেষ পর্যন্ত সেইগুলিই তাঁহাকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠাদান করিবে—এবং সে প্রতিষ্ঠা ঠিক শেক্সপীয়রের আসনের নীচেই।

সিজার এণ্ড ক্লিওপেট্রা, এণ্ড্রোক্লিস এণ্ড দি লায়ন, ডেভিলস্ ডিসাইপ্ল, সেণ্ট জোন প্রভৃতি দূরকালে সংঘটিত ঘটনার নাট্যরূপের ওপরেই শ-র প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিবে। ম্যান এণ্ড সুপারম্যান নাটক-খানিই তাঁহাকে সর্বপ্রথমে চিন্তাবীররূপে প্রখ্যাত করিয়াছিল। শ-র জীবনতত্ত্ব উহাতে পূর্ণ আকারে প্রকাশিত। কিন্তু পরবর্তী যুগ নাটক-খানিকে তেমন খাতির করিবে মনে হয় না। মানুষের জীবনধারার

পরিবর্ত্তনের সঙ্গে শ-র জীবনতত্ত্বের মূল্যও কমিয়া আসিবে। কিন্তু পূর্বোক্ত নাটকগুলির মহিমা কমিবে কেন? তাহারা তো শ-র সমসাময়িক নহে; চিরকালের পট হইতে যাহারা গৃহীত, চিরকালের পটে তাহারা উজ্জ্বলতরভাবে বিরাজ করিতে থাকিবে। শিল্পী ও তাত্ত্বিকের সংমিশ্রণে শ-র সাহিত্যিক প্রতিভা গঠিত। তাত্ত্বিক শ-ই এ যুগের প্রিয়—কিন্তু পরবর্তীকাল পূর্বকালের তত্ত্বকে তেমন সমীহ করে না। তাত্ত্বিক শ-র গুরুত্ব হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী শ-র সমাদর ও প্রতিষ্ঠা বাড়িতে থাকিবে।

শ অবশ্য বলিয়াছেন যে, তত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যেই তিনি কলম ধরিয়াছেন, শিল্পের জন্য তাঁহার মাথাব্যথা নাই। পরবর্তী যুগ ঐ কথাটাকে উল্টাইয়া বলিবে যে, পূর্বযুগের বাতিল তত্ত্বের জন্য তাহার শিরঃপীড়া নাই—মানুষের কলম হইতে মানুষের ছবি দেখিতেই তাহার ঔৎসুক্য। শ-র সাময়িক নাটকগুলির অধিকাংশই এবং অধিকাংশ নরনারীই তত্ত্বরূপের বেশি নয়। তাঁহার দূরকালের নাটক-গুলি এ বিষয়ে স্বতন্ত্র এবং তাহারাই শ-র চিরকালের বান্ধব।

শিল্পীতে ও তাত্ত্বিকে শ-র মধ্যে যেমন একটা দ্বন্দ্ব ছিল, তেমনি আর একটা দ্বন্দ্ব ছিল নাট্যকারে ও বিদূষকে। শ নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে, অসময়ে অস্থানে বিদ্রূপ পরিহাস, রঙ্গ-রসিকতা করিবার লোভ তিনি সম্বরণ করিতে পারেন না। বিষাদের মুহূর্তে তাঁহার নরনারী পরিহাস করিয়া বসে, প্রণয়ের গভীর লগ্নে চটুল চপল হাসি আসিয়া সমস্ত ব্যাপারটাকে অবিশ্বাস্য করিয়া দেয়—শ বলেন যে, এইজন্যই তিনি অমরত্ব লাভ করিতে পারিবেন না। আবার অতি বিনয়। শ-র অভিযোগ সত্য। কিন্তু এইসব কার্যকারণের ক্ষেত্রগুলি ঝরিয়া পড়িয়া গেলেও এমন স্থায়ী অংশ সুপ্রচুর থাকিবে যাহার উপরে শ অনায়াসে নির্ভর করিতে পারেন। আর যুগাত্যয়ের পরে এইসব স্মৃতিবিস্মৃতির শিল্পতত্ত্বের, হেরফের কাটিয়া গেলে দেখা যাইবে যে, ইংরেজী সাহিত্য-সৌধে শেক্সপীয়রের ঠিক নীচের সোপানটিতেই শ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ম্যাথু আর্নল্ড কীটস্ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে,

'He is, he is with Shakespeare!' কীট্‌সের সহিত শ-র আমূল পার্থক্য সত্ত্বেও ঐ উক্তি যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, 'He is, he is with Shakespeare!' প্রধান কুড়িজনের সঙ্গে নয়, সর্বশ্রেষ্ঠের সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্য স্বর্গে তাঁহার আসন নির্দিষ্ট হইয়া আছে।

শ-র প্রিয়তম শত্রু ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস অবশ্য বলিয়াছেন যে, পরবর্তী যুগ শ-কে সাহিত্যিক হিসাবে মনে রাখিবে না, মনে রাখিবে ডাঃ জনসন ও ভল্টেয়ারের মতো বিচিত্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ রূপে।

ডাঃ জনসনেব সঙ্গে শ-র ঐক্য এতই সূক্ষ্ম ও স্বল্প যে একথা কেবল ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিসের মনেই আসা সম্ভব। কিন্তু ভল্টেয়ারের সঙ্গে তুলনায় কিছু সত্য আছে মনে হয়—কেন না, কথাটা অনেকেরই মনে উঠিয়াছে।

ভল্টেয়ার এককালে সাহিত্যাধিরাজ ছিলেন—এখন তিনি ব্যক্তি-রূপে মাত্র পবিজ্ঞাত। ভল্টেয়ারের রচনা (Candide ও অন্যান্য ছোট গল্প ছাড়া) আজ কে পড়ে? তাঁহার নাটক ও তথাকথিত মহাকাব্য সম্পূর্ণ বিস্মৃত। কিন্তু ঐ লোকটির রচনা যতই অতলে তলাইতেছে ব্যক্তিত্ব ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে আর এত দূরে অবস্থিত হইয়াও বিংশ শতাব্দী তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড ধাক্কা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছে। শ-র মতোই সমসাময়িক উপাদানের উপরে ভল্টেয়ার অতিমাত্রায় নির্ভব করিয়াছিলেন। সেখানেই তাঁহার সাময়িক প্রখ্যাতি। যাহা নিতান্তই সাময়িক, সময়ের সঙ্গে তাহা গিয়াছে—অবশিষ্ট আছে ভল্টেয়াবের বিচিত্র ব্যক্তিত্ব। যাহার কিছুটা অনুরূপ শ-র ব্যক্তিত্ব বটে। তবে আবার প্রভেদও আছে।

শ-র জীবনীকার হেণ্ডারসন শ-কে পূর্ণতর, বিশুদ্ধতর ভল্টেয়াররূপে অভিহিত করিয়াছেন—অভিধাটি মিথ্যা নহে। কালক্রমে ভল্টেয়ারের ব্যক্তিত্বই যেন পূর্ণতর হইয়া, বিশুদ্ধতর হইয়া, চারিত্র্যে ও আদর্শবাদে উজ্জ্বলতর হইয়া দেখা দিয়াছে। উভয়েরই প্রধান লক্ষ্য শত্রুব্যূহ ভেদ! ভল্টেয়ারের প্রধান শত্রু—ধর্মান্ধতা! শ-র প্রধান শত্রু—ক্যাপিট্যালিজম্! উভয়ের প্রধান অস্ত্র রঙ্গ ব্যঙ্গ, wit ও বিদ্রূপ। উভয়ের বাহন অননু-করণীয় গদ্য। ভল্টেয়ারের গদ্য ফরাসী গদ্যের আদর্শ! শ-র গদ্যকেও

ইংরেজী গদ্যের আদর্শ বলা যাইতে পারে! ভল্টেয়ার চরিত্রের দোষগুলি হইতে শ মুক্ত, ভল্টেয়ার চরিত্রের গুণগুলি শ চরিত্রে বর্তমান, কেহ বলিবেন যে মাত্রায় বিরাজমান এই পর্যন্ত। কিন্তু দু'য়ের মিল সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। আরও এক বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ভল্টেয়ারের পরে আর কোন সাহিত্যিক্যের প্রভাব জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমনভাবে অনুভূত হয় নাই। সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ, বিজ্ঞান, যুদ্ধ, সন্ধিবিগ্রহ সর্বত্র উভয়ের প্রভাব সক্রিয়। এ বিষয়ে তাঁহাবা যেন Totalitarian নায়ক!

শ-র Life Force তত্ত্ব স্বীকার করিলে মনে হয় Life Force-ই যেন কালক্রমে ভল্টেয়ারকে পূর্ণতর করিয়া শ-রূপে প্রেরণ করিয়াছিল। তাহা হইলে আরও স্বীকার করিতে হয় যে, এখানেই শেষ নয়, আবার কালক্রমে শ আরও পূর্ণতর মূর্তিতে জন্মগ্রহণ করিবেন। কতদিন পরে বলা কঠিন, কারণ শ ভল্টেয়ার, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিকে গড়িয়া তুলিতে স্বয়ং প্রকৃতির বা Life Force-এরও ২-৩ শতাব্দী সময় লাগে। প্রকৃতি বা Life Force সর্বক্ষম নয়।

শ-র মতে জগতে কেহই বা কিছুই পূর্ণ নহে। মানুষ অপূর্ণ, প্রকৃতি অপূর্ণ, জগৎ অপূর্ণ, Life Force অপূর্ণ, খোদ ভগবান অবধি অপূর্ণ। কিন্তু সকলেই নিরন্তর পূর্ণতর হইবার চেষ্টা করিতেছে। সেই অসম্পূর্ণ চেষ্টারই প্রকাশ মানব ও প্রকৃতি, সেই অসম্পূর্ণ চেষ্টারই একটা প্রকাশ ভল্টেয়ার, তাহারই কথঞ্চিৎ পূর্ণতর প্রকাশ শ। আরও পূর্ণতরের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু কতদিন? শ-র জোন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

"O God that madest this beautiful earth, when will it be ready to receive Thy Saints? How long, O Lord, how long?"

পূর্ণতর শ অর্থাৎ পূর্ণতর মানুষের নিরুদ্দিষ্ট আবির্ভাবের প্রত্যাশায় ঐ কথা বলা ছাড়া আর কি উপায় আছে—

"How long; O Lord! how long?" আর কতকাল, হে বিধাতা; আর কতকাল?

গ্যেটে ও অর্বাচীন কালের সাহিত্য

প্রাচীন সাহিত্যের সহিত অর্বাচীন কালের সাহিত্যের একটি প্রকৃতি-গত প্রভেদ আছে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু কোথায় সে প্রভেদটা, কেন সেই প্রভেদ দেখা দিল বুঝিয়া ওঠা সহজ নহে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অনুভব করিতে থাকে যে দুইয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা পার্থক্য বিদ্যমান। স্বদেশ হইতে বিদেশে আসিয়া পড়িলে আবহাওয়ার একটা পার্থক্য অনুভূত হইতে থাকে—এও অনেকটা সেই রকম। প্রাচীন সাহিত্যের আবহাওয়া অর্বাচীন সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু আবহাওয়া বলিতে অস্পষ্ট ও ব্যাপক একটা কিছু বোঝায়, নির্দিষ্ট কিছু বোঝায় না। নির্দিষ্টভাবে দুই সাহিত্যের প্রভেদ বোঝা এবং বোঝান নিরতিশয় কঠিন।

কালিদাসের শকুন্তলা আর গ্যেটের 'ফাউস্ট' দুইই মহৎ কাব্য, কিন্তু দুয়ের আবহাওয়া কি স্বতন্ত্র নয়? আবাব সোফোক্লিসের নাটক ও শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' দুইই মহৎ কাব্য, কিন্তু দুয়ের আবহাওয়া যে স্বতন্ত্র! আবার একদিকে কালিদাসের মেঘদূত কাব্য লওয়া যাক আর-একদিকে রবীন্দ্রনাথের যে কোন একটি দীর্ঘাকার কবিতা মনে করা যাক, মানস সুন্দরী দুইই মহৎ—কিন্তু দুটি কাব্যজগতের এক দেশের অধিবাসী নয়। এমন উদাহরণ আরও লওয়া যাইতে পারে কিন্তু বাহুল্যে প্রয়োজন নাই।

উপরের উদাহরণগুলিতে যে পার্থক্য অস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়, তাহাকে পূর্ণতার অভাব বলা যাইতে পারে। জানি পূর্ণতার অভাব বলিতে স্পষ্ট কিছু বোঝায় না, কিন্তু যেখানে মূল প্রভেদটাই অস্পষ্ট,

সেখানে তাহার সংজ্ঞা অস্পষ্ট না হওয়াই অস্বাভাবিক। প্রাচীন সাহিত্যের প্রধান গুণ পূর্ণতা, বা নিখুঁত ভাব। অর্বাচীন সাহিত্যে তাহারই অভাব অনুভব করি।

প্রাচীন কালের মহাকবিগণের রচনায় বা মহাকাব্যে এই পূর্ণতার ভাব বিদ্যমান এমন নয়, অতি অকিঞ্চিৎকর রচনাতেও এমন একটি নিখুঁত নিটোলতা আছে যাহা অর্বাচীন কালের সাহিত্যে নিতান্ত বিরল।

'রেবা রোধসি বেতসতরুতলে
চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে মে'

বা স্যাফোর সেই বিখ্যাত অনায়ত্ত আপেল সম্বন্ধীয় কবিতায় প্রকৃতি-দত্ত পূর্ণতা দেখা যায়, অর্বাচীন কালের মহাকবিগণের কাব্যেও তাহা সহজপ্রাপ্য নয়।

পূর্ণতা ও পূর্ণতার অভাব এই দুই ভিন্নকালের সাহিত্যে এতই স্বাভাবিক, প্রাচীনকালের সাধারণ কবির রচনাতেও এমন দুর্লভ যে —এ দুটি লক্ষণকে ভিন্নকালের কবিদের প্রতিভার লক্ষণ না বলিয়া দুই ভিন্ন কালেরই লক্ষণ বলিতে ইচ্ছা করে। বস্তুতঃ প্রাচীন কালের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক পূর্ণতার ভাব ছিল অর্বাচীন কালে যাহা বিরল হইয়া পড়িয়াছে। আর এই দুই কালের কাব্যে এই দুই ভিন্ন লক্ষণ যেন স্বতঃই সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রাচীন ও অর্বাচীন কালের সীমা-রেখাটা কোথায়? কালের পরিবর্তন সূক্ষ্ম সীমানা মানে না, স্থূল-ভাবেই তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। আমার বিশ্বাস দান্তেকে এবং তাঁহার মহাকাব্যকে দুই কালের সীমান্তে ফেলা যাইতে পারে। 'ডিভাইন কমেডি'তে প্রাচীন ও অর্বাচীন কালের ভিন্ন লক্ষণ বর্তমান। কাব্যখানি অর্বাচীন কালের অনুগত প্রাকৃত ভাষায় লিখিত, যদিচ দান্তে গোড়ার দিকের আটটি সর্গ প্রথমে লাটিন ভাষাতেই লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভাষান্তর অর্বাচীন কালের উপক্রমণিকা। ডিভাইন কমেডির নিখুঁত পূর্ণতা প্রাচীন কালের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

অন্যদিকে অর্বাচীন কালের কাব্যের প্রধান লক্ষণটিও বর্তমান, 'ডিভাইন কমেডি'তে দান্তেকে পাই, কেবল কবিরূপে নয় কাব্যের নায়করূপে। প্রাচীন কালের কাব্যে এমন কখনই ঘটিতে পারিত না। প্রাচীন কালের কাব্যে আর সকলকেই পাই কবিকে ছাড়া, অর্বাচীন কালের কাব্যে আর কাউকে পাই বা না পাই কবিকে পাইবই। কবিকে কাব্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া দান্তে অর্বাচীন কালের ও অর্বাচীন কালের কাব্যের সূচনা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু অর্বাচীন কালের সঙ্গে তবু একটু প্রভেদ দেখা যায়। দান্তে নিজেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন, কবি দান্তে ও কাব্যের নায়ক-দান্তে যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। অর্বাচীনতর কালের কবিদের হাতে এমন সংযত আত্ম অস্বীকৃতি পাওয়ার আশা নাই।

আগে বলিয়াছি যে, অর্বাচীন কালের সাহিত্যে অপূর্ণতার ভাব বিদ্যমান, আবার এখন বলিলাম যে এই কালের সাহিত্যে কবির ব্যক্তিত্ব অনুস্যূত। এবারে বিচার করা আবশ্যক—এ দুয়ের মধ্যে কোন সূক্ষ্ম সম্পর্ক আছে কি না। এখানে গ্যেটের কাব্য আমাদের প্রধান সহায়, কারণ তাঁহার কাব্যে অর্বাচীন কালের বলিয়া কথিত এই দুটি লক্ষণই পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। গ্যেটের গদ্য ও পদ্য রচনা স্বকীয় মহত্ত্ব সত্ত্বেও (হারমান এণ্ড ডরোথিয়া এবং ছোট ছোট লিরিকগুলি ছাড়া) পূর্ণতার অভাবে যেন বিশিষ্ট ; আবার তাঁহার সমস্ত রচনাই গ্যেটের ব্যক্তিত্বের দ্বারা আবিষ্ট। যে দুটি লক্ষণকে অর্বাচীনকালের বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়াছি—গ্যেটের কাব্যে তাহাদের প্রকাশ আত্যন্তিক। এ বিষয়ে গ্যেটের রচনা অর্বাচীন সাহিত্যের সবচেয়ে বড় শিক্ষার ও দৃষ্টান্তস্থল ; গ্যেটে অর্বাচীন সাহিত্যের চরম দৃষ্টান্ত।

২

অর্বাচীন কালের কবিগণ জগতের মানদণ্ড হিসাবে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে গ্রহণ করিয়াছেন। কিংবা এই ধারণাটাকে আর-এক

আকারে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। জগৎ-পরিধি মাপিবার সূত্ররূপে তাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে ব্যবহার করিয়াছেন। এখানেই প্রাচীন কালের ও অর্বাচীন কালের কবিগণের মধ্যে প্রধান প্রভেদ। প্রাচীন কালের কবিগণের জগৎপরিধি পরিমাপের সূত্র ছিল দৈববিধান। কোনটা সত্য, কোনটা সত্য নয় তাহার নিকষ ছিল দৈববিধান। অর্বাচীন কালের হাতে একমাত্র নিকষ আপন ব্যক্তিত্ব। প্রাচীন কালের সাহিত্যে যে পূর্ণতা দেখা যায়, আধুনিক কালের সাহিত্যে যে অপূর্ণতা দেখা যায়—এবারে তাহার হেতু বুঝিতে পারা যাইবে। ব্যক্তিত্ব যত বিশালই হোক না কেন জগৎপরিধি পরিমাপের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়, সুতা খাটো হইবেই, আর যে পরিমাণ খাটো হইবে, সেই পরিমাণে জগদংশ কবির অনায়ত্ত থাকিয়া যাইবেই—ইহাই অপূর্ণতাব মূল কারণ। খণ্ড জীবনকে অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিতে বাধা নাই, কিন্তু খণ্ডতার মধ্যেও পূর্ণতার আভাস স্থাপন কবিতে হইবে। কিন্তু পূর্ণতার রূপ যদি কবির অপরিচিত হয়, তবে কিরূপে সে পূর্ণতাব আভাস দান করিতে সমর্থ? অর্বাচীন কালেব খণ্ডকাব্য নিতান্তই খণ্ড, শুক্ল তৃতীয়ার চন্দ্রকলার উজ্জ্বলতা যেমন সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলকে আভাসে প্রকাশ করে, অর্বাচীন কালের খণ্ডকাব্য তেমন করিয়া আভাসে পূর্ণতাকে দেখাইতে অসমর্থ; এই অসামর্থ্যেরই অপর নাম অপূর্ণতা।

প্রাচীন কালের কবিগণ নিজেদের ব্যক্তিত্বকে বিশ্বাস করিতেন না, তাঁহাবা দৈববিধানে রূপ সূত্র হাতে জগৎপরিধি পরিমাপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দৈববিধান ব্যক্তিত্বের চেয়ে অনেক প্রশস্ততর, বাস্তবিক তার চেয়ে আর কিছু বড় কল্পনা করা যায় না। এই কারণেই প্রাচীন কালের কবিরা জগৎপরিধি পরিমাপে সমর্থ ছিলেন—তাঁহাদেব কাব্যের পূর্ণতার ইহাই প্রকৃত কারণ। এই জন্যই প্রাচীন কালের অধিকাংশ কাব্যের নায়ক দেবতা যেখানে প্রত্যক্ষত নায়ক নহে, সেখানেও তাঁহারা অন্যতম প্রধান পাত্রপাত্রী। অর্বাচীন কালের কাব্যের নায়ক মানুষ। আধুনিক কালে মানুষ মর্ত্য হইতে দেবগণকে নির্বাসিত করিয়াছে।

দুই কালের মধ্যে আরও একটু প্রভেদ আছে। ইতিমধ্যে জগৎ অনেক জটিল, অনেক বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। হোমার যে জগৎকে ও জীবনকে জানিতেন গ্যেটের জগৎ ও জীবন তাহার চেয়ে বৃহত্তর জটিলতর; দান্তে যে জগৎকে ও জীবনকে জানিতেন রবীন্দ্রনাথের জগৎ ও জীবন তাহার চেয়ে জটিলতর, বৃহত্তর; তাহাতে সূত্রের ন্যূনতা আরও বেশি ধরা পড়িয়াছে। হোমারের জগৎ-পরিমাপের পক্ষে কবির ব্যক্তিত্ব যদি অযথেষ্ট হয়, তবে গ্যেটের জগৎ- পরিমাপের পক্ষে তাহা আরও বেশি অযথেষ্ট। অথচ কবির হাতে তাহাকে পরিমাপের আর কোনো সূত্র নাই, ফলে অপূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী।

এই প্রসঙ্গে দুই কালের শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। দুই কালের শিল্পাদর্শে কিছু ভেদ ঘটিয়া গিয়াছে। অর্বাচীন কালের শিল্পের লক্ষ্য বা আদর্শ সৌন্দর্যসৃষ্টি; প্রাচীন কালের শিল্পের লক্ষ্য বা আদর্শ ছিল পূর্ণতা সৃষ্টি। প্রাচীনেরা পূর্ণরূপ সৃষ্টি করিতেন বলিয়া তাহা আপনিই সুন্দর হইত; অর্বাচীন কবিগণ পূর্ণতাকে অগ্রাহ্য করিয়া সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে চান বলিয়া তাহা সুন্দরও হইয়া ওঠে না। পূর্ণতাই সুন্দর, অপূর্ণতাই অসুন্দর; আবার পূর্ণতাই সত্য, কাজেই পূর্ণতা = সত্য = সুন্দর। অর্বাচীন কালের অনেক কবি তত্ত্বতঃ একথা জানেন, কিন্তু কার্যতঃ এই আদর্শকে অনুসরণ করিতে পারেন না, আবার অনেকেই এ কথাকে আদৌ স্বীকার করেন না। শেষোক্ত দল সাহিত্যে জগৎ-রীতিকে অনুকরণ করিয়া যান, ইহাই সাহিত্যে 'রিয়ালিজম্'; কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে চারিদিকে আপন অতিপ্রত্যক্ষতার দ্বারা 'রিয়াল' বলিয়া যাহা প্রতিভাত হয়—তাহাই একমাত্র 'রিয়ালিটি' না হইতেও পারে; বস্তুত তাহা রিয়ালিটির মুখোশ মাত্র। মুখোশটা রূপ, মুখোশ-খোলা মুখেই স্বরূপ; সে সংবাদ তাঁহারা রাখেনও না, রাখিতেও চান না।

তবেই তিনটি পর্যায় পাওয়া গেল। প্রাচীন কালের কবি, দৈববিধান যাঁহার জগৎ-পরিমাপ সূত্র; পূর্ণতা যাঁহার শিল্পের লক্ষ্য, তত্ত্বতঃ ও কার্যতঃ যিনি এই আদর্শকে অনুসরণ করেন। অর্বাচীন কালে

পাই দুইটি পর্যায়। ব্যক্তিত্বের বিধান যাঁহার জগৎ-পরিমাপ সূত্র; সৌন্দর্য সৃষ্টি যাঁহার শিল্পের লক্ষ্য; অথচ পূর্ণতার সংবাদও তাঁহারা রাখেন, কিন্তু যে-কারণেই হোক তাহাকে অনুসরণ করিতে অসমর্থ। তৃতীয় পর্যায়ে আছে সেই দল ব্যক্তিত্বের বিধান ছাড়া আর কিছুই যাঁহারা মানেন না, জানেন না; পূর্ণতাকেই যাঁহারা তত্ত্বতঃ ও কার্যতঃ অস্বীকার করেন; অতি-প্রত্যক্ষকে 'রিয়ালিটি' মনে করিয়া যাঁহারা তাহার মানচিত্র অঙ্কিত করিতে অভ্যস্ত। ইঁহাদের মানচিত্র অঙ্কনকারী বলাও উচিত নয়, যেহেতু মানচিত্রও সমগ্রতার সন্ধান দেয়—ইঁহারা সরস্বতীর আমিন, সম্মুখে যাহা পাইতেছেন জরিপ করিয়া যাইতেছেন, সে প্রচেষ্টা কোনো কালেই কোনো সমগ্রতায় পৌঁছিবে না, কারণ তাঁহাদের মনে সমগ্রতার আদর্শেরই যে অভাব। ইঁহারাই অর্বাচীনতম কালের 'রিয়ালিস্ট'।

৩

গ্যেটে দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। নিঃসন্দেহ তিনি অর্বাচীন কালের কবি, অর্বাচীন কালের কাব্যের লক্ষণ অপূর্ণতা তাঁহার কাব্যের প্রধান গুণ ও দোষ। কবি গ্যেটে, বৈজ্ঞানিক গ্যেটে, রাজনীতিক ও রাষ্ট্রশাসক গ্যেটে জানেন যে জগৎ কী বৃহৎ, জীবন কী জটিল। এ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের পরিধি তাঁহার সমকালীন অধিকাংশ লোকের চেয়ে অনেক অধিক। এ হেন জগৎ-জীবনের পরিমাপে তিনি উদ্যত, কিন্তু বিষম সঙ্কট এই যে একমাত্র ব্যক্তিত্বের সূত্র ছাড়া অপর কোন সূত্র তাঁহার হাতে নাই।

ফাউস্ট কাব্যের কথাই ধরা যাক। ফাউস্ট অবশ্য মানব, কিন্তু মেফিস্টোফিলিস মানুষ নয়, তাহা ছাড়া 'প্রোলোগ ইন হেভেন' অধ্যায়ে স্বয়ং লর্ড ও দেবদূতগণ আছে, নাটকের অন্তিমে দৈববাণী শ্রুত হইয়াছে; এরূপ অবস্থায় মনে করা অসম্ভব নয় যে দৈববিধানকেই এই নাটকের পরিমাপ সূত্ররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়, বরঞ্চ দৈববিধানের অনস্তিত্বই এই নাটকে সূচিত হইয়াছে। ফাউস্ট আপন ব্যক্তিত্বের দ্বারা জগৎ-পরিমাপে উদ্যত। জাদুমন্ত্রের প্রভাবে তাহার

জগৎ যত বাড়িয়াছে, নিজের ব্যক্তিত্ব-সূত্রকে তত সে টানিয়া বাড়াইয়া লইয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিত্বের দ্বারা জগৎটাকে বেড় দিতে পারে নাই। এই প্রচেষ্টায় মেফিস্টো তাহাকে উস্কানি দিয়াছে; বলিয়াছে, তোমার ব্যক্তিত্বকে আরও বাড়াও, দেখো বেড় দিতে পারো কি না। 'লর্ডে'র সহিত রেষারেষি করিয়া সে ফাউস্টের কাঁধে আসিয়া ভর করিয়াছে, কিন্তু বস্তুত সে লর্ডের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কিছু করিয়াছে কি? মানুষ যে স্বয়ম্পূর্ণ নয়, 'লর্ড ইন হেভেন' এবং 'ম্যান অন আর্থ' —মিলিয়াই যে পূর্ণতা—ইহাই কি প্রকারান্তরে, ট্রাজেডির দ্বারা মেফিস্টো প্রমাণ করে নাই? ফাউস্টের ট্রাজেডি কি? জগৎ পরিমাপের পক্ষে মানুষের ব্যক্তিত্বই যথেষ্ট নয়—ইহাই কি তাহার ট্রাজেডি নয়? আমার তো মনে হয় গ্যেটে ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। তবে আবার গ্যেটেকে অর্বাচীন কালের কবি বলি কেন? বলি এই জন্য যে ব্যক্তিত্বের বিধান যে যথেষ্ট নয় তিনি জানিতেন, কিন্তু অপর কোন বিধান, দৈববিধান, তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। এখানেই কবির ট্রাজেডি, আর সে ট্রাজেডি ফাউস্টের চেয়েও গুরুতর। ফাউস্ট ব্যক্তিত্বের বিধানকেই যথেষ্ট ও একমাত্র বলিয়া জানিত। গ্যেটে জানিতেন, ইহা যথেষ্ট নয়; কিন্তু অপর কোনো বিধানও তাঁহার জানা ছিল না। কেন ছিল না সে অনেক কথা। যে-কালে তিনি জন্মিয়াছিলেন সে-কাল দৈববিধানের চূড়ান্ত মহিমায় বিশ্বাস করিত না। এখানে কালের ধর্ম গ্যেটের ধর্ম।

এই জন্যেই আগে গ্যেটের জীবন ও কাব্যকে অর্বাচীন কালের শিক্ষা ও সতর্কতার দৃষ্টান্ত বলিয়াছি। তিনি ব্যক্তিত্বের বিধানকে জানিতেন অথচ জানিতেন যে ইহা যথেষ্ট নয়; তিনি পূর্ণতার তত্ত্ব জানিতেন অথচ সৌন্দর্য সৃষ্টিকে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সত্যের সংবাদ রাখিতেন অথচ বিপুলা পৃথ্বীর সমস্ত তথ্যকে কুড়াইয়া লইয়া সত্যের পূর্ণ মূর্তিতে উপনীত হইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তত্ত্বে ও কার্যে সমন্বয় করিতে না পারিলে যে পরম দুঃখ অনুভূত হয় সেই দুঃখ ছিল গ্যেটের জীবনের, আর সেই দুঃখের সমষ্টিই তাঁহার রচনা।

পরবর্তী কালের সাহিত্যের উপরে গ্যেটের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে, এখানে সে বিষয়ে কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল একটি কথার উল্লেখ করিলেই চলিবে।

সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেক যুগ এক একখানি মহাগ্রন্থে আপনার ধ্যানধারণা, আশাআকাঙ্ক্ষা ও সমস্ত সম্ভাবনাকে চূড়ান্তরূপ দিয়া থাকে। সে যুগের অন্য সমস্ত রচনা ঐ মহাগ্রন্থের খসড়া বই আব কিছু নয়। কিংবা শাখানদীসমূহ যেমন মূল নদীতে মিলিত হইয়া তাহাকে স্ফীতকায় কবিয়া তোলে প্রত্যেক যুগের মহাগ্রন্থের সহিত অন্যান্য গ্রন্থের সম্বন্ধ সেইরূপ। গ্রীক জগতের এইরূপ মহাগ্রন্থ হোমারের কাব্যদ্বয়। ইউরোপের খৃষ্টীয় মধ্যযুগেব মহাগ্রন্থ দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'। আমাদের দেশের প্রসঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত ও রামচবিত-মানসের উল্লেখ করা যাইতে পাবে।

পরবর্তীকালের পক্ষে গ্যেটের ফাউস্ট ঐরূপ একখানি মহাগ্রন্থ। 'ইলিয়াড' 'ওডিসি' ও 'ডিভাইন কমেডি'র সহিত তুলনায় 'ফাউস্ট' দীনতর ও অপূর্ণতর কিনা সে প্রসঙ্গ তুলিয়া লাভ নাই। আমাব বিশ্বাস, পূর্বোক্ত মহাগ্রন্থসমূহের তুলনায় ফাউস্ট নিশ্চয়ই দীনতর ও অপূর্ণতর। কিন্তু সে দীনতা ও অপূর্ণতার কারণ গ্যেটের যুগের মধ্যেই নিহিত, কেন নিহিত পূর্বে তার আলোচনা করিয়াছি। রেনেসাঁস বলিতে ইউরোপের ইতিহাসে যে মনোভাব ও যে পর্বকে বোঝায় গ্যেটের ফাউস্ট তাহারই মহাকাব্য। ফাউস্ট মানব-মনের চিরন্তন ও বৃহত্তর অতৃপ্তির মহাকাব্য। এই কাব্যের নায়ক ফাউস্ট অতৃপ্তির কূল হইতে তৃপ্তির কূলে, অপূর্ণতার জগৎ হইতে পূর্ণতার জগতে যাত্রা করিয়াছে। মাঝ-সমুদ্রে তাহার ভরাডুবি হইয়াছে কি হয় নাই, তাহার লক্ষ্য ভ্রান্ত কি শুদ্ধ সে প্রশ্ন অবান্তর। তৃপ্তি ও পূর্ণতাতে পৌছিবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাটাই এই কাব্যের প্রাণ, সেই প্রাণের পরিচয় দিবার চেষ্টাই গ্যেটে করিয়াছেন।

গ্যেটের পরবর্তীকালেও এই শ্রেণীর মহাগ্রন্থ লিখিবার চেষ্টা হইয়াছে। হুগোর 'লে মিজারেবল', টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস', হার্ডির 'দি ডাইনস্টেস্', শ-র 'ব্যাক্ টু মেথুসেলা' প্রভৃতি যুগন্ধর মহাগ্রন্থ রচনার চেষ্টা। কিন্তু বোধ করি চেষ্টামাত্রেব চেয়ে অধিক নয়।

গ্যেটের মৃত্যুর পরবর্তী শত বৎসরেব মধ্যে মানুষের জীবন আরও জটিলতব, ব্যাপকতর হইয়া পড়িয়াছে এবং তুলনায় মানুষেব ব্যক্তিত্বের সূত্র আরও হ্রস্বতব হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই যুগ-সম্বিৎপূর্ণ মহাকাব্য বচনাব সম্ভাবনাও ক্রমে স্বল্পতব হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্ভাবনা কখনো পূর্ণ হইবে কিনা জানি না। কেননা বর্তমান জগৎ ও জীবন পরিমাপেব জন্য ব্যক্তিত্ব বিধানের চেয়ে দীর্ঘতর সূত্র আবশ্যক। সে সূত্র কি? পূর্বতন দৈববিধান চলিবে না, বর্তমানের ব্যক্তিত্ব বিধানও অচল। তবে আর কি বিধান হইতে পারে? যতদিন না সেই নূতন বিধান উদ্ভাবিত হয়, ততদিন যুগন্ধব মহাগ্রন্থ বচিত হইবাব সম্ভাবনা নাই। আব নূতন বিধান উদ্ভাবিত হইলেও যুগন্ধর মহাকবির আবির্ভাবেব জন্য অপেক্ষা কবিয়া থাকিতে হইবে। বর্তমান যুগ সেই মহাকবিব আবির্ভাবের জন্য, সেই মহাকাব্যেব সম্ভাবনাব জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ততদিন গ্যেটেব ফাউস্টকেই অর্বাচীনতম মহাকাব্য বলিয়া স্বীকাব করিতে হইবে।